# সবার অলক্ষ্যে

[ বাঙলার বিপ্লব-ইতিহাসের অপ্রকাশিত কাহিনী ]

প্রথম পর্ব

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রকাশক—
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—১লা আষাঢ়, ১৩৬৩

প্রচ্ছদ শিল্পী—অজিত গুপ্ত

সাত টাকা

মুদ্রাকর—
প্রভাতচন্দ্র চৌধুরী
লোক-সেবক প্রেস
৮৬-এ, আচার্য জগদীশ বসু রোড
কলিকাতা-১৪

# ভূমিকা

ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বিপ্লববাদ যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে, মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-নীতির প্রভাবে ও কংগ্রেসদলের প্রাধান্য ও প্রচারের ফলে এ-সত্যটি অনেকেই প্রকাশ্যে স্বীকার কর্তে কুণ্ঠিত হতেন। কিন্তু যা' সত্য তা' কেউ কোনদিন চেপে রাখতে পারে না। তাই আজ বিপ্লবীদের অবদান দেশে স্বীকৃতি পেতে আরম্ভ করেছে। কংগ্রেস-নায়কেরা মুখে যা'ই বলুন, তাঁদের অন্তরে যে তারা এ কথা বিশ্বাস করেন তার বহু প্রমাণ আছে। বাংলার মুখ্য মন্ত্রী মহাজাতি-সদনে বহুবার বহু বিপ্লবীর স্মৃতিতর্পণ-সভায় এবং তাঁদের আলেখ্য-উন্মোচনে পৌরোহিত্য করেছেন। কলিকাতার পৌরসভায় কংগ্রেস-সদস্যদের সংখ্যা বেশী হলেও শহরের অনেক রাস্তা এখন বিপ্লবী-শহীদদের নামে পরিচিত। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ( লালবাহাদুর শাস্ত্রীজি ) নেতাজীর মূর্তি উন্মোচন করেছেন।

কিন্তু এই বিপ্লবীদের কাহিনী এখনও যথাযথ ভাবে লিখিত হয় নাই। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই এ-বিষয়ে আমি বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে আমি নিজে আমার ছাত্র ও বন্ধুগণের সাহায্যে বিনা পারিশ্রমিকে বাংলাদেশের বিপ্লববাদের ইতিহাস লিখতে প্রস্তুত আছি—তবে আনুষঙ্গিক কিছু খরচ লাগবে বিপ্লবীদের কাছ থেকে উপকরণ সংগ্রহ কর্তে। আমি একটি পরিকল্পনা দিয়েছিলাম—তাতে তিন বছরে দশ হাজার টাকা ব্যয়ে এটা সম্পন্ন হবে। সে-চিঠির কোন জবাব পাই নি। ভূতপূর্ব বিপ্লবী দুই একজন মন্ত্রী এবিষয়ে খুব উৎসাহ ও সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নি। আমি শিক্ষামন্ত্রীমহাশয়কে লিখেছিলাম এবং সংবাদপত্রেও এই মত ব্যক্ত করেছিলাম যে, বিপ্লববাদের ইতিহাস লিখতে হলে তাঁদের নায়কদের মধ্যে যাঁরা এখনও জীবিত আছেন তাঁদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ কর্তে হবে। আর তাঁদের মধ্যে অনেকেই বার্দ্ধক্য, কারাবাসের ক্লেশ, শরীরের প্রতি অবহেলা ও পুলিশের নানাবিধ অত্যাচার ইত্যাদি কারণে আর বেশী দিন বেঁচে থাকবেন এমন আশা করা যায় না। সুতরাং অবিলম্বে তাঁদের কাহিনী সংগ্রহ না করলে হয়ত তা' চিরদিনের মতই লোপ পাবে।

অবশেষে ১৯৫২ সালে যখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী 'স্বাধীনতার ইতিহাস' লেখার জন্য একটি সম্পাদকমণ্ডলী নিযুক্ত কোরে আমাকে তা'র ডিরেক্টর পদে নিয়োগ করেন তখনও আমি বিপ্লববাদের ইতিহাস লেখার জন্য জীবিত বিপ্লবী নায়কদের কাহিনী সংগ্রহ কর্বার প্রস্তাব করি। কিন্তু কোন একটি বিশিষ্ট দলের একজন নায়ক ছাড়া আর কারও কাহিনী সংগ্রহ করা হয় না। এর কারণস্বরূপ বলা হয়েছিল যে, বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন কাহিনী সংগ্রহ কলে তাতে গোলযোগ ও বিভ্রান্তির স্থষ্টি হবে! আমি এর উত্তরে বলেছিলাম, এই রূপ বিভিন্ন কাহিনী একত্র কর্লেই তা' থেকে বিপ্লবের প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। কিন্তু এ-যুক্তি গ্রাহ্য হয় নাই।

যাঁরা দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ কোরে, পিতামাতা ও পরিবারবর্গের মায়া কাটিয়ে অশেষ কষ্ট ও লাঞ্ছনা পেয়ে এবং মৃত্যুবরণ কোরে দেশের মুক্তিপথ তৈরি কর্তে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের অনেককেই দেশ কোন পুরস্কার বা সম্মান দিতে পারে নাই। কিন্তু যদি তাঁদের অবিনশ্বর কীর্ত্তির কাহিনীটুকুও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য আমরা রেখে যেতে না পারি তবে তাঁরা আমাদের কখনই ক্ষমা কর্বেন না এবং আমরাও অকৃতজ্ঞতা ও কর্ত্তব্যহানির কলঙ্ক চিরদিন বহন কর্ব।

এই জন্যই যখন শুনলাম আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় এই সম্বন্ধে ধারাবাহিক কতগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন এবং তা' বইয়ের আকারে প্রকাশিত হবে তখন আমি যে কি আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করেছি তা' ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। ভূপেন্দ্রকিশোর নিজে বিপ্লবী ও বিপ্লবীদলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সুতরাং তাঁর পক্ষে অনেক বিপ্লবী ও বিশেষ বিশেষ বিপ্লব-কাহিনীর সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। এর পূর্বেও কয়েকজন বিপ্লবী আত্মচরিত বা বিপ্লবের ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখেছেন। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এটি কোন বিপ্লবীর জীবনচরিত বা স্মৃতিকথা নয়, এবং বিপ্লববাদের ঘটনামূলক ধারাবাহিক ইতিহাসও নয়। ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে বিপ্লবীদের সাহস, ধৈর্য, নির্ভীকতা, আত্মত্যাগ, আদর্শ-নিষ্ঠা, গভীর দেশভক্তি ও স্বাধীনতার আকুতি প্রভৃতি গুণের অপূর্ব সমাবেশ—এক কথায় তাঁদের মনুষ্যত্ব, পৌরুষ ও চরিত্র ফুটিয়ে তুলবার দিকেই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। বিপ্লবের রোমাঞ্চকর কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীর জীবনালেখ্য

ও মনোবৃত্তি যুগপৎ পাঠকের মনকে অভিভূত করে। লেখকের সাহিত্যসাধনা অল্প বয়সেই আরম্ভ হয়। এই গ্রন্থের সরস ও মনোজ্ঞ রচনা তারই পরিণতি। এবং এর জন্যেই ঘটনা ও জীবনীগুলি এমন জীবন্ত হয়েছে। কিন্তু সরস কাহিনীর পশ্চাতে গ্রন্থকারের ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার পরিচয় আছে। বিশ্বস্তসূত্রে যেসকল সন্ধান মিলেছে কেবল তারই সাহায্যে লেখক একটি খাঁটি ঐতিহাসিক বিবরণ দিতে চেষ্টা করেছেন। স্মরণ রাখতে হবে যে বর্ণিত ঘটনাগুলির লিখিত কোন প্রমাণ পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। মৌখিক বর্ণনার উপরেই বেশীর ভাগ নির্ভর কর্তে হবে। সুতরাং এতে কিছু ভুলচুক থাকাই সম্ভব। কিন্তু প্রতি বর্ণিত-ঘটনার সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল এবং যাদের কথার উপর নির্ভর করা যায়—এমন সব লোকের কাছ থেকেই এই গ্রন্থের উপাদান যথাসম্ভব সংগ্রহ করা হয়েছে, এ-কথা গ্রন্থকারের মুখ থেকেই শুনেছি। স্বদেশের মুক্তিকামনায় যাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন তাঁদের স্মৃতি সঞ্জীবিত রাখার এই চেষ্টা যে সফল হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। অগণিত মহাপ্রাণ শহীদের প্রতি উপেক্ষার ভাব দেখিয়ে—অন্তত তাঁদের যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান না দিয়ে—এ-জাতি যে কলঙ্ক ও দুষ্কৃতির ভাগী হয়েছে, বর্তমান লেখকের কৃপায় তার কতকটা দূর হবে, এ-জন্য তিনি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন।

দেশের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে দুই পর্বে লিখিত **'সবার অলক্ষ্যে'** নামক এই গ্রন্থখানির আর একটি মূল্য আছে। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি সত্য, কিন্তু তার পুরো ফল ভোগ কর্তে পারি নি;—এখনও সাধারণ লোকের দুঃখদুর্দশার বিশেষ কিছু লাঘব হয় নি, বরং বেড়েছে। স্বাধীনতার যে 'রূপ' বিপ্লবীদেরকে আত্ম-বলিদানে উদ্বুদ্ধ করেছিল, আজ পর্যন্ত সেই 'রূপ' আমরা দেখতে পাই নি। ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে আমরা কেবল একটা ধাপ উঠেছি। এই স্বাধীনতা বজায় রাখা, এবং তা' থেকে আশানুরূপ ফল লাভ করা—এই দু'টি মহৎ কাজ এখনও বাকী, এবং আরও অনেক ধাপ পার হতে হবে। তার জন্য যে সাধনা ও আত্মত্যাগের দরকার তা' মুক্তি লাভের সাধনা ও আত্মত্যাগ থেকে কম নয়। আমাদের দেশের যুবকগণ যদি একথা স্মরণ রাখে এবং বিপ্লবী শহীদগণের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয় তবেই এই ফল লাভ করা সম্ভব হবে। অবশ্য এখনকার নূতন পরিস্থিতিতে নূতন উপায় ও নূতন পথে চলতে হবে। কিন্তু পথ আলাদা হলেও ত্যাগের ও সাধনার আদর্শ একই থাকবে। শহীদদের যেসকল গুণ ও চরিত্রের

বৈশিষ্ট্য পূর্বে বলেছি সেইসব গুণ অর্জন কর্তে হবে। তা' না হলে যাঁরা সর্বস্ব ত্যাগের দ্বারা দেশকে স্বাধীন করেছেন তাঁদের ঋণ আমরা কখনো শোধ কর্তে পার্ব না। জীবন পণ করে তাঁরা যে-স্বাধীনতা অর্জন করেছেন, সেই স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশ না কর্তে পার্লে তাঁদের ক্ষুব্ধ অতৃপ্ত আত্মা আমাদের অভিশাপ দেবে।

আমি আশা করি এই বইখানায় যেসব ঐতিহাসিক চরিত্র আঁকা হয়েছে তাঁদের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের যুবকদের মনে কর্তব্যবুদ্ধি জাগিয়ে তুলবে এবং তাকে সফল করার জন্য শক্তি ও প্রেরণা দান করবে। তা' হলেই শহীদদের আত্মোৎসর্গ এবং এই গ্রন্থরচনা সার্থক হবে।

৪নং বিপিন পাল রোড,
কলিকাতা-২৬

শ্রী[illegible]চন্দ্র মজুমদার

# প্রবর্তনা

**সবার অলক্ষ্যে**-র সমগ্র পাণ্ডুলিপি আমি অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করিয়াছি। শ্রীমান ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় ঐ গ্রন্থে বিপ্লবীদলের সংগোপনে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী নিপুণ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের জানিত বৈপ্লবিক ও গুপ্ত সমিতি সম্পর্কিত সঠিক তথ্যরাজি সুললিত ও পরিচ্ছন্ন ভাষায় পরিবেশনে তাঁহার দক্ষতা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। যথেষ্ট শ্রম ও ধৈর্য সহকারে ভূপেন্দ্রকিশোর 'বিভি'-বিপ্লবীসমিতির ইতিহাস সারা বাঙলার বিপ্লব-ইতিহাসের পটভূমিতে রচনা করিয়াছেন। 'বিভি'র কর্মইতিহাস ব্যতীত চট্টগ্রামের বিস্ময়কর বিপ্লব-ঘটনা এবং ১৯১৪ সাল হইতে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত অন্যান্য দলের তাৎপর্যপূর্ণ এ্যাক্‌শানগুলির ঐতিহাসিক বর্ণনাও ঐতিহাসিক-দৃষ্টিকোণ হইতেই একান্ত দরদ সহযোগে গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে পরিবেশিত সর্বশেষ অধ্যায়টি অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। উহা বর্তমানে যন্ত্রস্থ। আমি আশা করি এই রচনা বহু পাঠককে প্রেরণা দান করিবে, অতীতের গৌরবশালী ঐতিহ্যে তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবে। ইহা ছাড়া ভবিষ্যতের ইতিহাস-রচয়িতাগণও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস' প্রণয়নে ইহা হইতে বিশেষ সাহায্য পাইবেন।

আমরা জানি যে 'নিয়মতান্ত্রিক' সংগ্রাম ( constitutional fight ) আর 'বৈপ্লবিক' সংগ্রাম এক বস্তু নহে। যাঁহারা আইন-মাফিক ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছিলেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজের বিচারবুদ্ধির 'দান' রূপে উহাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতার নামান্তর কিছু লাভ করা। তাঁহাদের কাজকর্ম লোকচক্ষুর গোচরে সাধিত হইয়াছে বলিয়াই তাহার ইতিহাস সহজলভ্য। কিন্তু যাঁহারা প্রচণ্ড ব্রিটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্রসংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন যথার্থ স্বাধীনতা কাড়িয়া লইবার বীর্য্যে, তাঁহাদের অমর কর্মকাণ্ডের অধিক অংশ সকলের অজ্ঞাতে আচরিত হইয়াছে। সভাসমিতি ডাকিয়া জ্বালাময়ী প্রস্তাব গাঁথিয়া কোন কার্য্য সাধিত হয় নাই। প্রস্তরফলকে বা তাম্ররৌপ্যমুদ্রায় কোন কীর্তিকাহিনী কেহ লিখিয়া রাখিয়া যান নাই। অথবা কোন সাক্ষীসাবুদ ডাকিয়াও কোন গুপ্তসমিতির লোকেরা তাঁহাদের কার্য্যকলাপ সংঘটিত করেন নাই। কাজেই তাঁহাদের কর্মইতিহাস দুর্লভ। সেই ইতিহাস তাঁহারাই লিখিতে পারেন যাঁহারা

স্বয়ং বিবিধ-কর্মে-সংশ্লিষ্ট তৎকালীন বিপ্লবী, অথবা যাঁহারা ঐসব কর্মকাণ্ডে জড়িত নেতা বা কর্মীদের কাছ হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা রাখেন। শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় উক্ত দ্বিবিধ যোগ্যতারই অধিকারী। 'বি-ভি'-র সঙ্গে তাঁহার ওতপ্রোত এবং একান্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ছিল। চিন্তায় ও কর্মে বিপ্লবীদলকে তিনি এককালে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রসঙ্গে তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ তাই যথাসম্ভব নিখুঁত হইয়াছে বলিয়া আমি স্বীকার করি।

আমার ধারণা যে নেতাজির সঙ্গে 'বিভি'-র যোগাযোগ এই গ্রন্থে স্থানাভাবে অল্পই লিখিত হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গে আমাদের মানসিক সম্প্রীতি ঘটিয়াছিল ১৯২৩ সাল হইতে। নেতাজি যে আজন্ম-বিপ্লবী তাহা তখনই আমরা বুঝিয়াছিলাম। কারণ তৎকালের সুভাষচন্দ্র বিপ্লবের বাণী কেবল বুদ্ধি দিয়া নয়—হৃদয় দিয়া, সর্বসত্তার রক্ত দিয়া উপলব্ধি করিতে চাহিতেছিলেন বলিয়াই 'বিপ্লব' ক্রমশ তাঁহার 'ধর্ম' হইয়া উঠিতে লাগিল। আমরা বুঝিয়াছিলাম যে, তাঁহার মধ্যে বিরাট নেতৃত্বের সম্ভাবনা বিরাজিত এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজকে তিনি আমাদের মতই হাড়ে-হাড়ে চিনিতে পারিয়াছেন। তবে আমরা গুপ্ত-সমিতির লোক বলিয়া তাঁহার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কও ছিল গুপ্ত ভাবে। অবশ্য তখন পর্যন্ত বৈপ্লবিক কার্যকলাপ বা সংগঠন সম্পর্কে তিনি কোন বাস্তব জ্ঞান লাভ করেন নাই। তাঁহার সকল চিত্ত শুধু বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্মের প্রতি উন্মুখ হইয়া ছিল।

১৯২৭-'২৮ সালে আমাদের গুপ্তসমিতি আংশিক ভাবে প্রকাশ্যে রাজনীতিতে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আমাদের প্রকাশ্যে যোগাযোগ প্রধানত সংঘটিত হইতে থাকে তৎকালীন 'বি-পি-সি-সি' ও 'বেঙ্গল্-ভলান্টিয়ার্স'-'এর ( ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে সংগঠিত স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী ) মাধ্যমে এবং অনেক পরে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সংবচনায়। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতা ছিল 'বিপ্লবী' রূপে। তাঁহার মধ্যেকার 'আদর্শ বিপ্লবী' আপন কল্পনারঞ্জিত পৌরুষের ছবি 'বি-ভি'র কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত দেখিতে পাইয়াছিলেন! তাই 'বিভি'-র সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়তা নিগূঢ়। ইহা অতিশয়োক্তি নহে। ইহা সত্য।...

বর্মার উপকূলে কর্মনিরত দিনগুলি পর্যন্ত নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মধ্যে আপোষহীন মহান্ বিপ্লবীর যে প্রচণ্ড প্রকাশ উদ্ঘাটিত ছিল, তৎসঙ্গে আমরা যথাসম্ভব সংযোগ রাখিতে চেষ্টিত ছিলাম। দেশে থাকা কালে তাঁহার প্রকাশ্য

রাজনীতির 'কন্‌স্‌টিটিউশন্যাল্‌ লড়াইয়ে'র ( অর্থাৎ কর্পোরেশান্‌-এ্যাসেম্ব্লি-কাউন্সিল-ইলেক্‌শান ইত্যাদি ব্যাপারে ) শরিক অবশ্য আমরা বিশেষ হই নাই ; কারণ আমাদের ধারণা ছিল যে ঐরূপ কার্য্যে দলকে অধিক মত্ত করিয়া তুলিলে আসল বৈপ্লবিক কার্য্যে নিশ্চয়ই বাধা পড়িবে। আমরা বিশ্বাস করিতাম যে, কঠিন 'মন্ত্রগুপ্তি' রক্ষা ব্যতীত কোন 'গুপ্ত-সমিতি' কাজ করিতে পারেনা। অথচ ঐসব গুপ্তসমিতির-ই তো দায়িত্ব আগামী সশস্ত্র-বিপ্লব সূচিত করিবার ! ইহা সেই বিপ্লব, যে-বিপ্লবের দুরন্ত আঘাতেই কেবল ব্রিটিশের হাত হইতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিনাইয়া আনা যাইতে পারে।

'মন্ত্রগুপ্তি' যে কি বস্তু তাহা শ্রীঅরবিন্দের কাছ হইতে আমরা শুনিয়াছি। 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থের ( ২য় খণ্ডে ) পঞ্চদশ অধ্যায়ে ঠিকই উল্লিখিত হইয়াছে যে শ্রীঅরবিন্দ ফরাসী-বোটে করিয়া পালাইয়া যাইবার কালে বিপ্লবী রামচন্দ্র মজুমদারকে বলিয়াছিলেন : "Be rare in your acquaintances. Seal your lips to rigid Secrecy. Don't breathe this ( পলায়ন সংবাদ ) to your nearest and dearest".....এবম্বিধ মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করিবার অভ্যাসই ছিল 'বিভি'-কর্মীদের।

১৯৩০ সালে বাংলাদেশের সংগ্রামী-কংগ্রেসের প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক রূপে আমি এবং আমার আরো কতিপয় সহকর্মী কংগ্রেসের আইন-অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলেও 'বিভি'-র বৃহদাংশ কিন্তু গোপন বিপ্লব-কাণ্ডে পিছাইয়া রহিল না। লোম্যান্‌ হড্‌সন্‌ শুটিং, রাইটার্স বিল্ডিংস্‌ রেইড্‌, পেডি-হত্যা ইত্যাদি বিপ্লবকাণ্ড সংগোপনে অবস্থিত কর্মীরাই সংঘটিত করিতে থাকেন। এই সব ব্যাপারে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ থাকিলেও পুলিশের হাতে এমন কোন evidence-ই ছিল না যাহার দ্বারা আমাদের সঙ্গে ( যাহারা বাহ্যত পাব্‌লিক্‌ পলিটিক্সে-ও যুক্ত ছিলাম ) গোপনে কর্মরত আমাদের বন্ধুদের কোন যোগসূত্র স্থাপন করা চলে।

বিপ্লব ও গুপ্তসমিতি সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের-ও অনুরূপ ধারণা থাকায় তিনি আমাদের সংস্থার উপর যে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন ইহা বলিলে সত্যকেই স্বীকার করা হইবে। প্রেসিডেন্সি জেল হইতে মুক্তি পাইবার দিন ( ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ ) পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে ভাবী বিপ্লবের প্রচণ্ড সম্ভাবনা লইয়া আমার আলোচনা হইয়াছে।

দেশ হইতে তাঁহার অন্তর্দ্ধানের প্ল্যান্ আমরা সর্বান্তঃকরণে যেমন গ্রহণ করি, তিনিও তেমনি তাঁহার কার্য্যে আমাদের সহযোগিতা সাগ্রহে কামনা করেন। কিন্তু সমগ্র সংগ্রামী-দেশবাসীর মত আমরাও তাঁহাকে যথাযোগ্য সাহায্য দিতে পারি নাই। দেশ পিছাইয়া থাকিল বলিয়াই বিপ্লবের মাধ্যমে বাঞ্ছিত স্বাধীনতা আসিল না!...

উপসংহারে আমি বলিব যে, যাঁহাদের রক্তে বিপ্লবের বাণী সুপ্ত হইয়া আছে, যাঁহাদের উপর ইতিহাস-বিধাতা ভার দিয়াছেন ভারতবর্ষের 'বাঞ্ছিত স্বাধীনতা' আনয়নের—তাঁহারা 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থ নিশ্চয়ই সাদরে পাঠ করিবেন। অধিকন্তু ইহাও বলিব যে, ভবিষ্যৎ দেশবাসী তাঁহাদের অতীত ঐতিহ্য সংগ্রহ কালে অবশ্যই এই গ্রন্থের মূল্য বুঝিতে পারিবেন।

৭-বি, নস্কর কুণ্ডু রোড,
কলিকাতা-২৮

শ্রীহেম চন্দ্র ঘোষ

৮ৰা ফেব্রুয়ারী,

স্বাধীনতা-যুদ্ধের রক্তক্ষরিত পথে

যাঁরা যাত্রী ছিলেন,

যাঁরা মৃত্যুকে বরণ করে 'মৃত্যুঞ্জয়ী' হয়েছেন,

যাঁরা দেশদেশান্তরে নির্বাসনে বা কারাগৃহে আত্মক্ষয় করেছেন

তাঁদের স্মরণে

এবং

যেসব জায়া-জননী-বোন ও পরিবার এই বীর ও বীরাঙ্গনাদের প্রতি

সহানুভূতি জ্ঞাপনে নিগৃহীত হয়েছেন

তাঁদের উদ্দেশে

এই গ্রন্থ সমর্পিত হ'ল

# বিষয়-সূচী


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| সবার অলক্ষ্যে ( সূচনা ) ... ... ... | ১ |
| **প্রথম অধ্যায়** | |
| 'রডা' ষড়যন্ত্র ... ... ... | ৫ |
| **দ্বিতীয় অধ্যায়** | |
| প্রথম মহাযুদ্ধে ভারত-জর্মান ষড়যন্ত্র ... ... | ১৭ |
| (ক) গদর পার্টির অবদান ... ... | ২১ |
| (খ) বালেশ্বর যুদ্ধ .. ... ... | ২৮ |
| **তৃতীয় অধ্যায়** | |
| আরো খণ্ড-যুদ্ধ ... ... ... | ২৯ |
| **চতুর্থ অধ্যায়** | |
| এঁরা সন্ত্রাসবাদী নন— এঁরা বিপ্লবী ... ... | ৩৬ |
| **পঞ্চম অধ্যায়** | |
| চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ... ... ... | ৪১ |
| (ক) সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন ... ... .. | ৪১ |
| (খ) অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ... ... ... | ৪৭ |
| (গ) জালালাবাদ-যুদ্ধ ... ... ... | ৫১ |
| (ঘ) কালারপোল লড়াই ... ... ... | ৫৫ |
| (ঙ) ফরাসী চন্দননগরে চট্টলার কতিপয় বীর .. | ৬০ |
| (চ) তারিণী মুখার্জীর শেষ রজনী ... ... | ৬৫ |
| (ছ) আসানুল্লা নিধন ... ... ... | ৬৭ |
| (জ) আক্রান্ত দুর্গে ... ... ... | ৭০ |
| (ঝ) এলিসনের মৃত্যুদণ্ড ... ... ... | ৭১ |
| (ঞ) ধলঘাটের যুদ্ধ ... ... ... | ৭২ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| (ট) বাঙলার বিদ্রোহিনী | ৭৪ |
| (ঠ) পাহাড়তলী অভিযান | ৭৯ |
| (ড) অবিস্মরণীয় দান | ৮২ |
| (ঢ) সিংহ—পিঞ্জরাবদ্ধ | ৮৮ |
| (ণ) তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত | ৯১ |
| (ত) বিভীষণ নিধন | ৯২ |
| (থ) মাস্টারদার মৃত্যুদণ্ডের সশস্ত্র প্রতিবাদ | ৯৩ |
| (দ) স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের বিচার | ৯৪ |
| (ধ) মাস্টারদার ফাঁসি | ৯৬ |

## ষষ্ঠ অধ্যায়

| | |
|---|---|
| প্রচণ্ড শৌর্যে সুন্দর বিপ্লবকাল | ৯৯ |
| (ক) বাঙলার নারী | ১০৮ |

## সপ্তম অধ্যায়

| | |
|---|---|
| বিপ্লবীর জীবনে রবীন্দ্রনাথ | ১১৫ |

## অষ্টম অধ্যায়

| | |
|---|---|
| বিপ্লবীর কাছে শরৎচন্দ্র | ১২৫ |

## নবম অধ্যায়

| | |
|---|---|
| সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে বিপ্লবীর অবদান | ১৩৮ |

## দশম অধ্যায়

| | |
|---|---|
| 'বিভি'-র ইতিহাস | ১৪০ |
| (ক) দলের প্রতিষ্ঠাতা হেমচন্দ্র ঘোষ | ১৪০ |
| (খ) মুক্তিসংঘের ক্রমবিকাশ (১৯২০-১৯২৮) | ১৪৬ |
| (গ) দীপালী সংঘ | ১৫৪ |
| (ঘ) বেণু পত্রিকা ও চলারপথে গ্রন্থ | ১৬০ |
| (ঙ) অজানিত শহিদ | ১৬৬ |

| বিষয় | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| (চ) | দলের আরো কথা ... ... ... | ১৬৮ |
| (ছ) | বেঙ্গল্ ভলান্টিয়ার্স মুভ্মেণ্ট্ ... ... | ১৭২ |
| (জ) | রিভোল্টিং গ্রুপ্ ও যুগান্তরের সঙ্গে যোগাযোগ ... | ১৭৪ |
| (ঝ) | দলে কর্ম্মদায়িত্ব কা'র কোথায় ? ... | ১৭৯ |
| (ঞ) | ব্রিটিশ প্রেস্টিজ আহত .. ... | ১৮৫ |
| (ট) | পাবনার বিপ্লবী সংঘ ... ... ... | ১৮৬ |
| (ঠ) | ললিত বর্ম্মণ ও কুমিল্লা ... ... | ১৮৬ |
| (ড) | আশ্রয়স্থল বা শেণ্টার ... ... ... | ১৮৮ |
| (ঢ) | ৭নং ওয়ালিউল্লা লেন ... ... ... | ১৯২ |
| (ণ) | ১৯৩৭ সালের পর ... ... ... | ২০১ |
| (ত) | সুভাষচন্দ্র ও 'বিভি' ... ... ... | ২০৩ |
| (থ) | মাসিকপত্র চলারপথে ... ... | ২০৩ |
| (দ) | ফর্ওয়ার্ড ব্লক্ ... ... ... | ২০৬ |
| (ধ) | ইডিয়লজি-র্ ফ্রন্ট্ ... ... ... | ২১০ |
| (ন) | 'বিয়াল্লিশের কথায় ... ... ... | ২১৪ |
| (প) | 'বিভি' গুপ্তসমিতির স্বেচ্ছাবিলয়ন এবং ফর্ওয়ার্ড-ব্লক্-পার্টি গঠনের চেষ্টা ... | ২১৫ |
| পত্র-সংগ্রহ | ... ... ... | ২২১ |
| (ক) | শ্রীহরিদাস দত্তের পত্র ... ... | ২২১ |
| (খ) | ডাক্তার সুরেন্দ্র বর্দ্ধনের পত্রদ্বয় ... ... | ২২৯ |
| (গ) | রণেন্দ্রনাথের পত্র ... ... | ২৩৩ |
| (ঘ) | সতীশবাবুর পত্র ... ... | ২৩৪ |
| (ঙ) | 'মুক্তিসংঘ' তথা 'বিভি'-র প্রতিষ্ঠাতা-সভ্যদের একখানি পত্র ... | ২৩৬ |

# সবার অলক্ষ্যে

[ বাঙলা দেশের বিপ্লবের ইতিহাস স্বাধীনতা লাভের পূবে পঞ্চাশ বৎসর জুড়ে বিস্তৃত। বাস্তবিক ক্ষেত্রে এ-ইতিহাস একাধিক গুপ্ত সমিতির কর্ম-ইতিহাস। কোন একক ব্যক্তির পক্ষে তার দলের ইতিহাসও সবটুকু জানা নেই। সমগ্র দলগুলোর সম্পূর্ণ ইতিহাস তাই যে কোন একজন বিপ্লবীর পক্ষে লেখাও অসম্ভব। এ ইতিহাস সংঘটিত হয়েছে জনসাধারণের অজ্ঞাতে। কেবল ঘটনাগুলো ঘটেছে লোকচক্ষুর গোচরে। এর ক্রমবিকাশ দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের প্রতি মুহূর্তে ব্যাপ্ত। ইহা প্রাণপুষ্ট হয়েছে বহু সহস্র কর্মীর শ্রেষ্ঠতম কর্মলগ্নের অনবদ্য অর্ঘ্যে। ইতিহাস সৃষ্টির কর্মশালায় কর্মীরা পরস্পর পরস্পরের গোপন-কর্ম অপ্রয়োজনে জানতেন না। যতটা জানতেন তাও তাঁরা মন্ত্রগুপ্তি রক্ষার নিয়মে নিজেদের কাছে গোপন রাখতেই অভ্যস্ত ছিলেন।

এখন দেশ যেভাবেই হোক স্বাধীন হয়েছে। অতীত-বিপ্লবের সঠিক ইতিহাস রচিত হওয়া এখন জাতির প্রয়োজন। কিন্তু নিজেদের স্মৃতি থেকে সযত্নে নানা ঘটনা উদ্ধার করে যাঁরা ইতিহাস বলতে পারেন তাঁদের অনেকে আজ ইহজগতে নেই। আমাদের চতুষ্পার্শ্বে এখনো যাঁরা আছেন, কালের ধর্মানুসারে তাঁরাও ক্রমে ক্রমে হারিয়ে যাবেন। কিন্তু এ বিষয়ে অবহিত হবার সময় এখনো আছে। এখনো বাঙলার বিপ্লব-ইতিহাস লিখিত হবার সুযোগ একেবারে বিনষ্ট হয় নি। নির্ভরযোগ্য সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখতে হলে প্রত্যেকটি অতীত বিপ্লবী-দলের সুযোগ্য কর্মীদের একত্রিত হতে হবে। তাঁদের চেষ্টায় নানাদিক থেকে বহু তথ্য এখনো সংগৃহীত হতে পারে। কিন্তু কেবল তাঁদের উদ্যমেই এ কাজ সম্ভব নয়, প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন।

জানি না বিপ্লবী-নেতারা একত্রিত হয়ে কোনদিন এ চেষ্টা করতে পারবেন কিনা। কারণ রাজনীতিক ও ব্যক্তিক নানা স্বার্থে তাঁদের অনেকে পূর্ব সত্তাকে হয়তো আজ আর খুঁজে পাবেন না। অপূর্ব স্বদেশপ্রেম ও বিপ্লবীসত্তা ব্যতীত কেহ বিপ্লবের সামগ্রিক ইতিহাস রচনায় সার্থক হবেন না বললে হয়তো ভুল বলা

হবে না। অধিকন্তু এও জানি না দেশবাসী অর্থ ও উৎসাহ দিয়ে তাঁদের উদ্যোগকে সাহায্য করবেন কিনা। কিন্তু এখনই কাজ সুরু না করলে ক্রমশ এমন একদিন সহজেই আসবে যখন প্রত্যক্ষদর্শী-বিপ্লবীদের অস্তিত্বই থাকবে না। এবং স্বভাবতই বিপ্লবের কর্মকাণ্ড ভবিষ্যতে 'ইতিহাসে'র স্তর থেকে 'রূপকথা'র স্তরে চলে যাবে।

আমার সঞ্চয় সামান্য। ক্ষমতা অপ্রচুর। আর যতটুকু জানি বা জানতে পেরেছি তারই কিছুটা সতীর্থদের সহযোগিতায় 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র পৃষ্ঠায় লিখেছিলাম। আমার রচনায় প্রধানত বাঙলার বিপ্লবীদের কর্ম-ইতিহাসের মাধ্যমে বিভিন্ন দলগুলোর অল্পবিস্তর কথা আছে। স্বভাবতই আমি যে-দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, তার অজ্ঞাত ঘটনা সম্পর্কে অধিক আলোকপাত করতে পেরেছি। আমি সাধারণত ঘটনা বা 'য্যাকশান্' অবলম্বনেই বিপ্লবের কথা লিখেছি। ইতিপূর্বে এ চেষ্টা আমি অধুনালুপ্ত 'বিপ্লবী-বাঙলা' পত্রের মাধ্যমে সুরু করেছিলাম।

যেসব বীর্যবান ব্যক্তি সবার অলক্ষ্যে মহৎ কর্ম-কাহিনী রচনা করে গেছেন, তাঁদের পুণ্যকথা শুনে তাঁদের সাধন-তীর্থের পানে যদি আজকের তরুণ-তরুণীরা শ্রদ্ধায় ফিরে তাকায় তা'হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস যারা রচনা করে গেছেন তাঁদের জীবনে "জীবন লাভ" না করলে লব্ধ স্বাধীনতা রক্ষা করার ক্ষমতা আজকের তরুণ-তরুণীদের আয়ত্তে আসবে না। এই সত্য বুঝবার সময় সমাগত।

# প্রথম অধ্যায়

## রডা ষড়যন্ত্র

১৯১৪ সন।

ভারতীয় বিপ্লবীরা ইংরাজ-জর্মান মহাযুদ্ধের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা স্থির করলেন। **'জর্মান ষড়যন্ত্র'** তারই নাম। কিন্তু ইংরাজের বিরুদ্ধে জর্মানিব সাহায্য নিতে হলে নিজেদেরও প্রস্তুত হতে হবে। উত্তর ভারতে রাসবিহারী বসু এবং বাঙলা দেশে যতীন মুখার্জির বিপ্লব-প্রস্তুতি ইতিহাসখ্যাত। বিপ্লবীব ধর্ম হলো শূন্যের মধ্যেও বস্তুকে খুঁজে বার করা, 'না'ব মধ্যেও 'হাঁ'কে সৃষ্টি কবা।

বাঙলার বিপ্লবীদলগুলি সাধারণের কাছে দু'টি পার্টিতে পরিচিত ছিল। সমগ্র বাঙলার জেলায়-জেলায় এককালে যেসব বিপ্লবীদল গড়ে উঠেছিল তাদের দল-সমাবেশই 'যুগান্তর পার্টি' নামে পবিচিত হয়। ভূপেন দত্ত ( স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ) সম্পাদিত তৎকালীন 'যুগান্তর' পত্রিকাব নামানুসারেই পুলিশ প্রথমে এই দল-সমাবেশের উক্ত নামকরণ কবে।

মধ্য কলিকাতায় হরিশ শিকদার ও বিপিন গাঙ্গুলি মহাশয়দের **'আত্মোন্নতি দল'** স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চললেও বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে 'যুগান্তর' তথা দল-সমাবেশের সঙ্গে মিলিত হত। হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশযের **'মুক্তিসংঘ'** ( পরিশেষে পরিচিত বেঙ্গল্ ভলান্টিয়ার্স এবং শ্রীসংঘ ) পূর্বে 'আত্মোন্নতি' এবং পূবাপর 'যুগান্তরে'ব সঙ্গে সদ্ভাব ও সহযোগিতা রেখে কাজ করেছে।

উল্লিখিত যুগান্তর পার্টি ব্যতীত অপর সুবৃহৎ দলটির নাম ছিল 'অনুশীলন সমিতি'। এর প্রসার-প্রতিপত্তি বাঙলার সর্বত্র সগৌরবে বর্তমান ছিল।···সকল দলেরই অবশ্য বহির্বাঙলায়ও শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করেছিল।

*   *   *   *

১৯১৪ সনেরই এক নিশীথে বউবাজারস্থ ছাতাওয়ালা গলির এক আড্ডায় য়ুগান্তর, আত্মোন্নতি এবং মুক্তিসংঘের নেতৃবৃন্দ সমবেত হলেন। এঁরা হেমচন্দ্র

ঘোষ মহাশয়ের কলকাতাস্থ প্রতিনিধি শ্রীশচন্দ্র পাল প্রদত্ত একটি প্রস্তাব আলোচনা করবেন।

শ্রীশচন্দ্র পাল জনৈক দুর্ধর্ষ কর্মনেতা। তাঁর বাড়ি ছিল ঢাকা জিলার মূলব গ্রামে। তাঁর বৈপ্লবিক কর্মস্থল ছিল প্রধানত কলকাতায়।

উল্লিখিত গোপন বৈঠকে সমবেত বিপ্লবী নেতৃবৃন্দকে শ্রীশ পাল যে প্রস্তাব শোনালেন তার মর্মকথা হলো :

রডা কোম্পানীর কেরানি মধ্য কলকাতার 'হাবুভাইয়ের ( শ্রীশ মিত্র ) কাছে সংবাদ পাওয়া গেছে যে, ঐ রডা কোম্পানীর জন্যে বহু অস্ত্রশস্ত্র কাস্টম্‌স হাউসে আসছে। এ অস্ত্রগুলোর মধ্যে তিব্বতের দালাই লামার চাহিদা মত এসে যাচ্ছে পঞ্চাশটি মাউজার পিস্তল, পঞ্চাশটি অতিরিক্ত স্প্রিং এবং পিস্তলের এমন ধারার পঞ্চাশটি খাপ যাদের সাহায্যে পিস্তলগুলিকে রাইফেল্‌-এর মত বড় করে ব্যবহার করা চলে। ঐ খাপগুলোই একাধারে বন্দুকের কুঁদার মত মাউজার পিস্তলের কুঁদা এবং উহার খাপের কাজ চালিয়ে থাকে। এ ছাড়া সঙ্গে রয়েছে পঞ্চাশ হাজার রাউণ্ড কার্তুজ। মালপত্র সবই জাহাজ থেকে নেবে গেছে, কেবল কাস্টম্‌স্‌-এর ছাড়পত্র নিয়ে উহা 'রডা'র ঘরে তুলবার অপেক্ষা।...শ্রীশবাবুর মতে একেই বলা হয় সুবর্ণ সুযোগ। এ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। পথ থেকে মাউজার পিস্তলগুলো এবং বুলেট অপসারিত করার প্ল্যান্‌ নিতে হবে। এ সুযোগ গ্রহণ না করলে যে ভুল হবে তা' আর শোধরান যাবে না।...

উক্ত গোপন সভায় উপস্থিত ছিলেন নরেন ভট্টাচায ( প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় ), নরেন ঘোষচৌধুরি, অনুকূল মুখার্জি, হরিদাস দত্ত, আশুতোষ রায় ( পাবনা ), শ্রীশ মিত্র ( হাবুভাই ), খগেন দাস ( চারগাছ গ্রাম, কুমিল্লা ), সুরেশ চক্রবর্তী ( বরিশাল ), জগৎবাবু ও মেডিক্যাল্‌ কলেজের সিনিয়র ছাত্র বিমানচন্দ্র ( কলিকাতা ) এবং শ্রীশ পাল স্বয়ং। কিন্তু দিনে-দুপুরে কলকাতার রাজপথে কি ভাবে যে এই দুঃসাহসিক কাজ হাসিল করা সম্ভব তা' এঁদের অনেকেই ধারণা করতে পারলেন না। উপস্থিত বিপ্লবী নেতাদের অন্যতম নরেন ভট্টাচার্য ও নরেন ঘোষচৌধুরি এ প্রচেষ্টার চিন্তাকে পাগলামী মনে করে সভাস্থল ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু আর সকলে সেদিন শ্রীশ পাল মহাশয়ের বাঙ্‌ময় মূর্তির মধ্যে যেন দুর্ধর্ষ যৌবনের এক সার্থক রূপলিখা দেখতে পেলেন! তাই তাঁরা

সকল কর্মনেতৃত্ব শ্রীশচন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত করে খুশি হলেন। এতাবৎ বাঙলার বিপ্লব-ইতিহাসে এত বড় দুঃসাহসিক য়্যাক্‌শানের (বিপ্লবী-কাযের) সফল-কল্পনা কেউ করেন নি।...উনিশ শত চোদ্দ সাল—এ বৎসর-ই বুঝি পৃথিবীর নিৰ্য্যাতিত দেশগুলোয় বিপ্লবের জয়ধ্বজা উড়িয়ে দেবার শুভকাল!...

* * * *

শ্রীশচন্দ্র পালকে আজ বাঙলা দেশে কেউ চেনে না। বাঙ্গালী বিপ্লবীদের কাছেও তিনি সে-যুগেও তেমন করে পরিচিত ছিলেন না। কারণ এই ব্যক্তি সেযুগে সবার অলক্ষ্যে ছোটবড় সকল কাজে লিপ্ত থাকতেন। গুপ্ত-সমিতির গোপন নেতা রূপেই তাঁর কর্মবহুল জীবন বহুদিন হল শেষ হয়ে গেছে।...

শ্রীশচন্দ্রকে সর্বপ্রথম এক দুঃসাহসী কর্মে সার্থক বিপ্লবী রূপে লিপ্ত হতে দেখা যায় ১৯০৮ সনের ৯ই নভেম্বরের ভয়ঙ্কর এক লগ্নে।

১৯০৮ সনের এপ্রিল মাসে মজঃফরপুরের ঘটনা ঘটে গেছে। প্রফুল্ল চাকী পুলিশের হাতে ধরা পড়তেই নিজের পিস্তলের গুলীতে নিজেকে নিঃশেষ করে বাঙলার শহিদ-অগ্রদূতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু এই তরুণ বীরকে গ্রেপ্তার করেছে যে পুলিশ কর্মচারী, তাকে তো শাস্তি পেতেই হবে। বিপ্লবী শ্রীশ পাল উক্ত পুলিশ কর্মচারী নন্দলাল ব্যানার্জিকে ছেড়ে দিলেন না। 'আত্মোন্নতি'-র সঙ্গে যোগাযোগে এই কাজটি সম্পন্ন হল। বিপ্লব-সংস্থার কঠিন শাস্তি বিপ্লব-ইতিহাসে স্বাক্ষরিত হয়ে রইল। কলকাতার সারপেণ্টাইন্ লেনে শ্রীশচন্দ্র গুলীর আঘাতে নন্দলালকে নিহত করলেন। পুলিশ-নন্দলাল বিপ্লবীর বিচারে তার অপকীর্তি ও দেশদ্রোহিতার জন্যে মৃত্যুদণ্ড লাভ করল।...এই দুর্জয় অভিযানে শ্রীশবাবুর একটি সঙ্গী ছিলেন। বীর্য্যবান সে তরুণ 'আত্মোন্নতি' দলেরই কর্মী। তাঁর নাম রণেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী।

শ্রীশবাবুকে কেউ ধরতে পারল না। পুলিশ তো দূরের কথা, বিপ্লবীদলের দু'চারজন ছাড়া অপর বিপ্লবীদের কাছেও কে বা কা'রা যে ঐ কাজটি করেছেন তা' অজানা রয়ে গেল। আজ পর্যন্ত অনেক বিপ্লবী বা ঐতিহাসিক পুলিশ-রিপোর্ট, ইত্যাদি থেকে এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য উদ্ধার করতে না পেরে বিভ্রান্ত হচ্ছেন।....

শ্রীশচন্দ্র হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 'মুক্তিসংঘে'র কলকাতাস্থ প্রতিনিধি রূপে

১৯১৪ সালে সংগোপনে বৃহৎ কর্মজিজ্ঞাসায় চঞ্চল হয়ে কলকাতারই বুকে অপেক্ষা করেছিলেন।...প্রার্থিত ক্ষণ সমাগত হল। সতীর্থ হরিদাস দত্ত 'রডা অস্ত্র-সংগ্রহ' কর্মে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হলেন। কী কুশল কর্মক্ষমতার পরিচয় এই দু'টি বিপ্লবী এবং 'আত্মোন্নতির'র হাবু মিত্র আজ থেকে বাহান্ন বৎসর পূর্বে বিপ্লবীর ইতিহাসে স্বাক্ষরিত করে গেছেন তা' আমরা ক্রমশ জানতে পারবো।...

* * * *

রডা-অস্ত্র-সংগ্রহের পরিকল্পনা ( Execution Plan ) শ্রীশচন্দ্রের মাথায় এসে গেছে। এ পরিকল্পনাকে রূপ দেবার কর্মে বন্ধুরূপে সঙ্গে জুটিয়েছেন তিনি কতিপয় বেপরোয়া যুবককে। তাঁদের 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য'। তাঁদের 'চিত্ত ভাবনাহীন'।...

যতীন মুখার্জি, হেমচন্দ্র ঘোষ, বিপিন গাঙ্গুলি, হরিশ শিকদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সমর্থনে শ্রীশবাবু যে সুকঠিন কাজে ব্রতী হলেন তার ভালমন্দের দায়িত্বও তিনি নিজের হাতেই তুলে নিলেন। তার কর্মসাথী রূপে বিপিনবাবুর বন্ধু অনুকুল মুখার্জি এগিয়ে এলেন। বস্তুত এই কঠিন কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছিল শ্রীশ পালের নেতৃত্বে, আত্মোন্নতি-সমিতির সাংগঠনিক সাহায্যে এবং হাবু মিত্র ও হরিদাস দত্ত প্রমুখ কর্মীর দুঃসাহসে। ...

ঘটনার পূর্ব দিন ( ২৫. ৮. ১৪ ) শ্রীশবাবু ও অনুকূলবাবুতে স্থির হলো যে, কাজের জন্যে অনুকূলবাবু একখানা গরুর গাড়ি যোগাড করে দেবেন, আর শ্রীশবাবু যোগাড় করবেন সে-গাড়ির গাড়োয়ান। এ ছাড়া এও স্থির হলো যে 'রডা কোম্পানী'র মালগুলো কাষ্টমস্ হাউস্-এর আওতা থেকে রডা-আপিসে আনবার কালে গরুর গাড়িগুলোতে মাল তুলবার ফাঁকে ঐ কাজে ভারপ্রাপ্ত 'রডা'-র কর্মচারী শ্রীশ মিত্র (হাবু মিত্র) মাউজার পিস্তল ও কার্তুজের বাক্সগুলো বিপ্লবীদের গাডিতে তুলে দিয়ে যথাসময়ে সরে পড়বেন এবং হরিদাস দত্ত গাড়ি-বোঝাই মাল নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাবার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

রডা-কোম্পানীর মাল কি ভাবে সরান হবে তার execution-এর পরিকল্পনাটি হাবু মিত্রের গৃহে বসেই গৃহীত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শুধু অনুকূলবাবু ও তাঁর সহকর্মী হাবু মিত্র; শ্রীশবাবু ও তাঁর সহকর্মী হরিদাস দত্ত এবং খগেন দাস।

পরিকল্পনা গৃহীত হতেই শ্রীশবাবু হরিদাস দত্তকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে চলে এলেন মার্কাস স্কোয়ারের পশ্চিম দিকের মারোয়াড়ী হোস্টেলে। প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা তখন কলেজের ছাত্র এবং উক্ত মারোয়াড়ী-ছাত্রনিবাসের বোর্ডার। বিপ্লবীদলের কর্মী প্রভুদয়ালজির উপর একটি গুরুতর কাজের ভার দিলেন শ্রীশবাবু। হরিদাস দত্ত রাতটা কাটাবেন তাঁর কাছে এবং পরের দিন প্রভাতে হরিদাসবাবুকে খাঁটি হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানের সাজে সাজিয়ে পাঠাতে হবে যথানির্দেশিত স্থানে।

পরের দিন ২৬শে আগষ্ট। হিম্মৎসিংকাজির বিশ্বস্ত এক ক্ষৌরকারের হস্তে হরিদাসবাবুকে অর্পণ করা হল। নাপিত মহাশয় নির্মম হস্তে দত্তমহাশয়ের চুলগুলি খুব ছোট ছোট ক'রে কেটে দিল। হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানের মাথার সঙ্গে দত্তমহাশয়ের মাথার কোন ভেদ রইল না। তারপর তাঁর গায়ে উঠলো কালো রঙের ফতুয়া, গলায় কালো ফিতের আশ্রয়ে আঁট করে লাগানো হলো একটি পেতলের ধুকধুকি, আর পরনে রইল ময়লা আটহাতি একখানা কোরা ধুতি। হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানের এই রূপসজ্জায় হরিদাসবাবু অপরূপ হয়ে উঠলেন! মলঙ্গা লেনে অনুকূলবাবুর গাড়িখানা পাওয়া গেল। দত্তমহাশয় গরুর লেজ মুচড়ে গাড়ি হাঁকিয়ে রাস্তায় নাবতেই বোঝা গেল যে এই মানুষটি কেবল কিতাব আওড়ে 'বিপ্লবী' হন নি, এঁর শিক্ষা ও দীক্ষা হাতেকলমেই হয়েছিল।

সেই যুগেও হরিদাস দত্তের ম'ত দুঃসাহসী কর্মী পথেঘাটে পাওয়া যেতো না। কিন্তু গো-শকটের কর্ণধার রূপে কঠিন হস্তে পরম নৈপুণ্যে জনাকীর্ণ কলকাতার পথে তিনি যখন ওটা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর নিজস্ব সাহস ও দক্ষতা ছাড়া আরো কিছু সম্বল ছিল। সে সম্বল হলো একটি অটুট প্রত্যয়, যে প্রত্যয় ছিল পার্থসারথির প্রতি পার্থের।...

পূর্ব-পরিকল্পনা মত নেতা শ্রীশচন্দ্র সশস্ত্র-শৌর্যে হরিদাসবাবুর গাড়ির সম্মুখে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। খগেন দাসের উপর নির্দেশ ছিল গোপনে ঐ গাড়িকে অনুসরণ করার। যথাসময়ে ডালহৌসি স্কোয়ারে শ্রীশবাবু, খগেন দাস এবং গাড়িসহ হরিদাস দত্ত উপস্থিত হলেন। গাড়িতে ছিল শুধু একটি শাবল। বলা বাহুল্য বিপ্লবীরা তিনজনেই অবশ্য গোপনে সঙ্গে রেখেছিলেন গুলীভরা রিভল্‌ভার। এঁরা স্থির করে গিয়েছিলেন যে, অতর্কিতে পুলিশের হাতে যদি পড়ে যান তবে যুদ্ধ করে মরতে হবে। তা' ছাড়া এও স্থির ছিল যে, মাল উদ্ধার করে পালাবার

কালে পুলিশ যদি আক্রমণ কবে তবে হবিদাস দত্ত প্রথমেই গুলি কববেন না। শ্রীশবাবু ও খগেনবাবু পবপব গুলি চালাতে থাকবেন। সেই ফাঁকে গাড়িব চালক হবিদাস দত্ত লুণ্ঠিত মালেব বাক্স ভেঙ্গে দুইটি মাউজার পিস্তলেব গুলি ভবে শ্রীশবাবুদের হাতে তুলে দেবেন। তাঁদেব হাতে মাউজাব গর্জাতে থাকার অবসবে দ্বিতীয় দফায় গুলি ভরে তিনি নিজেও মাউজাব চালাতে আবম্ভ কববেন। এইভাবে তাঁবা তিনজনে অজস্র কার্তুজ ও সেবা পিস্তলের অধিকাবী হয়ে সেদিন-কাব ডালহৌসি স্কোয়াবে বক্তেব হোলি বচনা কবে মবণকে বলবেন—'তুঁহু মম শ্যাম সমান।' সেই দুর্বাব যুদ্ধে, অসহ্য আত্মদানে, প্রচুব বক্তক্ষবণে যে নব-যৌবনেব জন্মলাভ হবে সে যৌবনই একদিন ভাবতবর্ষকে নিশ্চয় স্বাধীন কববে। শ্রীশ পাল, হবিদাস দত্ত, হাবু মিত্র ও খগেন দাসেব বিদ্রোহী-আত্মাব চবম তৃপ্তি ও পূর্ণ সার্থকতা যে সেই পবিণতি লাভেবই চতুঃসীমায়। মৃত্যুব মাঝে জীবনেব উপলব্ধি এভাবেই তাদেবকে সেদিন পথচলাব আহ্বান শুনিযেছিল। তাদেব পদক্ষেপে তাই কিছুমাত্র ছন্দঃপতন ঘটে নি।

হবিদাস দত্ত

* * * *

সে সময় 'বডা' কোম্পানীব সিংহদ্বাব ছিল ভ্যান্‌সিটার্ট্‌ বো অভিমুখে—ডালহৌসি স্কোয়াবেব দক্ষিণ দিকে। কাস্টমস্‌-এব অবস্থান হলো ডালহৌসি স্কোয়ারেব উত্তর-পশ্চিম কোণে। উভয় অট্টালিকাব মধ্যে দূবত্ব সামান্য।

হরিদাস দত্তেব গাড়ি দূবে দাঁড়িযে আছে। এদিকে 'বডা' কোম্পানীব মাল-সবকাব শ্রীশ মিত্র (হাবুবাবু) কোম্পানীব তবফ থেকে সাতখানা গাড়ি সহ মাল আনতে যাবাব প্রস্তুতি কবছেন। ছয়খানা গাড়ি 'বডা'র দরজায় দাবোয়ানবা নিয়ে এসেছে; সপ্তম শকট তখনো সেখানে পৌছায় নি দেখে হন্তদন্ত হয়ে ওটাকে তাডা দিয়ে আনবার জন্যে হাবুবাবু স্বয়ং ছুটলেন। পূর্ব-নির্দেশ মত হরিদাস দত্ত ষষ্ঠ

গাড়ির অনেক পেছনে তাঁর গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। হাবুবাবু হরিদাস দত্তের গাড়ির কাছে এসে কপট ক্রোধে হাঁক দিলেন: "ইয়ে উল্লুকা পাঠ্‌ঠা, জল্‌দি কেঁও আয়ে নেহি ?"

গাড়োয়ান যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল! উত্তর দিল: "হুজুর, মেহেরবানি!" ...তাড়াতাড়ি সে তার গাড়ি এগিয়ে নিয়ে এলো।...

সাতখানা গাড়ি সহ যথাস্থানে পৌঁছে হাবুবাবু যথারীতি মাল খালাস করলেন। প্ল্যান্ মত পশ্চাতেব গাড়িটায় মাউজার পিস্তল, পিস্তলের কার্তুজ, স্প্রিং, খাপ ইত্যাদি মাউজার পিস্তলের যাবতীয় সরঞ্জাম সমেত বাক্সগুলো তোলা হল। বোঝাই সপ্ত-শকট 'রডা' কোম্পানীব দিকে রওনা হয়ে গেল। সকলের পেছনে রইল হরিদাস দত্তেব গাড়ি। ভ্যান্‌সিটার্ট্ রো-র সম্মুখে এসে পূর্বগামী ছ'খানা গাড়িই হাবুবাবুর সঙ্গে বডা কোম্পানীর উদ্দেশে গলির মধ্যে ঢুকে গেল। এবং হাবুবাবুর ইঙ্গিতে হরিদাস দত্ত মহাশয় সোজা পূর্বদিকে গাড়ি চালিয়ে দিলেন। তাব গাড়িব ছ'পাশে ইতিমধ্যে শ্রীশ পাল ও খগেন দাস রক্ষীর মত চলা শুরু করে দিয়েছেন। গাড়ি ম্যাণ্টং কোম্পানী ও বর্তমান কারেন্‌সি আপিসের মধ্যবর্তী রাস্তায় ( ম্যাঙ্গো লেন্—বর্তমানে মিশন্ রো ) ঢুকতেই হাবুবাবু এসে শ্রীশবাবুদের সঙ্গে যুক্ত হলেন। মিশন্ রো হয়ে গাড়িটা বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ স্ট্রীট্ অতিক্রম করে, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট্ পাব হয়ে, চাঁদ্‌নি চকের পাশ দিয়ে মলঙ্গা লেন্-এ পৌঁছে গেল।

মলঙ্গা লেনে অনুকূলবাবর গৃহের কাছে একটি খোলা জায়গা ছিল। সেখানে স্তূপীকৃত লোহালক্কড় জীর্ণ অবস্থায় মজুদ ছিল। কয়েকটি ওড়িয়া শ্রমজীবী সেখানে বাস করত।...

* * * *

গাড়ি থেকে সমস্ত মাল নামান হল। মাল নামিয়েই হরিদাস দত্ত শ্রীশবাবুর নির্দেশে সরে পডলেন। হাবুবাবুকে নিয়ে শ্রীশবাবুও চলে গেলেন। মালপত্র রইল অনুকূলবাবু দায়িত্বে।

অনুকূল মুখার্জি মহাশয়ের সহকর্মী কালিদাস বসু তাঁর বাড়ির ঘোড়ার গাড়িতে দফায়-দফায় ঐ মাল জেলেপাড়ার ভুজঙ্গ ধরের গৃহে নিয়ে যান।

অল্প সময়ের মধ্যে বড় বড় এগারটি বাক্স এনে 'রডা' কোম্পানী মার্কা (R. B. Rodda Co.) বাক্স থেকে ২১,২০০ রাউণ্ড বুলেট ঐ বাক্সগুলোয় ভরা

হলো। মাল ভর্তি বাক্সগুলো আপাতত থাকলো ভুজঙ্গবাবুরই হেপাজতে। বাকি ২৮,৮০০ রাউণ্ড বুলেট এবং সমগ্র মাউজার পিস্তল ইতিমধ্যে নেতারা বাঙলার সবগুলো দলের মধ্যে বেঁটে দিয়েছিলেন। বাঙলার বিপ্লবীদের শিরায়-শিরায় সহসা বিপুল আশা ও প্রচুর প্রত্যয়দ্যোতনা সঞ্চারিত হয়ে গেল। তরুণ বিপ্লবীদের ধনুকে টঙ্কার ধ্বনিত হয়েছে—শব মুক্ত করার আদেশ কখন আসবে ?...

* * * *

শ্রীশ পাল প্রমুখ কর্মনেতারা জানতেন যে 'রডা' কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ মাল ঠিক মত না-পৌছানর খবর পেতেই সর্বপ্রথম সন্দেহ করবেন হাবু মিত্রকে। কাজেই যেদিন য়্যাক্‌শান হল সেদিনই ( ২৮. ৮. ১৪. ) বিকেলে দার্জিলিঙ মেলে হাবু মিত্রকে নিয়ে শ্রীশ পাল রংপুর রওনা হয়ে গেলেন। সঙ্গে নিলেন দুটি মাউজার পিস্তল ও বুলেট। রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত নাগেশ্বরী থানায় হেমচন্দ্র ঘোষের অর্থাৎ শ্রীশ পালদের একটি গোপন আড্ডা ছিল। সেই আড্ডার আঞ্চলিক-প্রধান ডাঃ সুরেন বর্দ্ধনের কাছে হাবুবাবু সহ শ্রীশচন্দ্র উপস্থিত হলেন। হাবুবাবু সুরেন বর্দ্ধনের মাসতুতো ভাই 'সুধীর মিত্র' রূপে নাগেশ্বরীতেই থেকে গেলেন। শ্রীশবাবু পরের গাড়িতেই কলকাতায় ফিরে এলেন।

* * * *

এদিকে ছ-সাত দিন পার হয়ে গেছে হাবুবাবু আপিসে আসছেন না, কোন সংবাদও পাঠাচ্ছেন না ! 'রডা'-র কর্তৃপক্ষ খোঁজ নিয়ে দেখেন যে কাস্টমস্ হাউস্ থেকে কিছু মালও তাদের হেপাজতে আসে নি। তৎক্ষণাৎ কাস্টমস্ হাউসে খবর করা হলো। উত্তরে 'রডা'-র সাহেবরা জানতে পারলেন যে, তাঁদের মাল-সরকার শ্রীশ মিত্র (হাবু মিত্র ) সমস্ত মাল-ই ২৬শে আগষ্ট যথাসময়ে খালাস করে নিয়ে গেছেন। সাহেবসুবাদের টনক নড়ে গেল। পুলিশের কণ্ঠে আর্ত স্বর। টেগার্ট প্রমুখ সাম্রাজ্যরক্ষীরা সবিস্ময়ে শুনলেন যে দিন সাতেক পূর্বে নাকি গাড়িবোঝাই মাল দিবাদ্বিপ্রহরে অন্তর্দ্ধান হয়েছে ! ভয়ে ও আশঙ্কায় সাহেব-পাড়ার চোখে ঘুম নেই। বিপ্লবীদের হাতের মুঠোয় এতো আধুনিক মারনাস্ত্র ! তা-ও আবার এই বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় ! সেদিনই সারা কলকাতায় ঢোল সহযোগে জানানো হল যে, যারা নিজের গৃহে নতুন ভাড়াটে নিয়েছে তারা যেন অনতিবিলম্বে সেসব ভাড়াটেদের সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ নিজ-নিজ এলাকার থানায় পেশ করে।

বিপ্লবীরা এতে প্রমাদ গণলেন। কারণ তখনো ২১,২০০ রাউণ্ড কার্তুজ একান্ত নিরাপদ স্থানে রাখা যায় নি।

কয়েকদিনের মধ্যে বড়বাজার অঞ্চলে বাঁশতলায় জনৈক মারোয়াড়ীর বাড়িতে একটা গুদামঘর ভাড়া করা হয়। ভুজঙ্গবাবুর গৃহ থেকে অতি সন্তর্পণে বাক্সভরা মাল ( ২১,২০০ রাউণ্ড বুলেট ) স্থান থেকে স্থানান্তরে বার-তিনেক সরিয়ে অবশেষে বাঁশতলার গুদামঘরে এনে রাখা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে জোড়াবাগান থানা কিছু সন্দিহান হয়ে ওঠে। থানা থেকে আলি হোসেন নামক এক পাঞ্জাবী কনেস্টবলকে নিযুক্ত করা করা হয় গুদামঘরটির উপর নজর রাখার জন্যে। বিপ্লবীরা এ-সংবাদ না জানলেও বড়বাজারের ঐ আস্তানা সম্পর্কে শুরু থেকেই তাঁরা ভাবিত ছিলেন। একদিন সকালবেলা শ্রীশবাবু অকারণেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। হরিদাস দত্তকে ডেকে বললেন যে, তিনি যেন বিশেষ সতর্ক ভাবে বাঁশতলার গুদামে এখুনি গিয়ে দারোয়ানকে বলে আসেন যে দুপুরেই তার গুদামঘর খালি করে দেওয়া হবে।

হরিদাসবাবু সেদিনই প্রাতে ৯টায় বাঁশতলার বাড়িতে পৌছলেন। বাড়ির মালিক ছিলেন একটি মারোয়াড়ী বিধবা মহিলা। দারোয়ানের নাম ছিল শুকদেও। আলি হোসেন তখন ধারেকাছে ছিল না। খাবার খেতে একটু দূরে কোথাও গেছে। বাড়িতে ঢুকেই শুকদেওকে হরিদাসবাবু তার বক্তব্য শোনালেন। কারণ তখনো তিনি বোঝেন নি যে, ইত্যবসরে সাধু শুকদেও কোন এক আলি হোসেনের মত ধুরন্ধরের রচিত প্রলোভন-জালে জড়িয়ে যেতে পারে! শুকদেও বলল: "জেরাসা ঠের যাইয়ে বাবুজি। অভি মাইজিকো ( গৃহকর্ত্রী ) আপ্‌কা সেলাম দেতা হুঁ।"...

আসল উদ্দেশ্য হলো বাবুটিকে আলি হোসেন ফিরে আসা পর্যন্ত আটকে রাখা।

হরিদাসবাবুর মনে একটু খট্‌কা লাগলো। তিনি দু'এক পা করে সদর দরজার কাছে এগিয়ে এলেন। দুর্ভাগ্যবশত ঠিক সেই মুহূর্তে আলি হোসেন-ও এসে উপস্থিত। শুকদেও নির্লজ্জের মত হেসে কনেস্টবলকে বলল: "ইয়ে বাবু আ গয়ে।"

আলিহোসেন হরিদাসবাবুর কাছে এসে বলল: "থানায় চলুন।"

হরিদাসবাবুর আপত্তি করার উপায় ছিল না। গলিপথে কয়েক পা এগুতেই হরিদাসবাবু দেখলেন যে একটি বাড়ির সুমুখে বাড়ি-মেরামতের জন্যে বালির পস্তূ

পড়ে আছে। হঠাৎ দত্তমহাশয়ের মাথায় একটি বুদ্ধি এসে গেল। জুতোয় বালি ঢুকেছে বলে তিনি একটু থেমে আনত হলেন এবং একমুঠো বালি তুলে নিলেন। ফাঁক বুঝে আলি হোসেনের চোখে মুহূর্তে সেই বালি ছুঁড়ে দিয়েই তিনি দৌড় দিলেন। বিহ্বল আলি চোখ রগড়াতে লাগল এবং প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল : "ডাকু ভাগ্‌তা হ্যায়।"... হরিদাসবাবু ইতিমধ্যে গুদামঘরের চাবিটি সবার অজ্ঞাতে একটি আধো-ঢাকা ম্যান্‌হোল্ পথে পেয়ে তার মধ্যে টুক্ করে ফেলে দিয়েছেন।...

বড়বাজারের মত জায়গায় প্রাতে ৯টা-১০টার সময় 'ডাকু ভাগ্‌তা হ্যায়' ধ্বনি তুললে যেকোন পলায়মান-ব্যক্তি যে জনসমুদ্রের বেষ্টনিতে আবদ্ধ হবে তা, অনুমান করা কঠিন নয়। সুতরাং খানিকটা দূরে যেতেই হরিদাসবাবু ধরা পড়লেন। জোড়াবাগান থানায় দত্তমশায়কে আসতে হল—ভদ্রবেশে নয়, 'ডাকু'র বেশে!...থানাদারের আনন্দের সীমা নেই। টপ্ স্পটে প্রমোশন এবার কে ঠেকায়? ..হাওয়ায় খবর ছড়িয়ে গেল। খবর পেয়ে মুহূর্তে টেগার্ট-লোম্যান্-ম্যাক্‌লিয়োর্ প্রমুখ পুলিশ-কর্তারা জোড়াবাগান থানায় এসে হাজির। টেগার্ট্ তৎকালে 'আই-বি'র স্পেশাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। লোম্যান্ ছিলেন 'এস্-বি'র ডেপুটি কমিশনার। ম্যাক্‌লিয়োর্ ছিলেন কলিকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার।

থানায় এসেই 'ডাকু' হরিদাস দত্তের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে টেগার্ট বলে উঠলেন : "Hallo, Royal Bengal Tiger! Now you are bagged!"...

অতঃপর বিরাট বাহিনী পরিবেষ্টিত বন্দী দত্তমহাশয় সহ পুলিশকর্তারা বাঁশতলার বাড়িতে উপস্থিত হলেন। গুদামঘরের তালা ভেঙে বিজয়ীর গর্বে ভেতরে ঢুকলেন কর্তারা। একটি বাক্স খুলতেই সাহেবদের জিভে জল এসে গেছে। পুলকে আত্মহারা হয়ে ভাবছেন তাঁরা—যাক্, বড় সহজেই রডা-কোম্পানীর সমস্ত মাল উদ্ধার হয়ে গেল! ..কিন্তু দুর্ভাগ্য পুলিশের, দুর্ভাগ্য ইংরেজের, দুর্ভাগ্য রডা-কোম্পানীর মহাজনদের যে পরপর সবগুলো বাক্স ভেঙে দেখা গেল—একটি মাউজার পিস্তল-ও নেই, অধিকন্তু ২৮,৮০০ রাউণ্ড বুলেট উধাও! পড়ে আছে কেবলমাত্র ২১,২০০ রাউণ্ড বুলেট।...

*   *   *   *

হাবু মিত্র উধাও হয়েছেন জেনেই পুলিশ প্রথমে একটি নামের তালিকা তৈরি করে ফেলল। তার মধ্যে খুঁজে খুঁজে ঢোকাল তাদেরই নাম, যাদের হাবুবাবুর

সঙ্গে কিছুমাত্র জানাশোনা থাকা সম্ভব ছিল। অধিকন্তু কালবিলম্ব না করে অনুকূল মুখার্জি, কালিদাস বসু, গিরীন ব্যানার্জি, নরেন ব্যানার্জি, ভুজঙ্গ ধর, বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, সতীশ দে, উপেন সেন, প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা ও আশুতোষ রায়কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ কিছুটা স্বস্তি বোধ করেছে। শ্রীশ পাল, খগেন দাস প্রমুখ অবশ্য অক্ষত দেহে গা-ঢাকা দিতে পেরেছিলেন। শ্রীশবাবুর ছদ্ম নাম ছিল 'নরেন দত্ত'।...

অনুকূল মুখার্জী (স্বর্গগত)

এদিকে পলাতক হরিদাস দত্ত ধরা পড়তেই পুলিশের বিশেষ সুবিধা হল। মালপত্র কিছুটা হাতে এসে গেছে—সুতরাং হরিদাসবাবু ও ধৃত অপর ব্যক্তিদেরকে জড়িয়ে একটি রোমাঞ্চকর ষড়যন্ত্র-মামলা সাজাতে টেগার্ট-গোষ্ঠীর বেগ পেতে হলো না।

দীর্ঘ সাত মাস ধরে 'রডা আর্মস কন্‌সপিরেসি' নামক মামলা চলার পর হরিদাস দত্ত, কালিদাস বসু, ভুজঙ্গ ধর ও নরেন ব্যানার্জি ব্যতীত অপর সকলে মুক্তি পেলেন। হরিদাসবাবু গুদামঘরের চাবি-সহ ধরা পড়লে পুলিশ এই ষড়যন্ত্রে তাঁকে হাতেনাতে জড়াতে পারতো এবং তাঁর সুদীর্ঘকালীন মেয়াদ নিশ্চয় হতো। কিন্তু বুদ্ধিমান দত্তমহাশয় তা জানতেন বলেই নিজেকে প্রথম সুযোগে চাবিমুক্ত করে ফেলেন! হরিদাসবাবু, কালিদাস বসু, ভুজঙ্গ ধর ও নরেন ব্যানার্জির দু'বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ড হলো। হরিদাস বাবুকে Circumstantial

evidence-এর জোরে তাঁর হেপাজতে বুলেট পাওয়া গেছে অভিযোগে আরো দু'বছর অতিরিক্ত সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল। দীর্ঘ চার বছর তিনি প্রেসিডেন্সি জেলের চুয়াল্লিশ ডিগ্রি ও নরক-সম জালডিগ্রীতে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীর জীবন কাটান। কয়েদকাল শেষ হতেই তাঁকে আবার জেলগেটে 'তিন আইনে' স্টেট্-প্রিজনার করে হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেলে বন্দী অবস্থায় রাখা হয়।...

বাঙলার বিপ্লব-ইতিহাসে 'রডার' অস্ত্র-হরণ এক বিস্ময়কর ব্যাপার শুধু নয়, এর ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক গুরুত্বও অসাধারণ। 'রডা'র অস্ত্রে সজ্জিত হয়েই বাঙলার বিপ্লবীরা রণক্ষেত্রে তাঁদের বিপ্লবী-সংগ্রামকে প্রচণ্ডতর করতে পেরেছেন এবং অবসাদগ্রস্ত জাতিকে অরুণ-উষার পদধ্বনি শুনিয়েছেন। বালেশ্বরের বুড়িবালামের তীরে বিপ্লব-মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর দুর্জয় সতীর্থবৃন্দ এ অস্ত্র নিয়েই ঐতিহাসিক যুদ্ধ করেছিলেন।

* * * *

হরিদাস দত্ত ধরা পড়বার পর কুড়িগ্রাম মহকুমা আর নিরাপদ স্থান হয়ে রইল না। কারণ হরিদাসবাবু বহুকাল নাগেশ্বরী থানাকে কেন্দ্র করে কুড়িগ্রামে বসবাস করেছেন। ঢাকা জিলায় তাঁর বাড়ি হলেও 'নাগেশ্বরী' ছিল তাঁদের দ্বিতীয় গৃহ। শ্রীশ পাল তাই ওখানকার আঞ্চলিক-নেতা ডাক্তার সুরেন বর্দ্ধনকে জানালেন যে, হাবু মিত্রকে আসামের কোন নিরাপদ শেল্টারে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই "নিরাপদ শেল্টার' অর্থে 'রাভা' নামক পার্বত্য জাতিদের আশ্রয়ের কথাই ভেবেছিলেন।..

ঐ শেল্টার থেকেই সুযোগ বুঝে একদা এই ভয়মুক্ত তরুণ বিশ্বপথিকেরই পদচ্ছন্দে হয়তো তুষারক্লিষ্ট ফ্রন্টিয়ার-এর বন্ধুর পথ অতিক্রম করছিলেন সুদূর চীনে পৌঁছবার আগ্রহে। সঠিক তথ্য কিছু জানা নেই। তবে যতটুকু জানা গেছে তাতে ঐ অঞ্চলের তৎকালীন বিপ্লবীদের ধারনা যে হাবু মিত্রের মৃত্যু ঐ দুর্গম পথ পরিক্রমণ কালেই কোথাও ঘটেছিল। তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম করা। তবে ইহা অবশ্যই অনুমান।

এই পথের আহ্বানে আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনা হাবু মিত্রেরও অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। কিন্তু তিনি তো পথিক! ভারতের বন্ধন-মুক্তির বাণী কণ্ঠে নিয়ে পথেপথে পথচলাই-তো তাঁর ব্রত! তিনি থামবেন কার হুকুমে? তাঁর প্রাণদেবতার

আদেশ তিনি কান পেতে শুনেছেন—চলো, চলো……দূরে, আরো দূরে, আলোকতীর্থের মুক্তিবিধৌত অঙ্গনে!…

ফ্রন্টিয়ার প্রহরীর গুলির আঘাতেই হোক, বন্যপশুর আক্রমণেই হোক, কিংবা বিঘোরে অপঘাতেই হোক হাবু মিত্রের দেহ কোন এক সময় কর্কশ পার্বত্য-ভূমিতে লুটিয়ে পড়েছিল। কোথায় সে ভূমি, কোথায় সে তীর্থ কেউ জানে না। মৃত্যুহীন শহীদের রক্তধারা কোন্ ধূলিতল সিক্ত করে জীবনের জয়গান গেয়েছিল তা বাঙালী জানে না, ভারতবাসী জানে না, বিশ্বের কোন মানুষই জানে না। তবুও এই অজ্ঞাত তীর্থে পৃথিবীর বিপ্লবকামীদের আন্তরিক শ্রদ্ধা অদৃশ্য তরঙ্গদোলায় নীরবে নিরন্তর ধাওয়া করবে।…হাওড়া জেলার 'রসপুর' গ্রাম এখনো আছে; সে-গ্রামে যে মৃত্যুহীন বিশ্বপথিক হাবু মিত্রের জন্মস্থান তা' অন্তত দেশবাসীর জানা উচিত। কিন্তু তা আমরা জানতে চাই কি?…

*   *   *   *

রডা-অভিযানের চিন্তা ও কর্ম নায়ক শ্রীশচন্দ্র পাল ১৯১৬ সনের প্রথম দিকে ধরা পড়ে 'তিন আইনে' বন্দী হলেন। স্টেটপ্রিজনার রূপে নানা জেলে ঘুরিয়ে শেষটায় তাঁকে হাজারিবাগ সেণ্ট্রাল জেলে অপরাপর রাজবন্দীদের সঙ্গে রাখা হয়েছিল। ১৯১৯ সনের শেষান্তে তিনি মুক্তি পান। সবার অলক্ষ্যে এই বীর নেতা যে কর্মকীর্তি রেখে গেছেন তা বিপ্লবীর ইতিহাসকে ধন্য করেছে। কিন্তু অজ্ঞাত-বাসের দরুণ দুঃখকষ্টে শ্রীশচন্দ্রের দেহ ভেঙে গিয়েছিল। তাই 'আর্মিস্টিসের' পর তিনি ভগ্নস্বাস্থ্যে লোকসমাজে ফিরে এলেন। স্বাস্থ্য ক্রমশ সারানর বাইরে যেতে লাগল। অথচ শয্যাশায়িত থেকেও তিনি বন্ধুদের বিপ্লবকার্যে পরামর্শ দিতেন। বিপ্লববহ্নির ধারক এই দুর্জয় পুরুষ সবার অজ্ঞাতে 'বেঙ্গল্ ভলান্টিয়ারস্'-এর পূর্বাপর প্রত্যেকটি কর্মপ্রচেষ্টায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে গেছেন। আবার সবার অজ্ঞাতে এই নিষ্কামধর্মী মহান্ ব্যক্তি আদর্শমগ্ন সার্থক নেতার মতই ১৯৩৯ সনে বিদেহী শহিদ্‌কুলের সঙ্গে মিলিত হবার আনন্দে দেহরক্ষাও করেছেন।

শ্রীশচন্দ্র পালের নাম বাঙালী জানে না। বাঙলার বিপ্লবীরাও তাঁকে তেমন মনে রাখতে পারেন নি। কারণ, তিনি ছিলেন আত্মপ্রচার-বিরোধী। সংবাদ-পত্রের কলাম্ অথবা ফটোগ্রাফারের ক্যামেরা তাঁর কাছে ছিল অবান্তর বস্তু। তাঁর মৃত্যুতে তাই তপ্ত অশ্রু ঝরে নি, সম্মানের অর্ঘ্য বিরচিত হয় নি, শোক-

সঙ্গীত গীত হয় নি। তাঁর মত নিষ্কাম সাধকের পক্ষে ইহা গৌরবের কথা, কিন্তু জাতির এতে লজ্জার সীমা নেই।

*　　*　　*　　*

রডা-ষড়যন্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা জড়িত ছিলেন ( অর্থাৎ যাঁরা ষড়যন্ত্রের প্ল্যান করা ও য়্যাকশানে যুক্ত হবার কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন ) তাঁদের মধ্যে শুধু হরিদাস দত্ত ব্যতীত অপর সকলেই লোকান্তরিত হয়েছেন। লোকান্তরিতদের পুণ্য নাম হলো শ্রীশচন্দ্র পাল, হাবু মিত্র (শ্রীশচন্দ্র মিত্র), খগেন দাস, অনুকূল মুখার্জি প্রমুখ। তাঁরা জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সংগ্রামী বাঙলাকে অক্ষয় বীর্যে সুন্দর করে রেখে গেছেন।

*　　*　　*　　*

দেশ আজ স্বাধীন ও মুক্ত। কিন্তু জীবনের কোন ক্ষেত্রেই বুঝি মুক্তি আমরা পাই নি! যতকাল মুক্তির স্বাদ আমরা ব্যক্তিক ও জাতীয় সত্তায় না পাব, ততকাল সংগ্রামের বাণী মুক্তিকামীদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে থাকবে। এ সংগ্রামকে জাতির আত্মগ্লানি ও আত্মদৌর্বল্য বিনাশে জয়যুক্ত করতে হলে মুক্তির অগ্রদূত রূপে ইতিহাসে যাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের স্মরণ রাখতে হবে। দুশ্চর তপস্যায় সিদ্ধ এই বিপ্লবীদের জীবনে ম্যাট্সিনির বাণী মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তার মর্ম আজকের ভারতীয়কেও উপলব্ধি করতে হবে :

**"Your country should be your Temple. God at the Summit, a people of equals at the base."** [ তোমার দেশ তোমার মন্দির হোক, তার চূড়ায় থাকুন ভগবান, তার ভিত্ হোক সাম্যসুখী জনতা। ]

দ্রষ্টব্য : 'রডা-অস্ত্রলুণ্ঠন' কার্যে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত শ্রীহরিদাস দত্ত এবং পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট দু'একজন বিপ্লবীর বিবৃতি গ্রন্থের "পত্রসংগ্রহে" দেওয়া হয়েছে।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## প্রথম মহাযুদ্ধে ভারত-জর্মান ষড়যন্ত্র

যে কোন বৃহৎ সফল কাজ দেখে আমরা বিস্ময়ে মুগ্ধ হই। যাঁরা সাফল্যের মুকুট পরে বরণীয় হন তাঁদেরকে নিয়ে স্বভাবতই গৌরববোধ করি। এ খুব ভাল কথা। কিন্তু ঐ সফল কর্মটি যে বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা নয়, ইহা যে আরো বহু অতীত কর্ম থেকে জন্ম নিয়েছে এবং সেসব কর্মে যে বহু ব্যর্থতার ইতিহাসও থাকতে বাধ্য তার খোঁজ আমরা করি না। বরণীয় কর্মীর পশ্চাতে অলক্ষ্যে যে বহু কর্মতাপসের অস্তিত্ব থেকে যায় তাও আমরা জানতে চাই না। "Failure is the pillar of success" কথাটি আমাদের মুখস্থ আছে বটে, কিন্তু তার তাৎপর্য আমরা ভুলে যাই। অথচ বিপ্লবীরা তা ভুলতেন না। "কাজ কর, ফলের অপেক্ষা কোরো না।"—গীতার এই বাক্যমর্ম বিপ্লবীদের পক্ষে ছিল অন্তরলব্ধ বাণী। কাজেই প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল জুড়ে বিপ্লবীদের কাজ ছিল কেবল অনন্যচিত্তে সর্বত্যাগী হয়ে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকা। এই কর্মপথে বহু ভুলত্রুটি এসেছে, বহু ব্যর্থতা দেখা গেছে। কিন্তু সেই ভুলত্রুটি ও ব্যর্থতাঘেরা কাজই যে 'সফল' কর্মের দ্বার খুলে দেয়, এ বিশ্বাস ছিল কর্মীদের। ফলে কর্মীদের বিশ্বাস জয়ী হয়েছে। সেই জয়ের স্বাক্ষর লিখিত রয়েছে কানাই-ক্ষুদিরামের পদযাত্রা থেকে আজাদ্‌হিন্দ্‌ফৌজের পথযাত্রা ব্যাপী।

আমাদের বুঝতে হবে যে, ইতিহাস চলে তার নিজস্ব পথে। তার পথচর্চা একটি ঘটনায় নয়। ঘটনাপরম্পরায় বিরচিত থাকে তার মহাপথ। মজঃফরপুরের ক্ষুদিরাম থেকে দার্জিলিঙ লেবঙমাঠের ভবানী প্রভৃতি নামী-অনামী শহিদকুলের প্রচণ্ডতম কর্মকীর্তি, রডাঅস্ত্র-সংগ্রহ, বেলেঘাটা ও কলুতাবাজার-সংঘর্ষ, বালাসোর-যুদ্ধ, চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন, জালালাবাদ যুদ্ধ, রাইটার্স বিল্ডিংস-এর অলিন্দ যুদ্ধ, গভর্নর জ্যাকসন ও এণ্ডার্সন আক্রমণ, মেদিনীপুর ও কুমিল্লায় পর পর চারটি ম্যাজিস্ট্রেট নিধন, আজাদ্‌হিন্দ্‌ফৌজ-গঠন, সেই বাহিনী কর্তৃক আন্দামানে স্বাধীন ভারতীয়-সরকার স্থাপন এবং ইম্ফলে স্বাধীনতা-পতাকা উত্তোলন—এসব কতগুলি

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। অর্ধ শতাব্দীব্যাপী বিপ্লবপ্রবাহের এরা ছোটবড় তরঙ্গশীর্ষ। বাঙলা তথা ভারতীয় বিপ্লবের দেখা ও অদেখা তরঙ্গদোলার চরম তরঙ্গশীর্ষরূপেই 'আজাদহিন্দ্‌ফৌজে'র প্রকাশ। বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় এই মুক্তিবাহিনীর কীর্তিকাহিনী লক্ষ্য করার আগে সেই কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। বিপ্লবের প্রত্যেকটি ঘটনাকে (ক্ষুদ্র বা বৃহৎ) দেখবার ও পড়বার দৃষ্টি ও রীতি না জানলে ইতিহাস বোঝা যায় না, লেখা তো দূরের কথা।

পূর্বেই বলেছি যে, ১৯১৪ সাল ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। পৃথিবীর প্রথম মহাসমর ভারতের মুক্তিকামনায় গভীর প্রেরণা দেয়। এই যুদ্ধে বিপ্লবের গতি বিপুল এবং সম্ভাবনায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে বিপ্লবীদের উদ্যোগ-আয়োজনের কিছুটা প্রকাশ নানা ঘটনার মাধ্যমে মাঝে-মাঝে দেশবাসী জানতে পেরেছে। যদিও সে জানাজানি অতি সামান্য। সবার অলক্ষ্যে যে-বিপ্লববহ্নি ধূমায়িত ছিল তার উদ্গীরণ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখলো ইংরেজ, দেখলো ভারতবর্ষ বুড়িবালামের তীরেই প্রথম।

বালেশ্বর-যুদ্ধ নিশ্চয়ই হঠাৎ ঘটে-যাওয়া এক ঘটনা নয়। এর পটভূমিকা না জানলে এ যুদ্ধের নায়কদের বীরত্ব বোঝা গেলেও তাদের সাফল্য কোন্ পথে সার্থক হলো তা বোঝা যাবে না।

বিপ্লবীরা জানতেন যে, গুটিকয়েক যুবকের আত্মদানেই ইংরেজ তাড়িত হবে না। তাঁরা জানতেন যে, ইংরেজের শক্তিস্থল ভারতীয়-সেনাবাহিনীর সাহায্য তাঁদের চাই। সে সাহায্য বৃটিশের পক্ষে কখন মারাত্মক হতে পারে তাও তাঁদের জানা ছিল। কিন্তু সুযোগ গ্রহণের শক্তি তো সঞ্চয় করতে হবে? তাঁরা জানতেন যে, সেই শক্তি রয়েছে সংঘ-সংগঠনের মধ্যে। তাই মন দিলেন তাঁরা তাঁদের সংগঠন বিপুলতর করার দিকে। সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে থাকবে তাঁদের সংস্থা। সর্বভারতীয় সামরিক-উত্থান ঘটবার পূর্বদিন পর্যন্ত তার খোঁজ কেউ পাবে না।...

বিপ্লবীদের প্রস্তুতি এভাবেই চলছিল।

১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধের সূচনায় সুযোগ সত্যি এসে গেল। ভারতীয় বিপ্লবীদের অনেকে ছাত্র রূপে এবং পলাতক বা নির্বাসিত রূপে ইউরোপ ও আমেরিকায় বাস করতেন। তাঁরা দেখলেন—সময় সমাগত। 'জর্মানি ইংরেজের শত্রু, অতএব সে ভারতের মিত্র'—এ কূটনীতি গ্রহণ করে তাঁরা বার্লিনে 'ভারতের স্বাধীনতা

লীগ' প্রতিষ্ঠিত করলেন। 'ভারতীয় লীগে'র কাজ হলো স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে জর্মানির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করা এবং ঋণস্বরূপ জর্মানির কাছ থেকে অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য গ্রহণ করা।

১৯০৫ সাল থেকেই বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীরা মধ্য ও দূর প্রাচ্যে এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারতবর্ষের মুক্তির বাণী প্রচার করে যাচ্ছিলেন। বিপ্লবাত্মক কাজে বিদেশের সহানুভূতি ও সাহায্য পাবার রাজনীতিক দাবীর কথাও তাঁরা স্পষ্ট করে বলে গেছেন। ইংরেজের কঠিন উৎপীড়ন নানাভাবে বিদেশেও তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁদের উদ্যম ও কর্মচেষ্টা ছিল তুলনাহীন। ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় বিপ্লবীরা বিদেশে খ্যাতির সঙ্গে এই চেষ্টা করে এসেছেন। এই মহৎ কর্মের উদ্যোক্তাদের কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা হবে। কারণ সবার অলক্ষ্যে, মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত হয়ে, বহু দুঃখে ও লাঞ্ছনায় যারা স্বাধীনতার বাণী ভোলেন নি—যাঁরা ত্যাগবরণে দীপ্ত হয়ে বিপদসংকুল পথে কাজ করে গেছেন—তাঁদেরকে স্মরণ করার মধ্যেই জাতির বেঁচে থাকার মন্ত্র।

প্রথমত ১৯০৫ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে আমরা জাপান, মিশর, তুরস্ক, কাবুল, লণ্ডন, প্যারী, বার্লিন, ভিয়েনা, নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো প্রভৃতি দেশে বিপ্লবী-চারণরূপে পাই—শ্যামজি কৃষ্ণ বর্মা (রাজপুতানা), মাদাম কামা (বোম্বাই), সর্দার সিংজী রাণা (কাথিওয়াড়), বীরেন চট্টোপাধ্যায় (হায়দ্রাবাদপ্রবাসী বাঙালী—সরোজিনী নাইডুর ছোট ভাই), বিনায়ক সাভারকর (বোম্বাই), ওবেদুল্লা (যুক্তপ্রদেশ), তারক দাস (বাংলা), রামচন্দ্র (পাঞ্জাব), হরদয়াল (পাঞ্জাব), বরকতুল্লা (যুক্তপ্রদেশ), ভূপেন দত্ত (বাংলা—স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই), সুধীন বসু (বাংলা), মীর্জা আব্বাস (বিহার), পাণ্ডুরং কানখোজি, খগেন্দ্রচন্দ্র দাস (বাংলা), অধর লস্কর (বাংলা) এবং আরো অনেককে।

অতঃপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে (অর্থাৎ ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত) এবং তৎপরও স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কাল পর্যন্ত যাঁরা কতিপয় বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাধীনতাকামী ভারতের কূটনৈতিক সম্বন্ধ রক্ষা করে বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে সার্থক করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম—বীরেন চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ বিষ্ণু সুখতনকর (মহারাষ্ট্র), ধীরেন সরকার (বাংলা), অজিত সিং (পাঞ্জাব), প্রমথ দত্ত (বাংলা), ডাঃ ভূপেন দত্ত, পাণ্ডুরং কান্‌খোজি, বরকতুল্লা, খানচাঁদ বর্মা (যুক্তপ্রদেশ), রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ

(যুক্তপ্রদেশ), লালা লাজপৎ রায় (পাঞ্জাব), শিবপ্রসাদ গুপ্ত (যুক্তপ্রদেশ), জাফর আলি খাঁ (যুক্তপ্রদেশ), হৃষীকেশ লট্টো (পাঞ্জাব), ডাঃ হাফিজ (যুক্তপ্রদেশ), হোরমনজী ফারশাপ (বোম্বাই), তারক দাস (বাংলা), রজবলী (পাঞ্জাব), হেরম্ব গুপ্ত (বাংলা), নন্দকার (বোম্বাই), বীরেন দাশগুপ্ত (বাংলা), চম্বুয়া (মাদ্রাজ), রাসবিহারী বসু (বাংলা), মানবেন্দ্র রায় (বাংলা), হেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিত (বাংলা), ধনগোপাল মুখার্জী (বাংলা), শৈলেন ঘোষ (বাংলা), সুরেন কর (বাংলা), আবদুল ওয়াহেদ (বিহার), পিংলে, সত্যেন সেন, জিতেশ লাহিড়ী, হরনাম সিং, সুরেন বসু, ডাঃ মনসুর (যুক্তপ্রদেশ), চম্পকরাম পিল্লাই (ত্রিবাঙ্কুর), রামচন্দ্রজি, ভগবান সিং (পাঞ্জাব), হরদয়াল (পাঞ্জাব), সরদার ওমরাও সিং (পাঞ্জাব), অবনী মুখার্জী (বাংলা)। [ বাংলায় বিপ্লববাদ—পৃঃ ২৪৪, ২৪৫ ]

এবার জর্মান-ভারত-ষড়যন্ত্রের কথায় আসা যাক। বিদেশে নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবীদের চেষ্টায় জর্মান-সরকার অবশেষে ভারতে বিপ্লব ঘটানর কাজে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে রাজি হলেন। এদিকে ভারতবর্ষেও বিপ্লবীরা রাসবিহারী বসু ও যতীন মুখার্জীর নেতৃত্বে একটি নির্দিষ্ট তারিখে ভারত-ব্যাপী সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত করার আয়োজনে তৎপর হয়েছেন। সারা উত্তর ভারতে, বিশেষ করে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে, রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে প্রচারকার্য ও সংগঠনকার্য করে যাচ্ছিলেন বহির্বাংলার বাঙালী-অবাঙালী বিপ্লবীরা। বাঙলার বিপ্লবীরা যতীন মুখার্জীর নেতৃত্বে সমস্ত ঘাঁটি আগলে আছেন জর্মান-অস্ত্রবাহী-জাহাজের অপেক্ষায়। অস্ত্র পাওয়া মাত্র ভারতবর্ষময় তা বিলি হয়ে যাবে একই লগ্নে সশস্ত্র-বিদ্রোহ করবার জন্যে। বিপ্লবীরা ভাল করেই জানতেন যে, সামান্য কয়েক হাজার সৈন্যকে বৃটিশসিংহ দেশময় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাচ্ছে শেয়ালের 'কুমীরের ছানা' দেখানর মত। আসলে তাদের অধিকাংশ সেনাবাহিনী-ই চলে গেছে ভারতের বাইরে মহাযুদ্ধের নানা প্রাঙ্গণে। কাজেই স্বল্প আঘাতে বৃহৎ পতন ঘটাবার এই সুযোগ। তাই সানন্দে শত্রুর দিকে তাক্ করে দাঁড়িয়ে আছেন বীরের দল। মৃত্যুর ভয় বিদূরিত মহামৃত্যুর আহ্বানে। অভূতপূর্ব সে অপেক্ষা। বাংলা তথা ভারতের তরুণ শক্তির ধনুকে টঙ্কার। লক্ষ্যভেদের হুকুমের প্রত্যাশায় সে কি একাগ্র আকিঞ্চন!...

* *

BIRCHAND LIBRARY

কিন্তু ইতিহাস-দেবতার পথ বড়ই জটিল। জাতিকে বহু ত্যাগ ও দক্ষ কর্মের পথে চলতে হবে আরো অনেক কাল। কাজেই ব্যর্থ হলো ষড়যন্ত্র।...

ঘরে-বাইরে বিশ্বাসঘাতকতার ফলে অস্ত্র-বাহী জাহাজ 'ম্যাভারিক' ভারতবর্ষের কূলে ভিড়তে পারল না। জাভার উপকূলে ধরা পড়ল সেই জাহাজ। অপর জাহাজ 'অ্যান্ লুই'ও ভারতে পৌঁছাতে পারে নি।...ক্রমে সংবাদটি প্রচারিত হল। এদিকে বাংলায় ও ভারতে যাঁরা প্রহর গুণে গুণে নানা ঘাঁটি আগলে অপেক্ষা করছিলেন, তাঁরা হতাশ হলেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারীর (১৯১৫) **'ভারতীয় সশস্ত্র-উত্থান-দিবস'** ভারতবাসীর নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতায় আর আলোকের মুখ দেখলো না। ব্যাপক ধরপাকড় ও তল্লাসির ফলে সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেছে। এক পাঞ্জাবেই দু'হাজার শিখ গ্রেপ্তার হলেন। বাঙলার কথা বলাই অবান্তর।...

* * * *

রাসবিহারী বাঙলায় ফিরে এলেন। তাঁকে খুঁজছে পুলিশ। বহু সহস্র টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে তাঁকে ধরিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু সবাইকে ফাঁকি দিয়ে তিনি তাঁর আরব্ধ কর্ম সার্থকতর রূপে সম্পন্ন করার সংকল্পে 'পি, এন, ঠাকুর' এই ছদ্মনামে পালিয়ে গেলেন জাপানে। এই ঐতিহাসিক পলায়নের তারিখ হল ১২ই মে, ১৯১৫ সাল।...

যতীন্দ্রনাথের কীর্তিকাহিনী যথাস্থানে বলা হবে।...

## গদর পার্টির অবদান

প্রখ্যাত বিপ্লবী হরদয়াল আমেরিকায় অবস্থান কালে একখানা কাগজ চালাতেন। তার নাম দিয়েছিলেন "গদর"—অর্থাৎ বিদ্রোহ। বৃটিশের শাসন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার কথা বলে যাওয়াই ছিল সে-কাগজের উদ্দেশ্য। দিনের পর দিন কাগজখানা বিদ্রোহের বাণী প্রচার করছিল। ইংরেজি 'গদর' কাগজের লেখাগুলো হিন্দি, উর্দু ও গুরুমুখী ভাষায় তর্জমা করে আমেরিকা ও ইউরোপে অবস্থিত এশিয়া এবং আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে এবং ভারতে দেশীয় সৈন্যদের হাতে নিয়মিত পৌঁছে দেওয়া হত।

হরদয়ালজির পাণ্ডিত্য, দেশপ্রেম, ভয়হীনতা ও বৈপ্লবিক-চিন্তার স্পষ্টতা তাঁকে ভারত-জর্মান-ষড়যন্ত্রের পুরোভাগে স্থান দিয়েছিল। বিদ্রোহের কাজ করার জন্যে পূর্ব থেকেই যে-সংস্থা গঠিত হয় তার নামও 'গদর'। গদর দলের অন্যতম

শ্রেষ্ঠ কর্মী ছিলেন রামচন্দ্র ও বরকতুল্লাহ। জর্মান-যুদ্ধ শুরু হতেই বহু ভারতীয় ভক্ত দলের সভ্য হতে লাগলেন।

১৯১৭ সালের মার্চ মাসে বৃটিশের প্ররোচনায় মার্কিন সরকার হরদয়ালকে গ্রেপ্তার করে জামিনে মুক্তি দেয়। হরদয়াল মুক্তির সুযোগ নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে চলে আসেন। চলে এসেই জর্মান গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। সুরেন কর, তারক দাস, বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভারতীয় বিপ্লবীরা তখন বার্লিনকে কেন্দ্র করে বিপ্লবের কাজ করে যাচ্ছেন। তখনই ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশনাল লীগ স্থাপিত হয়েছে। এই পার্টি জর্মান রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে সে-সময়েই তৎপর হয়ে উঠেছে। সেই সময়েই সুরেন বসু ( পরে 'Bengal Water Proof প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ) কলকাতা থেকে জাপান হয়ে প্যারিসে এসে বোমা তৈরি শিখে গদর দলের 'বমব-এক্সপার্ট' হয়ে গেছেন।

* * * *

১৯০৩ সাল থেকেই কানাডা প্রবাসী শিখদের ও অন্যান্য ভারতীয়দের মধ্যে ভীষণ অসন্তোষ দেখা দেয়। তার কারণ হলো ক্যানাডার 'এমিগ্রেশন'-আইন। ক্যানাডায় সে-সময় হাজার চারেক পাঞ্জাবী শ্রমিক বাস করতেন। তারা সকলেই নূতন চালু-হওয়া এই আইনে নিতান্ত অসুবিধায় পড়ে গেছেন। গদর-পার্টির পক্ষে শিখ তথা পাঞ্জাবীদের এই অসন্তোষ ও অসুবিধা বিদ্রোহের কাজে লাগাতে দেরি হলো না।...

ঠিক ঐ সময়েই আর একটি ব্যাপার ঘটে যায়। সিঙ্গাপুরের ব্যবসায়ী গুরুদিৎ সিং ১৯১৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল জাপানী জাহাজ 'কোমাগাটামারু' ভাড়া করে বাহ্যত ব্যবসায়ের সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশে শ্রমজীবী শিখদের নিয়ে হংকং থেকে ক্যানাডায় যাত্রা করেন। কিন্তু ভিতরের উদ্দেশ্য ছিল 'এমিগ্রেশন' আইনকে চ্যালেঞ্জ করা।

জাহাজে যাত্রী ছিলেন ৩৭২ জন। ইয়াকোহামা ও মাঝের অন্যান্য বন্দরে জাহাজটি পৌঁছতেই ভারতীয় বিপ্লবীকর্মীরা জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে 'গদর'-পত্রিকা ছড়িয়ে দিতে থাকেন। বন্দরে-বন্দরে বিপ্লবের মন্ত্র তাঁদের কানে আসতে থাকে। কিন্তু তখন পর্যন্ত বিপ্লবের 'বাণী' তাদের মর্মে প্রবেশ করে নি।

'মে'-মাসের শেষ ভাগে 'কোমাগাটামারু' ভ্যাংকোবারে এসে পৌঁছল। ক্যানাডার কর্তৃপক্ষ শিখদের জাহাজ থেকে নামতে দিলেন না। বাধ্য হয়ে

জাহাজটি ৩৭২ জন যাত্রী নিয়ে ফিরে চলল। স্বভাবতই যাত্রীদল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন ক্যানাডার আচরণে। বহু আশায় যথাসর্বস্ব বিক্রয় করে তাঁরা ঘর ছেড়ে দূর ক্যানাডায় ভাগ্যান্বেষণে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত ও সম্বলহীন অবস্থায় কুকুরের মত তাড়িয়ে দিল তাঁদেরকে ক্যানাডা-সরকার। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, বৃটিশের প্রজা এই ভারতীয়দের নিশ্চয়ই রক্ষা করবে বৃটিশ-রাজ। ক্যানাডীয় জাতি-বিদ্বেষী এ-আইনের কবলে তাদের পড়তে হবে না। কিন্তু কাষিত বৃটিশ-সিংহ থাবা গুটিয়ে রইল। রুষ্ট ও ব্যর্থ এই মানুষগুলোর 'মর্মে' তখন গদর-পার্টির বিদ্রোহবাণী মন্ত্রের মত কাজ করল। তাঁরা দেহে বুভুক্ষু, চিত্তেও তাই। অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেবার উপায় কি? তাঁরা গোগ্রাসে বিদ্রোহাত্মক কাগজ-পত্তর পড়তে লাগলেন। ঠাণ্ডা হরফগুলো এখন যেন বোমার মত ফেটে পড়তে চায়!…মনে হয়—

"নূতন জাগিয়া শিখ
নূতন উষার সূর্যের পানে চাহে নির্নিমিখ॥"

ক্রমে জাহাজখানা হংকং বন্দরে এলো। কিন্তু সেখানেও কাউকে নামতে দেওয়া হলো না। খাদ্যের অভাবে যাত্রীরা মরীয়া হয়ে উঠেছেন। গুরুদিৎ সিং সে-কথা হংকং-এর কর্তৃপক্ষকে জানালেন। কিন্তু বৃটিশ-দূত তাঁদের নামতে দেওয়া তো দূরের কথা, খাদ্যদ্রব্য পর্যন্ত জাহাজে তুলতে দিলেন না। অবস্থা দ্রুত সঙ্কটজনক হতে লাগল। শেষটায় ভারত-গভর্নমেণ্টের নির্দেশে কিছু খাদ্য সরবরাহ করে যাত্রীবাহী জাহাজটিকে কলকাতার দিকে রওনা করে দেওয়া হল।…

যাত্রীরা ইতিমধ্যে মনের দিক থেকে বৃটিশ-বিদ্বেষী হয়ে গেছেন। বিদ্রোহীর ভূমিকায় নাববার জন্যে তাঁরা উদগ্রীব। তাঁরা অনেকেই ভারতে ফিরতে রাজি ছিলেন না। হংকং বা সিঙ্গাপুরে নাববার জন্যে তাঁরা আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু সরকার তা' হতে দেবে না। কাজেই আরোহীদের উত্তেজনার শেষ নেই।…

১৯১৪ সালেরই ২৯শে সেপ্টেম্বর কলকাতার দক্ষিণে বজবজ-পোতাশ্রয়ে 'কোমাগাটামারু' এসে পৌছয়। সরকার পূর্ব থেকেই একটি ট্রেন বজ্‌বজে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ঐ গাড়িতে যাত্রীদের তুলে সরাসরি তাঁদের পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দেওয়া। এতগুলো ক্ষিপ্ত মানুষকে যুদ্ধের দুর্দিনে অন্তত বাঙ্লার খালি মাঠে ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না বলেই এ-আয়োজন।…

কিন্তু শিখযাত্রীদল জাহাজ থেকে নেমেই পায়ে হেঁটে কলকাতার দিকে রওনা হলেন। অসৎ বৃটিশের ব্যবস্থায় ট্রেনে তাঁরা উঠবেন না।

কলকাতার পুলিশ-কমিশনার স্যার ফ্রেডারিক এবং ২৪-পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডোনাল্ড পুলিশ ও সেনাবাহিনী নিয়ে যাত্রীদের বাধা দেন। সংঘর্ষ সুরু হয়ে যায়। শিখদের অনেকের কাছে আমেরিকান্ পিস্তল ছিল। উভয় পক্ষে সক্রোধে গুলীবর্ষণ চললেও স্বভাবতই পুলিশের রাইফেলের কাছে যাত্রীর পিস্তল হেরে গেল। শিখরা ইতিমধ্যে প্রাণ দিয়েছেন আঠার জন। আহত হয়েছেন বহু। ইংরেজের স্যার ফ্রেডারিক ও মিঃ 'হাম্ফরি'-কে আহত করেছে বিদ্রোহীর বুলেট। মৃত্যু ঘটেছে তাঁদেরই অস্ত্রে আর একজনের। নাম তাঁর মিঃ লোমেক্স।···

তিনশত বাহাত্তর জন যাত্রীর মধ্যে ষাট জনকে ট্রেনে চাপিয়ে পাঞ্জাব পাঠান গেল। কিছু মারা গেলেন। কিছু আহত অবস্থায় ধরা পড়লেন। বাকি সবাই পলাতক হলেন। তবে কিছুদিনের মধ্যে তাঁদের অনেকে ধরা পড়লেও গুর্‌দিৎ সিং ও তাঁর ২৮ জন সঙ্গী শেষ অবধি ধরা পড়েন নি।..

কোমাগাটামারু সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারেই গুর্‌দিৎ সিং-এর নেতৃত্ব ও সুদক্ষ পরিচালনা বিশেষ প্রশংসনীয়।

* * *

কোমাগাটামারু-সংঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন বস্তু নয়। এর গুরুত্ব বিপ্লবের ইতিহাসে প্রচুর। সমস্ত ব্যাপারটির পেছনে গদর-পার্টির কলকাঠি সচল ছিল বলেই জাহাজের সাধারণ মানুষগুলো বিদ্রোহীর ভূমিকায় একটি ঐতিহাসিক সংঘর্ষের নায়ক হবার সুযোগ পেলেন।···

'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল লীগ' ভারত-জর্মান ষড়যন্ত্রের রূপদানে তৎপর। গদর-পার্টি ভারতে ও ভারতের বাইরে তার সবটুকু আয়োজন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই লীগ-এর নেতৃত্বে, বিদ্রোহ-পরিকল্পনায়। কোমাগাটামারুর যাত্রীদের নিধনে সারা পাঞ্জাব খেপে গেছে। খেপে গেছে বাংলা ও বিপ্লবী-ভারত।...২৯শে অক্টোবর (১৯১৪) 'টোসামারু' নামে অপর একটি জাহাজ আমেরিকা, মেনিলা, চীন, সাংহাই, হংকং ঘুরে বহু ভারতীয় নিয়ে কলকাতায় এসেছে। আরোহীদের অধিকাংশ শিখ। এঁদের সঙ্গে বিপ্লবী কর্মীও ছিলেন অনেক। তা ছাড়া ঐ সময়েই 'এস্-এস-সালামির' জাহাজে শিখযাত্রীদের সঙ্গে-ও কিছু দায়িত্বশীল 'দুর্ধর্ষ

বিপ্লবী আসেন। এসব বিপ্লবীরা অনায়াসে উত্তর ভারতে চলে যান। রাসবিহারীর নেতৃত্ব সকলের মত 'গদর' দলও মেনে নেওয়ায় ভারতবর্ষের বিপ্লবধারার দুই কূল কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। দেশে ও বিদেশে বিপ্লবের নায়কগণ রাসবিহারীর মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন সর্বভারতীয় বিপ্লবের মহানায়ককে। উত্তর ভারতে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন শচীন সান্যাল প্রমুখ বাঙালী বিপ্লবী ছাড়া মহারাষ্ট্র, উত্তর ভারত, পাঞ্জাব ও দক্ষিণ প্রান্তের পিংলে, বিনায়ক রাও, কাপ্‌লে, দামোদর স্বরূপ, প্রতাপ সিং, আউধবিহারী, বালমুকুন্দ, বাচ্চা সিং, কর্তার সিং প্রমুখ কর্মসঙ্গীরা। তাঁরা সেনাবাহিনীগুলোর মধ্যে বিপ্লবের বীজ বুনে যাচ্ছিলেন। কোমাগাটামারু-সংঘটনায় পাঞ্জাবী-রেজিমেণ্টে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হচ্ছিল। যথাসময়ে সৈন্যরা বিদ্রোহে অবশ্যই যোগ দেবেন বলে বিপ্লবের নেতারা আশ্বাস পেয়েছিলেন। গদর-পার্টি রাসবিহারীর নেতৃত্ব মেনে নেওয়াতে বিদেশেও বিপ্লবের প্রস্তুতি জোর কদমে এগিয়ে চলল। এক আমেরিকায়-ই গদর-দলের ৭২টি শাখা বর্তমান ছিল। পার্টির কর্মীরা দলে দলে বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্যে ভারত অভিমুখে ধাওয়া করলেন।

"আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি!"

অনেকে এসে পৌঁছলেন স্বদেশে। অনেকে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে বন্দী হলেন। অনেকের দেশের মাটিতে নাববারও সুযোগ হলো না। কিন্তু বিপ্লবের প্রস্তুতি এগিয়ে চলল।...

পূর্বেই বলেছি যে, বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্য রূপ। বিপ্লবীরা ব্যর্থ হলেন। মন্ত্রগুপ্তির অভাবে ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে ১৯শে ফেব্রুয়ারীর (১৯১৫) 'ভারতীয় সশস্ত্র-উত্থান' যে আলোকের মুখ দেখতে পেল না তা পূর্বেই বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, সফলতর বিপ্লব-রচনার মানসে রাসবিহারীর অন্তর্ধানের কথা।...

বলছিলাম বটে, বিপ্লবীরা ব্যর্থ হলেন। কিন্তু 'বিপ্লব' তাতে ব্যর্থ হয় নি। পাঞ্জাব ও বাঙলা সেদিন বড়ো কাছাকাছি এসে নিজেদের বক্ষশোণিত-ধারা একটি খাতে বইয়ে দিয়েছিল একটি সংকল্প নিয়ে। সে অমূল্য অবদান কি ব্যর্থ হবার?...

* * * *

সুদীর্ঘ সাধনা, সীমাহীন দুঃখবরণ, অপরিমিত ধৈর্য ও প্রত্যয় এবং আপোষহীন

বৈপ্লবিক কর্ম-রচনায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত বাঙলা তথা ভারতের বিপ্লবচেষ্টার ঐতিহ্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। তথাপি 'রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?'…'স্বর্গ কি হবে না কেনা?' সত্যি কি বিপ্লব ভারতের জমিতে সার্থক হয়ে উঠবে না?…

মহাজাতির মহাকবির কামনাই তো মহান্ ঋষির ভবিষ্যদ্বাণী।…তাই দেখা গেল ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ভারতীয় বৈপ্লবিক-ঐতিহ্যে শক্তিমান সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগ সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। ১৯৪১ সনের ১৭ই জানুয়ারি বন্দী অবস্থায়ই পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে সুভাষচন্দ্র পালিয়ে গেলেন বার্লিনে। নূতন করে গড়ে তুললেন তিনি অধিকতর সাংগঠনিক-ক্ষমতায়, শক্তিতে ও নৈপুণ্যে ইন্দো-জর্মান-ষড়যন্ত্রের বনিয়াদ। ১৯৪১ সনের ২রা নভেম্বর বার্লিনেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হলো 'আজাদ-হিন্দ-ফৌজ'।…

এদিকে রাসবিহারী বসুও চুপ করে রইলেন না। জাপান-সরকারের সহযোগিতায় ভারতীয় বন্দী-সৈন্যদের মুক্ত করে সংগঠিত করলেন তিনি ইতিহাসবিশ্রুত 'স্বাধীনতা লীগ'। তিনিই ডেকে আনলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে। সঁপে দিলেন তাঁর হাতে 'স্বাধীনতা লীগের' সর্বনেতৃত্ব। বিপ্লবী-মহানায়ক পরিতৃপ্ত হলেন মহান্ জননায়কের বৈপ্লবিক নেতৃত্বের আবির্ভাবে। রাসবিহারীর এই ক্ষমতা-সমর্পণ এক অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক ঘটনা। এ যেন 'অসুর'-শক্তিকে স্তব্ধ করার সংকল্পে মহাতাপস দধীচি নিজের অস্থি-দিয়ে-গড়া বজ্রখানি তুলে দিলেন দেবরাজ ইন্দ্রের শৌর্যদীপ্ত হস্তে।…

দিব্য-শক্তিতে সংগঠিত হলো 'আজাদ-হিন্দ-ফৌজ', 'আজাদ-হিন্দ-হুকমতে'র অধীনে। বিপ্লব সার্থকতায় এগিয়ে চলল বর্মার উপকূলে, ভারত সীমান্তের রণাঙ্গনে, লালকেল্লার অভিমুখে।…

## বালেশ্বর যুদ্ধ

পূর্বেই বলেছি দেশে ও বিদেশে বিদ্রোহ দমনে পুলিশ তৎপর হয়ে উঠেছে। 'বালেশ্বর ইউনিভার্সাল্ এম্পোরিয়ামে' কলকাতার পুলিশ ঢু মারল। এটি বিপ্লবীদের এক গোপন আড্ডা। কলকাতার বিপ্লবী নেতা হরিকুমার চক্রবর্তী মহোদয়ের 'হ্যারি এণ্ড সন্স' তলাসী হয়ে গেছে। ওখান থেকেই এ গোপন আস্তানাটির ঠিকানা পুলিশের হাতে এসেছে। তারপর কাপ্তিপোদায় যে গৃহে

যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি সতীর্থদের সঙ্গে বাস করতেন তা-ও পুলিশ ঘেরাও করেছে কিন্তু কাউকে ধরতে পারে নি।

যতীন্দ্রনাথও ভারযাতের সফলতর বিপ্লব-সম্ভাবনার জন্যে পালিয়ে অপেক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। তিনি দেখলেন যে, বিপ্লব আপাতত ব্যর্থ হয়েছে। বিরাট ষড়যন্ত্র সকলের অজ্ঞাতে সংঘটিত হয়ে সকলেরই অজ্ঞান্তে ফেঁসে গেছে। জাতির সম্মুখে তুলে ধরবার মত আদর্শ ও প্রত্যয় কিছু রেখে না গেলে এই ব্যর্থতায় দেশ অবসন্ন হয়ে পড়বে, মুক্তিসংগ্রামের সম্ভাবনাও পিছিয়ে যাবে। এ ব্যর্থতার মূলে দলের কতকগুলো লোকেরই দুর্বলতা ও নীচ বিশ্বাসঘাতকতা বর্তমান। তাকে অতিক্রম করে এমন বলিষ্ঠ কীর্তি প্রতিষ্ঠিত করা দরকার যার আলোয় সকল নৈরাশ্যবাদ দূর হয়ে যাবে। কাজেই মৃত্যুহীনের ভৈরব-গীত শোনাতে হবে আগামী দিনের সংগ্রামী তরুণ-ভারতকে।...

যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি

যতীন্দ্রনাথকে কেউ থামাতে পারলেন না।...তিনি সর্ববরেণ্য নেতা। তিনি শক্তিধর পুরুষ। অন্ধকারে তাঁর মত নেতাই তো পথ দেখাবেন। তাঁকে পথ বাতলে দেবার স্পর্ধা কারো হতে পারে না। তবু একটি প্রিয়জনের সে-স্পর্ধা হয়েছিল। তাতে বিজড়িত ছিল বন্ধু ও নেতাকে দুর্দিনে আরো কাছে পাবার আকুতি। 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কোন শুভানুধ্যায়ীর সাবধান বাণীর উত্তরে পলাতক যতীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "খালি প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্য কি লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াব? আজ আমরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে যাব।" ..এই উক্তি তাঁর পক্ষেই সম্ভব, যাঁর জ্যেষ্ঠা ভগ্নীও দূর থেকে কানে-কানে বাণী পৌঁছে দেন প্রাচ্যের বীরাঙ্গনারই মত—"দেখো, যেন শুনতে না হয় সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ।"...

চিত্তপ্রিয় রায়, নীরেন দাসগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও জ্যোতিষ পাল সহ যতীন্দ্রনাথ বুড়িবালামের তীরে গোবিন্দপুর গাঁয়ে এসেছেন। তখন ভাদ্র মাস। ভরা

নদী পার হলেন। বনের দিকে পথ চলতেই গাঁয়ের লোকেদের সন্দেহ হলো। কারণ দেশে দেশে, শহরেও গ্রামে পুলিশ ঢোল সহযোগে জানিয়ে দিয়েছে যে, কতকগুলো জর্মান ও দেশী ডাকাত ঘুরে বেড়াচ্ছে খুব গোপনে গৃহস্থদের টাকাপয়সা লুটবার জন্যে। অবশ্য তাদের ধরিয়ে দিতে পারলে সরকার বিস্তর পুরস্কার দেবে।...

গ্রামের লোকেরা যতীন্দ্রনাথদের পেছন নিল। তাদের নানা প্রশ্নের উত্তরে বিপ্লবীরা অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, অহেতুক আগ্রহ নিয়ে তাদের ভিড় করা উচিত নয়। ভিড়ের মধ্যে পুলিশের লোকও এসে গেছে। তারা জনতাকে উস্কানি দেওয়ায় অনেকে বিপ্লবীদের পশ্চাতে ধাওয়া করল। বাধ্য হয়ে বিপ্লবীরা গুলী ছুঁড়লেন। ধারেপাশে তখন আর কেউ রইল না। 'চাষখন্দে'র কাছে সাঁতরে আবার নদী পার হতে হল। পঞ্চ বীর বসলেন একটি উইয়ের ঢিবির পাশে। ক্ষুধায় ও তাড়নায় সবার দেহ শ্রান্ত। তারপর কি করে পল্লীর অবোধ জনতা এবং পুলিশবাহিনী কর্তৃক দু'দিক থেকে ঘেরাও হয়ে ১৯১৫ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর বীরশ্রেষ্ঠ যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি ও তাঁর সুযোগ্য সতীর্থচতুষ্টয় সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন তা' ইতিহাসপ্রখ্যাত হয়ে আছে। সেখানে পঞ্চ-বীরের অপূর্ব শৌর্য প্রদর্শন এবং যতীন্দ্র-চিত্তপ্রিয়ের মৃত্যুবরণ বিপ্লবী-ভারতকে বহ্নিস্নানে শুদ্ধ করে দিয়েছিল।...

বালাসোরের যুদ্ধে পাঁচটি 'মাউজার' পিস্তল বিপ্লবনেতা যতীন্দ্রনাথের বীর্যমন্ত্রে ও তার তরুণ শিষ্য চিত্তপ্রিয়-মনোরঞ্জ-নীরেন-জ্যোতিষের অসহ্য সাধনায় কী দুর্জয় শক্তি ধারণ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইংরেজের রাইফেল-এর প্রত্যুত্তর প্রচণ্ডতম আঘাতে দিয়ে যাচ্ছিল তার সংবাদ ভারতবাসী সেদিন জেনেছিল। এই খণ্ডযুদ্ধে অগ্নিস্বাক্ষরে জাতির শৌর্যময় এক ঐতিহ্য রচিত হল। পশ্চাতে পড়ে রইল তাদের কলঙ্কবার্তা, যাদের বিশ্বাসঘাতকতায় 'বিপ্লব' সেদিন সার্থক হতে পারে নি। ভারতবর্ষের যৌবন এহেন অপরূপ সাহসিকতায় আত্মপ্রত্যায় ফিরে পেল। অকুণ্ঠ এই আত্মদানের আলোকশিখা থেকেই আপন আলোকবর্তিকা জেলে নিয়ে বিপ্লবী তাঁর ভবিষ্যতের পথ চলেছেন: এবং দিনের পর দিন অজস্র বাধা ও ব্যর্থতাকে পায়ে দলিত করে এগিয়ে এসেছেন বিপ্লবপন্থীরা চট্টগ্রাম-রাইটার্স-মেদিনীপুর সংঘর্ষের কাল থেকে 'আজাদ-হিন্দ-ফৌজের' যুগে। অর্ধশতাব্দীর বন্ধুর পথের যাত্রীদলের উত্তর-সুরী হলেন ইম্ফলের মুক্তিফৌজ। বিপ্লব-নেতৃত্বের সার্থকতম পরিণতি হল নেতাজির নেতৃত্ব।...

# তৃতীয় অধ্যায়

## আরো খণ্ডযুদ্ধ

"বন্ধু বলিয়া কণ্ঠে জড়াও পথে পেলে মৃত্যুরে!"

—নজরুল ইসলাম

দেশ জুড়ে ব্যাপক ধরপাকড় চলেছে। বহু কর্মী আটক হয়েছেন। বহু রয়েছেন পলাতক। বালাসোর-যুদ্ধ একটি শিক্ষা দিয়ে গেছে। সে-শিক্ষার বাণী হলো: "সিংহশিশু, পিঞ্জরাবদ্ধ হোয়ো না। হাতে অস্ত্র থাকলে, পালাবার পথ রুদ্ধ হলে সম্মুখযুদ্ধে আত্মদান করো।"

এ শিক্ষা বড় সাধারণ শিক্ষা নয়। এর মূল্য প্রচুর। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। বীরের অন্তর যদি আত্মাহুতির সংকল্পে শুদ্ধ থাকে তবে তাঁদের আদর্শে জাতির দুর্বলতা ঘুচে যায়। সবল জাতিকে পৃথিবীর কোন শক্তি পদানত করে রাখতে পারে না।

*　　*　　*　　*

১৯১৭ সাল। গৌহাটী শহরে অনেক পলাতক বিপ্লবী গোপনে বাস করছেন। তাঁরা অনুশীলন-সমিতির ভুবনের দল। তাঁদের আড্ডাস্থল একদিন পুলিশ ঘেরাও করে। বিপ্লবীরা লড়াই শুরু করেন। লড়াইয়ের ফাঁকে সবাই পালিয়ে যান।...পলাতকেরা 'নবগ্রহ পাহাড়ে'র দিকে কোথাও একত্র হন। পুলিশ টের পায়। সদলবলে ৯ই জানুয়ারি পুলিশবাহিনী তাঁদের পুনরায় ঘেরাও করে। তখন রাতের অন্ধকার। বিপ্লবীরা যুদ্ধ শুরু করেন। জনকয়েক পালিয়ে যেতে পারেন। নলিনী ঘোষ প্রমুখ আহত অবস্থায় ধরা পড়েন। গৌহাটির খণ্ডযুদ্ধে পুলিশের পক্ষে তিরিশজন আহত হয়। বিপ্লবীরা ছিলেন গুটি দশেক।...

এই বছরই সিরাজগঞ্জে 'তেনজিয়া' গ্রামেও গোবিন্দ কর ও নিকুঞ্জবিহারী পাল বহুক্ষণ ধরে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করেন। গোবিন্দ করের দেহ সাতটি স্থানে গুলিবিদ্ধ হয়। পুলিশ পক্ষের বহুজন আহত অবস্থায় গোঙাতে থাকে। গোবিন্দবাবু

ও নিকুঞ্জবাবু দ্বীপান্তরিত হন। গোবিন্দ কর কারাদণ্ড শেষ করে এসে পুনরায় 'কাকোরী-ষড়যন্ত্র মামলা'য় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

* * * *

১৯১৮ সালের ১৫ই জুন। ঢাকা কলতাবাজারের একটি গৃহদ্বারে আবার বিপ্লবীর পিস্তল গর্জে ওঠে। নলিনী বাগচি গৌহাটি খণ্ডযুদ্ধের পলাতক বিপ্লবী। তিনি এবং তারিণী মজুমদার সংগোপনে হরিচৈতন্যবাবুর আশ্রয়ে আছেন। পুলিশ টের পায়। গোয়েন্দাবিভাগের কর্মচারী বসন্ত মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ঐ আস্তানায় পুলিশ হামলা করে। বিপ্লবীরা বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়েন পুলিশের উপর। দুরন্ত সংগ্রাম চলে অনেকক্ষণ। দুর্জয় বীর নলিনী বাগচি ও তারিণী মজুমদার শহিদের মৃত্যু বরণ করেন। হরিচৈতন্যবাবু ধরা পড়েন ও দণ্ডিত হন। পুলিশ পক্ষের অনেকে এবং বসন্ত মুখোপাধ্যায় স্বয়ং গুরুতর আঘাত পান।

* * * *

অতঃপর ১৯১৯ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড স্তিমিত হয়ে আসে। তার কারণ রাজনীতিক-জগতে যুদ্ধোত্তর অবস্থার পরিবর্তন ও গান্ধীজির নূতনতর যুদ্ধ-টেক্‌নিকের আমদানি। মহা-যুদ্ধের বিরতির পর মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড-সংস্কার রূপ একটি মাকাল ফল ধুরন্ধর ইংরেজ ভারতবাসীকে উপঢৌকন দিলে কংগ্রেসের নরম-পন্থী দল দেশনেতা সুরেন বাড়ুজ্যের নেতৃত্বে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে হাত মেলালেন। এদিকে 'রাউলাট্‌ এ্যাক্ট', **Indian unrest** গ্রন্থে লোকমান্য তিলককে **'evil genius'** বলে গালি দেওয়া ও অন্যান্য কুৎসা প্রচারের জন্যে উহার লেখক ভ্যালেন্‌টাইন চিরলের বিরুদ্ধে তিলক কর্তৃক বিলেতে মানহানি মকদ্দমা আনয়ন, জালিনওয়ালাবাগে বৃটিশ বর্বরতা, ঐ কারণে রবীন্দ্রনাথের 'স্যার' উপাধি বর্জন এবং গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনের আহ্বান সমগ্র ভারতে আবার বৃটিশ-বিরোধী গণ-চেতনা গড়ে ওঠায় সাহায্য করছিল।

সত্যাগ্রহ শুরু করবার পূর্বে গান্ধীজি চেষ্টা করেছিলেন ইংরেজের বিপদে তাকে সাহায্য করে তার কাছ থেকে কিছু আদায় করে নিতে। তাই তিনি ইংরেজের যুদ্ধ-উদ্যমে সাহায্য করার জন্যে ভারতীয়-সেনা-সংগ্রহে লেগে যান। এই সময়ই (১৯১৮ সনে) বাংলা দেশে এক জনসভায় তিনি বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিষোদ্গার করেন। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে তাঁর সহায়তা দানের প্রত্যুত্তরে বিজয়ী

বৃটিশ যখন ভারতকে 'রাউলাট্ এ্যাক্ট' ও 'জালিনওয়ালাবাগ-ম্যাসাকার' উপহার দিল, তখন গান্ধীজির চৈতন্য হল।

গান্ধীজি অপূর্ব শক্তিতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলেন। বিদ্যুৎস্পর্শে যেন আসমুদ্রহিমাচল-ভারতবর্ষ আলোকচঞ্চল হয়ে উঠল। বাঙলা দেশে দেশবন্ধুর নেতৃত্ব গান্ধীজিকে অসীম সামর্থ্য দান করে। ফলে আন্দোলন প্রাণবন্যায় প্রচণ্ডতর হয়ে দেখা দেয়।

গান্ধীজি ক্রমশ বুঝলেন যে, বাঙলাকে তার চাই। বাঙালীর 'ইমোশন' ব্যতীত কোন আন্দোলনই সফল হতে পাবে না। আরো বুঝলেন যে, বাঙলা তথা ভারতের বিপ্লবীদেরকে তাঁর কর্মপথে না পেলে শ্রেষ্ঠ যুবশক্তির অবদান থেকে তিনি বঞ্চিত থাকবেন। অধিকন্তু বাঙলার বিপ্লবীদের বাতিল করে তিনি বাঙালীর মন জয় করতে পাববেন না।...

এদিকে আটক বিপ্লবী-বন্দীবাও জেলখানা বা অন্তরীণ থেকে ফিরে এসেছেন। তাঁরাও দেখলেন যে বিপ্লবের প্রস্তুতি করতেও সময়-সুযোগের প্রয়োজন। গান্ধীজির 'অহিংসা'য় তাঁদের বিশ্বাস নেই। তাঁরা লোকমান্য তিলককে বোঝেন। "স্বাধীনতা যে কোন উপায়ে আসুক, তাকে বরণ করে নিতে হবে"—তিলকের এই নির্দেশ তাঁদেরও অন্তরের নির্দেশ। কাজেই তাঁরা স্থির বুঝলেন যে, গান্ধীজির আন্দোলন বয়কট্ করা তো অবাস্তব, সে-আন্দোলনের সম্পূর্ণ সুযোগ নেওয়াই বরং যুক্তিসঙ্গত। তা' ছাড়া গান্ধীজি এখন সশস্ত্র-বিপ্লবে বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্য বলছেন :

**"Had India Sword, I would have asked her to draw it. But she had no Sword—I ask her to adopt Non-Violent Non-Co-operation."**

তিনি আরও পরিষ্কার করে আবেদন জানান :

**"Non-Violence may be accepted as Creed or Policy. I am out to destory this Satanic Government."**

সুতরাং এসব উক্তির পর দেশবন্ধুর আন্তরিক আহ্বানে বাঙলার বিপ্লবীরা অহিংস-যুদ্ধকে রাজনীতিক কূটনীতি হিসেবে গ্রহণ করলেন। ফলে তাঁদের কর্ম কংগ্রেস-সংস্থা সংগঠনে বিশেষ করে নিযুক্ত হল। কিন্তু তাঁদের সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন তাতে ম্লান হলো না। বিপ্লবীদের নেতৃস্থানীয়রা নূতনতর কর্মপদ্ধতি সর্বান্তঃকরণে

গ্রহণ করলেও তরুণ দল সুযোগ বুঝলেই বৃটিশ-শক্তিকে আঘাত দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি।

যুবশক্তির এধারার বিদ্রোহ আমরা ১৯২৩ সালে দেখি সন্তোষ মিত্রের নেতৃত্বে শাখারীটোলা পোস্ট আপিসে হানা দেবার দুঃসাহসী কর্মে।

তারপর ১৯২৪ সালে দেখি চার্লস টেগার্ট ভ্রমে 'ডে' সাহেবের উপর আক্রমণ-কালে। টেগার্ট তৎকালে ছিলেন কলকাতার দুর্ধর্ষ পুলিশ-কমিশনার। অতি বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ বৃটিশ কর্মচারী। ইংরেজের অতবড় মিত্র এবং বিপ্লববাদের অতবড় সক্রিয় শত্রু বড় একটা দেখা যায় না।...

গোপীনাথ সাহা একটি তরুণ। দুর্জয় শক্তির উপাসক এই বীর ১২ই জানুয়ারির ( ১৯২৪ ) সকালবেলায় চৌরঙ্গীতে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে উপস্থিত। টেগার্ট মনে করে যাঁকে তিনি গুলী করলেন তিনি টেগার্ট নন। মিঃ ডে বৃটিশের হয়ে রক্তদানে প্রায়শ্চিত্ত করলেন। বিপ্লবের শত্রু টেগার্ট অক্ষত রইলেন। গোপীনাথের ফাঁসি হল।

গোপীনাথের মৃত্যুতে ব্যর্থতার দুঃখ আছে। কিন্তু গোপীনাথের ফাঁসির আছে একটি তাৎপর্য। তখন বাংলার 'কংগ্রেস' বিপ্লবীদের হাতে এসে গেছে। তাছাড়া বিরাট পুরুষ দেশবন্ধু সিন্ধুসম হৃদয় নিয়ে কংগ্রেস-কর্মীদের শীর্ষে বসে আছেন। তাই কর্মীদের চেষ্টা ব্যর্থ হলো না। সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক-কংগ্রেস-সম্মেলন পথ ও মতের অমিল থাকা সত্ত্বেও গোপীনাথের আত্মবলিদান ও বীরত্বের প্রশংসা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অনুরূপ প্রস্তাব কংগ্রেস-শাসিত কলকাতা কর্পোরেশনেও নেওয়া হয়। এতে বিপ্লবীদের বীর চরিত্র প্রকাশ্যে প্রশংসা লাভ করে। দেশবাসী খুশি হয়, কিন্তু ইংরেজ ভীষণ চটে যায়। ততোধিক চটে যান মহাত্মা গান্ধী। তিনি দেখলেন যে 'হিতে বিপরীত' হয়ে যাচ্ছে। কোথায় তার অহিংসামন্ত্র গ্রাস করবে সহিংস-মন্ত্রকে, না সহিংস-পথই গিলে ফেলতে চাচ্ছে অহিংসার বাণীকে। গান্ধীজি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁকে তুষ্ট করবার জন্যে অবশেষে কর্পোরেশন্ তাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

১৯২৫ সনের ৯ই আগস্ট বাংলার বাইরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। শচীন সান্যাল, যোগেশ চক্রবর্তী প্রমুখের নেতৃত্বে উত্তর ভারতে বিপ্লবী-সংস্থা সুসংগঠিত হয়ে উঠেছিল। এই সংস্থার কর্মীরা কাকোরী রেল-স্টেশনে ট্রেন আটক করে গার্ডের সিন্দুক ভেঙে রেলকোম্পানির টাকা বাজেয়াপ্ত করেন। তাঁরা সংখ্যায়

ছিলেন মাত্র দশজন। দুঃসাহসী এই কাজ দেশবাসীর বিস্ময় উদ্রেক করে। ভারতীয় বিপ্লব-শক্তির ক্ষণে ক্ষণে এরূপ স্ফুরণ ইংরেজকে চমকে দেয়। এর মামলায় রাজেন লাহিড়ী, রামপ্রসাদ, আস্‌ফাকউল্লা, ঠাকুর রোসন সিং প্রমুখ তরুণ বীরদের ফাঁসি হয়। এই মামলারই পলাতক বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ ১৯৩১ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদের এ্যালফ্রেড পার্কে পুলিশ কর্তৃক আক্রান্ত হলে বীরের সৌন্দর্যে সশস্ত্র সংগ্রাম করে মৃত্যুকে বরণ করেন।

১৯২৬ সনের ২৮শে মে। বিপ্লবীদের বীরত্ব, নৈপুণ্য এবং দৃঢ় কল্পনায় রঞ্জিত দিনগুলি। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে কয়েকজন বন্দী। দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দণ্ডিত অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদরঞ্জন চৌধুরি তাঁদের অন্যতম।

রায়বাহাদুর ভূপেন চ্যাটার্জি আই-বি পুলিশের পদস্থ অফিসার। তিনি প্রায়ই জেলে ঢোকেন বিপ্লবীদের মধ্যে মনের দিক থেকে যাঁরা একটু কচিকাঁচা তাঁদের মনোবল ভাঙবার চেষ্টায়। তিনি বহুক্ষণ ধরে জেলখানায় থাকেন, বিপ্লবীদের সবার সঙ্গে মিশতে চান, যাঁদের দুর্বল বলে ভাবেন তাঁদেরকে আলাদা-আলাদা ভাবে ডাকিয়ে এনে আপিস ঘরে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। মিষ্টি কথায় ও নানা প্রলোভন দেখিয়ে ছেলেদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় কার্যে রায়বাহাদুরের নাকি সুনাম ছিল বড়কর্তাদের কাছে।

বন্দী বিপ্লবীদের হাতের কাছে অস্ত্র নেই। তাঁরা সম্বলহীন কয়েদী। কিন্তু বুদ্ধি ও সংকল্পে তাঁদের হারিয়ে দেওয়া মুস্কিল। তাঁরা প্রয়োজন বোধ করলেন, এই বাহাদুর অফিসারটিকে ইহধাম থেকে সরাতে হবে। সরালেন-ও। জেলের অভ্যন্তরে ভূপেন চ্যাটার্জি, 'ডাণ্ডা'-র ঘায়ে ভবলীলা সাঙ্গ করলেন। ...হুলুস্থুল পড়ে গেল জেলখানায় এবং পুলিশের দপ্তরে।...দশজন বিপ্লবী-বন্দীর বিরুদ্ধে বিচার শুরু হলো। এই মামলায় সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে দু-একজন যাঁরা ঘটনা ঘটতে দেখেছিল তারা বহু প্রলোভন ও নির্যাতন সত্ত্বেও সাক্ষী হয় নি, এমন কি ইউরোপীয়ান্ ওয়ার্ডার যাঁরা দূরে ডিউটিতে ছিলেন তাঁদের দিয়েও পুলিশ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াতে পারে নি। কিন্তু তাতে আটকালো না। কতগুলো বাইরের কয়েদী ও দু'জন ফিরিঙ্গী কয়েদীর মিথ্যা সাক্ষ্যের বলে সকলের শাস্তি হয়ে গেল। হাইকোর্টে অনন্ত চক্রবর্তী, রাখাল ও ধ্রুবেশের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হলো; অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী ফাঁসির আদেশ পেলেন। বাকি পাঁচজনকে এ মামলায় সাজা দেওয়া গেল না।...

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'সাইমন্ কমিশন বর্জন' আন্দোলনেব শোভাযাত্রায় লাহোবে পাঞ্জাবকেশবী লজপৎ বায় পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হন। আঘাত বুকে লাগে এবং মৃত্যুব আলিঙ্গনে তিনি মৃত্যুহীনেব গৌরব লাভ করেন। বিপ্লবীবা এই মহান্ নেতাব এই অপমৃত্যুর জন্যে দায়ী স্যাণ্ডার্সকেও মৃত্যুদণ্ড দিলেন। গুলির আঘাতে সাহেব সুখেব পৃথিবী ত্যাগ কবতে বাধ্য হন। এ প্রসঙ্গে ভগৎ সিং-এর বিরুদ্ধে গ্রেফতাবী পবোয়ানা বেরুলো। ভগৎ সিং পলাতক।

১৯২৯ সালেব একটি বোমঞ্চকব ঘটনা হলো ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তেব দিল্লীর য্যাসেম্ব্লি হাউসে 'পাবলিক্ সেফটি বিল' পাশ হবাব কালে পর পব দুটি বোমা নিক্ষেপ। এই বোমা তাঁবা নিক্ষেপ করেছিলেন কাউকে মাববাব জন্যে নয়। ও ছিল প্রতিবাদ-বজ্র। বিপ্লবী-ভাবত পৃথিবীর সম্মুখে আইনসভাব পবিসবেই নতুন করে ঘোষণা কবলেন যে সাম্রাজ্যলিপ্সু বৃটিশেব আইন ও শাসন তাঁবা মানেন না। ··অস্ত্র নিক্ষেপ কবে তাই পবিশান্তচিত্তে দুইটি বীব দাঁড়িয়ে বইলেন। পালাবাব চেষ্টা কবলেন না। সাইমন্ সাহেব তখন বিশিষ্ট দ্রষ্টারূপে গ্যালাবিতে উপস্থিত ছিলেন। ··

যতনী দাস

ঐ বৎসব আব একটি অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটলো। সে হলো তকুণ তাপস যতীন দাসেব অনশনে আত্মদান। ভাবতেব 'টেবেন্স ম্যাকস্যুইনি' জেল-বন্দীদেব প্রতি 'মানুষেব ব্যবহাব' দাবী কবে লাহোব জেলে ৬৩ দিন নিবম্বু উপবাস অন্তে ১৩ই সেপ্টেম্বব মৃত্যু ববণ কবেন। এ মৃত্যু তো সাধাবণ 'অনাহাবে মৃত্যু' নয়। এ যে চিবঞ্জীবী হবাব দুঃসহ তপস্যা। এ তপস্যায় প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুকে জয় কবেছেন তিনি তিলে তিলে জীবন দান করে। দান সম্পূর্ণ কবে তিনি হলেন জীবিতেশ্বব।

যতীন দাসের মৃত দেহ কলকাতায় আনা হল। মহামৃত্যুব বাজকীয় শোভাযাত্রা

সেদিন হাওড়া থেকে কেওড়াতলার শ্মশানঘাট পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ নরনারী সজল চোখে দেখেছে।...আর যাঁরা রক্তের বিনিময়ে রক্ত-উৎসব রচনায় উন্মুখ তাঁদের চোখে কিন্তু জল ছিল না। তাঁদের বুকের কথা হাজার হাজার ইস্তাহারে প্রকাশ্যে সেদিন ছড়ান হয় জনতার মধ্যে। ইস্তাহারের শীর্ষে লেখা দেখেছিলাম: **'রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা !!'**...

১৯৩০ সনের ৭ই অক্টোবর ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং সুখদেবের ফাঁসির হুকুম দিলেন 'লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলা'-র ( তৃতীয় ) স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল। দেশব্যাপী অসন্তোষ দেখা দিল। এ বিচার কেউ মেনে নিল না। গান্ধীজি জনতার নাড়ী ভালই বুঝতেন। তাই ভগৎ সিং-দের ফাঁসি বন্ধ করার জন্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পাঞ্জাবীরা 'মার্শাল্ রেস্'। কাজেই অহিংসার বার্তা এখানে মন বুঝে বলতে হয়।

ইতিহাস জানে যে, এই মহাত্মা গান্ধীই একদিন গোপীনাথ সাহার আত্মত্যাগ ও বীরত্বের প্রশংসামূলক প্রস্তাব সিরাজগঞ্জের প্রাদেশিক কংগ্রেস-সভা গ্রহণ করায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং কলকাতা কর্পোরেশান্কে অনুরূপ গৃহীত প্রস্তাবটি নাকচ করে দিতে বাধ্য করেছিলেন। ইংরেজের সাধ্যও ছিল না দেশবন্ধুর কর্পোরেশান্কে দিয়ে এ অপকর্ম করাবার। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী তা করালেন। যাক্, আজ জনমতের চাপে সেই মহাত্মাই ভগৎ সিং-দের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের মর্যাদা দিতে বাধ্য হলেন, এবং 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি'-র সাফল্য কামনায় এই বীরত্রয়ীর প্রাণরক্ষার সংকল্পে রাজদরবারে বিস্তর হাঁটাহাঁটি করলেন।...কিন্তু ভবী ভুলবার নয়।...

বীরগণ ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করে বিপ্লবীর ঐতিহ্য সগৌরবে রক্ষা করলেন। জীবিত ভগৎ সিং থেকে মৃত্যুঞ্জয়ী ভগৎ সিং লক্ষ গুণ শক্তি ধারণ করে ভারতীয় চিত্তে অমর হয়ে রইলেন। সুভাষচন্দ্র সে-সময় যেকোন বক্তৃতা মঞ্চ থেকেই উদাত্ত-কণ্ঠে বলে যাচ্ছিলেন: "পদানত এই ভারতবর্ষ হাজার হাজার 'ভগৎ সিং' চাইছে।" উত্তরে জনতার ধ্বনি শোনা গেছে: "ভগৎ সিং জিন্দাবাদ্ !"...

## চতুর্থ অধ্যায়

# এঁরা সন্ত্রাসবাদী নন—এঁরা বিপ্লবী

আমাদের মনে আছে, কিছুদিন পূর্বে জনৈক প্রবীণ বিপ্লবীকে অভ্যর্থনা জানানোর কালে কোন এক প্রখ্যাত সাংবাদিক আবেগময়ী ভাষায় বাংলার বিপ্লবযুগের প্রশস্তি জানান। ভদ্রলোকের আন্তরিক উক্তি আমাদের ভাল লেগেছিল। কিন্তু 'বিপ্লবী' ও 'বিপ্লববাদের' পরিভাষারূপে 'টেররিস্ট্' ও 'টেররিজম্' শব্দ দুইটি ব্যবহার করে তিনি আমাদের মতো অনেকেরই কর্ণদাহ সৃষ্টি করেছিলেন।

যারা অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত তাদের কথা নয়—যাঁরা শিক্ষিত ও সুমার্জিত তাঁদের মধ্যে কিছু লোকের মুখেই 'টেররিস্ট্' ও 'টেররিজম্' শব্দ দু'টির অপপ্রয়োগ প্রায়ই শোনা যায়। সাংবাদিকরাও কেহ কেহ বাংলা ভাষায় **Revolutionary** ও **Revolution**-এর তর্জমা 'সন্ত্রাসবাদী' ও 'সন্ত্রাসবাদ' করে থাকেন। এসব শিক্ষিতের দল নিশ্চয়ই বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী অথবা বিপ্লববাদ ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যেকার পার্থক্য ভাল করেই জানেন। কিন্তু প্রয়োগক্ষেত্রে তাঁদের ভুল হয়।

বিপ্লবী শহিদদের স্তুতিগান এঁরা করেন। সে-সব উপলক্ষ্যে অনেক গুণীজ্ঞানী ব্যক্তিদের কণ্ঠে শহিদরা আপ্যায়িত হন 'টেররিস্ট' আখ্যায়। এমন কি কোন কোন প্রাক্তন বিপ্লবীর লেখনীতেও বিপ্লবকার্যকে সন্ত্রাসবাদী-কার্যকলাপ বলে অভিহিত করা হয়েছে। অথচ যাঁদের রাজনীতি-শাস্ত্রের পাঠ কিছুমাত্র আছে তাঁরা 'বিপ্লব' ও 'সন্ত্রাসবাদের' আকাশ-ভূমি তফাৎ অবশ্যই জানেন। কিন্তু তবু কেন এঁদের এ ভুল হয়? যাঁকে অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করেন, তাঁকেই কেন সাদরে অভিনন্দিত করার কালে নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁরা গালি দিয়ে বসেন? এর মূলে আমাদের ভূতপূর্ব প্রভু সাম্রাজ্যবাদী-ইংরেজের প্রচারসাফল্য।

বাঙলা তথা ভারতবর্ষে প্রথম যেদিন বিপ্লবীদের রুদ্র আবির্ভাব বিদ্যুৎশিখার মত চমক দিয়েছিল, সেদিন ভারতীয়রা না বুঝলেও ইংরেজ বুঝেছিল যে উহা ভবিষ্যৎ বিপ্লব-সম্ভাবনার কঠিন সূচনা। বুঝেছিল বলেই ধুরন্ধর বৃটিশ রাজনীতিকগণ 'প্রোপাগ্যাণ্ডা' রূপ আধুনিক মহা অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করলেন। শুরুতেই তাই বিপ্লবীদের 'সন্ত্রাসবাদী' রূপে আখ্যাত করে বিপ্লববাদকে ভারতবাসীর সমাজে অপাংক্তেয় করার চেষ্টায় ব্রতী হলেন। সাহেবদের কণ্ঠে প্রথম শুনলাম যে, ভারতীয় বিপ্লবীরা আদপে 'এনার্কিস্ট'। তারপর তাদেরই কণ্ঠে 'এনার্কিস্ট্রা'

'নিহিলিস্ট্' শব্দটির বদলে পেল 'টেররিস্ট্' আখ্যা। সাহেবদের কাগজে পড়লাম —'কাল্ট্ অব্ ভায়োলেন্স' এক ভয়াবহ বস্তু ; টেররিজম্ কতগুলো বেকার যুবকের হতাশামূলক হিস্টিরিয়া !...সাহেবরা আরও বলে যে, জনগণের সমর্থনে পরিচালিত এবং আইন মাফিক প্রতিষ্ঠিত সরকারকে যেসব সন্ত্রাসবাদী কেবল ভয় দেখিয়ে বিপন্ন করতে চায় এবং যারা দেশের শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট করার পথ নেয় তারা ভারতবাসীর শত্রু, তারা 'পাবলিক্ নুইসেন্স'। এক সাহেব-ডাক্তার তো এসব বিপ্লবীদের রাঁচি রেখে মানসিক চিকিৎসা করার উপদেশও দিয়েছিলেন। অবশ্য বৃটিশের সুখ-সাম্রাজ্যের সত্যি যাঁরা কণ্টকস্বরূপ হচ্ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে এরূপ অপপ্রচার করার অধিকার বৃটিশের স্বভাবতই আছে। অধিকন্তু এও অনস্বীকার্য যে, ইংরেজের এসব অপপ্রচার-প্রবৃত্তিই প্রমাণ করে যে বাংলা তথা ভারতে তৎকালীন বিপ্লবকার্যে কেবলমাত্র সন্ত্রাসসৃষ্টির উপাদানই ছিল না, উহার মধ্যে এমন কিছুও ছিল যা' বিদেশী রাজকে উৎখাত করার সম্ভাবনায় বলিষ্ঠ।

ইংরেজ তাই অদ্ভুত রাজনীতিজ্ঞান ও প্রচারকুশলতার শক্তি এ ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করল। ইহা জানা কথা যে, মুষ্টিমেয় ইংরেজ কেবল অস্ত্র বা ধন বলে এই বিপুল ভারতবর্ষকে এতকাল ধরে পদানত রাখে নি। তাদের এই ভারত-সাম্রাজ্যে অখণ্ড আধিপত্য ছিল উৎকৃষ্টতর প্রোপাগ্যাণ্ডার কৌশলে। ইংরেজ আমাদের 'বাপ-মা' ; ইংরেজ চোখের আড়াল হলে আমরা পরস্পর খুনোখুনী করে মরবো ; 'ষাট বছরে'-ও চিরদিন নাবালক থাকার জন্যেই ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেছেন ; সূর্যের মতই মহারাণীর রাজ্য স্থির ইত্যাদি সূক্ষ্ম প্রচারকার্য কে কোথায় করেছে কেউ জানে না। কিন্তু এসব কথা আমাদের মগজে ঢুকে গিয়েছিল। ভারতবাসীর রক্তে এই বিশ্বাস দাঁড়িয়েছিল যে—বৃটিশের পতন নেই, বৃটিশ-বিচার তুলনাহীন, বৃটিশের হাত ধরেই আমাদের 'হাঁটি-হাঁটি পা পা' করে চলা প্রশস্ত।...সুতরাং এহেন প্রচারবিশারদ ইংরেজই একান্ত ধৈর্যে ও নৈপুণ্যে বিপ্লবীদের লক্ষ্য করে ভারতবাসীর কানের কাছে বারবার বলতে লাগল—"এরা টেররিস্ট্, টেররিস্ট্, টেররিস্ট্।... বিপথগামী বেকার এসব ভদ্র তরুণগোষ্ঠীকে আমরা পিতার মতো শাসন করব ; দেশের রাজভক্ত বুদ্ধিমানের দল একাজে আমাদের সহায় হও।"...

দাস্যসুখে সুখী ক্লীবের কাছে অমন "বেনাভোলেণ্ট্ অথরিটি"-র যুক্তি অকাট্য মনে হবে নিশ্চয়ই।...

বুদ্ধিমান রাজভক্তের দল ইংরেজের ও অধিক নিষ্ঠায় 'টেররিস্ট্'-দলনে এগিয়ে

এলেন। স্বদেশী কাগজগুলো প্রয়োজনে বিপ্লবীদের প্রশংসা করলেও ইংরেজের বুলি কণ্ঠে নিয়ে 'টেররিস্ট্' ও 'টেররিজম্' আখ্যায় বিপ্লবী ও বিপ্লববাদকে আখ্যাত করতে পেছিয়ে পড়েন নি! কংগ্রেস ও কংগ্রেসের বাইরে বড বড় জাতীয়তাবাদী নেতাদের চিত্ত শ্রদ্ধায় বিপ্লবীদের বরণ করে নিলেও ইংরেজের কাছ থেকেই নিজেদের অজ্ঞাতে তাঁরা ধার করে নিলেন 'টেররিস্ট' বুলিটি। তাই বিপ্লবীর স্তুতি গানের কালে এ-যুগেও তাঁরা যখন সংজ্ঞার অপপ্রয়োগ করেন তখন ইংরেজের প্রচারশক্তির 'ডিলেড্-য়্যাকশান'-এর তারিফ করি। জাতির চৈতন্যে ইংরেজ এমনি তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে যে, কোন কোন যথার্থ পণ্ডিত বিপ্লবী পযন্ত অনেক ক্ষেত্রে 'টেররিস্ট্' আখ্যায় নিজেদিগকে বর্ণিত করতে দ্বিধা করেন না।

বাংলার রাজনীতিক-ইতিহাস গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে আমরা দেখি —সজ্ঞান-ইংরেজদের সজ্ঞান-প্রচারশক্তি শিক্ষিত ভারতীয়দের বিপ্লব-ধারণাকে গুলিয়ে দেবার সফল চেষ্টা করেছে তো বটেই, তা'ছাড়া আরো একটি শক্তি জাতিয়তাবাদী-বিপ্লবচিন্তাকে ভারতবর্ষের জমি থেকে নিশ্চিহ্ন করার আগ্রহে এ-ব্যাপারে ইংরেজের সহায়ক হয়েছিল। তার নাম ভারতীয় 'কম্যুনিজম্'। সজ্ঞান কম্যুনিস্টরা 'ট্যাকটিক্‌স' রূপে ইংরেজদের প্রোপাগ্যাণ্ডা গ্রহণ করেন। জাতীয়তাবাদী বিপ্লব ও বিপ্লবীদের হেয় করবার আগ্রহে তাঁরাও সজ্ঞানে যথাস্থানে 'টেররিজম্' ও 'টেররিস্ট' শব্দ দুটি চালু রাখলেন। ফলে বিপ্লবী-দলগুলি থেকে আগত কনভার্ট-কম্যুনিস্টগণ কালাপাহাড়ী ঢঙ-এ বিপ্লবী-বন্ধুদেরকে 'টেররিস্ট' আখ্যায় অভিহিত করে আত্মশ্লাঘা বোধ করতে লাগলেন। সে যুগে আমরা তাই দেশবাসীর কণ্ঠে 'টেররিস্ট' ও 'টেররিজম্' শব্দদ্বয়ের প্রচুর আমদানি লক্ষ্য করি। দেশের শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত সমাজ তখন বুঝেও বুঝলেন না যে, এ অপপ্রচার কী মারাত্মক! যা' রীতিমত একটি ( রাজনীতিকমহলে ) গালি, তা-ই ভূষণরূপে বিপ্লবীদের অঙ্গে লাগিয়ে স্তুতিবাদের নমুনা এই দেশেই শোভা পায়। কারণ, মুক্তির পরও অল্পকাল পূর্বের পরাধীন জাতি রাজনীতিক-জ্ঞানে বহুকাল অর্বাচীন থেকে যায়!···

টেররিস্ট্‌দের ধর্ম হল ভয় দেখিয়ে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিপন্ন করা। আঘাতের উত্তরে আঘাত দেওয়াই তাঁদের লক্ষ্য। তাঁদের দেশপ্রেম যথেষ্ট থাকলেও গঠনমূলক কোন আদর্শ থাকে না। তাঁদের এমন কোন কার্যক্রম বা কার্যব্যবস্থাও থাকে না যা' দিয়ে বর্তমান শাসক ও শাসন-ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করে গণ-প্রত্যাশায়-পূর্ণ নূতনতর কোন শাসনব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব।

কিন্তু 'বিপ্লবীদে'র ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মধ্যেই নিহিত থাকে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রগঠনের বীজ। তাঁদের চিন্তা সুদূরপ্রসারী। বাস্তবকে স্বীকার করেই বাস্তব-উর্ধের পটভূমে তাঁদের আদর্শবাদের যাত্রা। তাই তাঁরা তাঁদের কর্মে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তাঁদের কর্মপদ্ধতি ও কার্যক্রম এমনভাবে শৃঙ্খলিত থাকে যে অবাঞ্ছিত শাসনব্যবস্থাকে সরিয়ে বাঞ্ছিত শাসনব্যবস্থা সংগঠনে তাঁরা সফল হন।

'বিপ্লব' কি করে চিরন্তন, সে-কথাও আমাদের বুঝতে হবে। যা কিছু অন্যায় বা অসমতা তাকে ন্যায়ের গৌরবে এবং সাম্যের সৌন্দর্যে সম্পদশালী করার মন্ত্র বিপ্লবের বাণীতেই আবদ্ধ। মানুষের ধর্ম হলো ভালো থেকে মন্দের স্তরে নেমে যাওয়া এবং মন্দ থেকে ভালর পথে ধাওয়া করা। ক্ষমতার অধিকারী ক্রমশ ক্ষমতার অপব্যবহার করবেই। মানবের এই দুঃসময়েই রুদ্রের আশীর্বাদ রূপে শাসনদণ্ড হাতে 'বিপ্লব' দেখা দেয় সমাজে ও রাষ্ট্রব্যবস্থায়। বিপ্লবী 'নবতর সম্ভাবনা'র স্বাক্ষর নিয়ে নতুনতর রাজ্য পত্তন বরেন। এই ভাবে সৃষ্টি থেকে ধ্বংস এবং ধ্বংস থেকে সৃষ্টির আনাগোনা অনাদিকাল থেকেই চক্রবৎ মানব-ইতিহাসে লিখিত হয়ে আসছে। বাঙলা তথা ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী-বিপ্লবসূচনায় সেই সৃষ্টির মন্ত্র উচ্চারিত ছিল কিনা তা বঝতে হবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস মানব-ইতিহাসের বাইবে কিছু নয়। পরাধীনতার জ্বালা মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তিই শুরুতে অনুভব করে থাকেন। সেই মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আরো স্বল্পসংখ্যকই চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার করে দুরন্ত সাহসে অনভিপ্রেত অনড রাজশক্তিকে আঘাত দেন। সে-আঘাত আপাত-দৃষ্টিতে বাবে বারে নিষ্ফল হয়। কিন্তু এ বিদ্রোহের মূলে থাকে অক্ষুণ্ণ আশাবাদ, অম্লান আদর্শ, সমুজ্জ্বল আত্মবিলয়নপিপাসা, সূক্ষ্মতম, আত্মমর্যাদাজ্ঞান ও গভীর সংবেদনশীল চিত্ত। এ বিদ্রোহই ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে বিরাট বিপ্লবে রূপ নেয়। বাংলার 'বিপ্লববাদ' এ সত্যকে গভীর মানসে প্রত্যক্ষ করেই ধূমায়িত হতে থাকে ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষান্তে। বিপ্লবশক্তি ক্রমশ প্রচণ্ড সামর্থ্যে বহ্নিদীপ্ত হয়ে বিংশ শতাব্দীর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশটি বৎসর ধরে ভারতবর্ষের আত্মশুদ্ধি ঘটিয়েছিল। তাই এর রক্ত-স্বাক্ষরকে ইতিহাস উপেক্ষা করে নি।...ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে।...

ভারতের বিপ্লবধর্মের স্রষ্টা মহামনস্বী শ্রীঅরবিন্দ, ভগ্নী নিবেদিতা, পি মিত্র এবং তিলক। এর বাহক রাসবিহারী, যতীন মুখার্জি, সূর্য সেন প্রমুখ মহানায়কবৃন্দ। এর চারণ মৃত্যুহীন প্রফুল্ল চাকি-ক্ষুদিরাম-কানাই থেকে শুরু করে প্রীতিলতা-

বিনয় বসু-নির্মল সেন-দীনেশ-বাদল-প্রদ্যোৎ-অনাথ-ভবানী-আস্‌ফাকুউল্লা-যতীনদাস ভগৎ সিং-উধম সিং প্রমুখ শহিদকুল। এর মহাসংগঠক পুলিন দাস, হেমচন্দ্র ঘোষ, বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলি, হরিকুমার চক্রবর্তী, নরেন সেন প্রমুখ বিপ্লবনেতা। এর উপাসক বাংলা ও ভারতের অজস্র যুবক-যুবতী। সেদিনকার এ-বিপ্লবের গতি তাই প্রলয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল; সে প্রলয়ের প্রতি ছন্দে নবসৃষ্টির ছিল বন্দনা। ভারতবর্ষের বিপ্লব তাই সার্থকতম রূপ পেয়েছিল বহির্ভারতে, বর্মার প্রান্তরে, আজাদ্ হিন্দ্ হুকমতের পরিচালনায়। ভারতবর্ষের এই বিপ্লবকাণ্ড পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বিপ্লব-ইতিহাসেও অনন্যসাধারণ। এর তুলনা এতেই।···

ইতিহাসের সামান্য জ্ঞান যাঁদের আছে, রাজনীতিক-চৈতন্য যাঁদের একেবারে লোপ পায় নি—তাঁরাই মঙ্গল পাঁড়ের আত্মদানের মধ্যে খুঁজে পাবেন ক্ষুদিরামের অস্ফুট ভাষা, ঝাঁন্সির রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর রণযাত্রায় পাবেন সুভাষচন্দ্রের 'ঝাঁসি-রাণী-বাহিনী'র পদধ্বনি, তাঁতিয়া তোপী-তিতুমীর-নানাসাহেবের বিদ্রোহস্পৃহায় পাবেন রাসবিহারী-যতীন্দ্রনাথ-সূর্যসেনের বিদ্রোহ-আভাস, কানাই দত্ত-সত্যেন বসুর স্বপ্নে পাবেন রামকৃষ্ণ, বিনয় বসু, মতি মল্লিক, কানাই ভট্টাচর্যের স্বীকৃতি। তাঁরা তাই নির্ভুল করে পাবেন সর্বভারতীয় নানা বিপ্লব-প্রচেষ্টার মর্মে নেতাজির আজাদ্‌হিন্দ ফৌজের আবির্ভাব-সম্ভাবনা। পৃথিবীর অপরাপর দেশের বিপ্লব-ইতিহাসের মত ভারতবর্ষেব বিপ্লব-ইতিহাসের স্বরূপ-ও একই। এ সত্য না বুঝলে বিপ্লববাদ বা বিপ্লবীকে বোঝা যায় না। বাঙলা তথা ভারতবর্ষের বিপ্লবীগণ কোন মুহূর্তেই 'সন্ত্রাসবাদী' বা 'টেররিস্ট্' ছিলেন না—কারণ টেররিজম্-এ তাঁরা বিশ্বাসী হতে পাবেন না। তাঁদের কাযকলাপে বহু ক্ষেত্রে ইংরেজের প্রাণে, 'সন্ত্রাস' সৃষ্টি হতে পাবে, যেমন বহু ক্ষেত্রে ভারতীয় নরনারীর জীবনে বৃটিশপ্রভু-ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছেন। বৃটিশরাজের সন্ত্রাসমূলক কাজে বৃটিশ যদি সন্ত্রাসবাদী বা টেররিস্ট্ না হয়, তবে বিপ্লবীদের সন্ত্রাস-জনক কিছু কাজে তাঁরা টেররিস্ট্ হবেন কেন? 'End justifies means'—উদ্দেশ্যই উপায়কে সিদ্ধ করে। ইম্ফলের রণাঙ্গনে বা দিল্লীর কেল্লায় জাতীয়-পতাকা উত্তোলিত হবার মূলে ছিল ভারতীয় বিপ্লব-সাধনা, 'টেররিজম্' নয়। 'টেররিজম্' কথাটি প্রয়োগ করেছিল উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ, আমরা আজও অর্থ না বুঝে তোতাপাখীর মত তা উচ্চারণ করি!···

# পঞ্চম অধ্যায়

## চট্টগ্রাম বিদ্রোহ

"রক্ত এখনও দিতে হবে ঢের
দিতে হবে আরো প্রাণ,
মৃত্যুর তীরে জীবনের ধ্বজা ওঠাতে।"
(প্রেমেন মিত্র)

### সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন

পল্লীগাঁয়ের ভাল ছেলে স্থর্য সেন। ছাত্রও ভাল। প্রথমে চট্টগ্রাম কলেজে, পরে বহরমপুর কলেজে তিনি অধ্যয়ন করেন। ১৯১৮ সনে বি-এ পাশ করেন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

তখনকার দিনে ভাল ছেলেদের বড়ই বিপদ ছিল। গুপ্ত-সমিতির লোকেরা সৎ ও ডানপিটে ছেলেদের মাথায় ইংরেজ-বিরোধী বিদ্রোহের বাণী ঢুকিয়ে দেবার জন্যে ঘুরে বেড়াতেন! ভাল ছেলে স্থর্য সেন-ও বহরমপুর কলেজে পড়ার কালে তাঁরই এক অজানা মুহূর্তে এরকম একজন বিপ্লবী 'ছেলেধরা'র খপ্পরে পড়ে যান। তাঁর আর সংসারে ঢোকা হলো না। ঢুকলেন একটি বিপ্লবী-সংস্থায়।...

স্বল্পভাষী ও মিষ্ট স্বভাবের স্থর্য সেন আপাতদৃষ্টিতে বড়ই সাধারণ মানুষটি ছিলেন। পোষাকে-পরিচ্ছদে, আহারেবিহারে, কথায়বার্তায় বা আচারব্যবহারে তাঁর কিছুমাত্র বিশিষ্টতা ছিল না। বি-এ পাশ করেই তিনি চট্টগ্রাম জাতীয় বিদ্যালয়ে মাস্টারীর পদ গ্রহণ করেন। মাস্টার স্থর্য সেনের অন্তরে যে বিরাট এক বিপ্লবী-নেতা ধীরে ধীরে জন্ম গ্রহণ করছিলেন তা কেউ জানতো না। স্থর্য সেনের কর্মতপস্যা শুরু হলো। আত্মনিবেদিত কর্মী তিনি। তাঁর সারা চিত্তে গেরুয়া বরণের ছোপ। তিনি সন্ন্যাসী। কিন্তু সংসারবিরাগী নন।...

স্থর্য সেন অঙ্কের মাস্টার। তিনি কথা কম বলেন। তাঁর কোন দিকেই বাহ্য জৌলুস নেই। অথচ ক্রমশ এই মাস্টারটির চতুষ্পার্শ্বেই ছাত্রের দল ভিড় করতে লাগল। কেন?...ছাত্ররা তাঁর কাছাকাছি এসে গেলেই বুঝতে পারে যে এই লোকটি অন্য জগতের মানুষ—সাধারণ লোকদের থেকে একেবারেই আলাদা। এঁর কণ্ঠ মধুর, অথচ ওজস্বী। এঁর সমগ্র সত্তা মধুর, অথচ গুরুগম্ভীর। এঁর

হৃদয় মধুব, অথচ কর্তব্যে কঠিন। এঁর পাণ্ডিত্য আছে। এঁর অধীত-বিদ্যায় এবং অপরকে দান করাব বিদ্যায় কিছুমাত্র ফাঁকি নেই। এঁব মধ্যে অমিতবীর্য স্বকীয় গৌরবে বর্তমান। এঁব তনুমন সকলেব কল্যাণে অর্পিত। ছাত্ররা তাই সূর্য সেনেব কঠিন আববণ ভেদ করে তাঁব অন্তর্নিহিত সূর্যালোক পান করবার জন্য পাগল হয়ে ওঠে।

সূর্য সেন এই ছাত্র ও তরুণ দলকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে একটি আদর্শ বিপ্লবী-বাহিনী গডাব স্বপ্ন দেখেন। সাথী তাঁব অম্বিকা চক্রবর্তী, জুলু সেন, নির্মল সেন প্রমুখ।

সূর্য সেন

কংগ্রেসেব কাজে সূর্য সেন জন-সাধাবণেব কাছে এগিয়ে এলেন। মাস্টাবী ও টুইসনিব মাধ্যমে তিনি কিশোব ও যুবকদেবকে কাছে পেতে লাগলেন। পবাধীনতাব জ্বালায় ক্ষিপ্ত তাঁব মন। এই জ্বালাবোধ সকলেব মধ্যে সংক্রামিত না হলে মুক্তিফৌজ তৈয়েব হয না। জাতিকে স্বাধীনতাব যুদ্ধে টেনে নেওযাব স্বপ্নে সূর্য সেন বিভোব। ঠিক এমন সময় গুরুজনদেব কাছ থেকে বিয়ে করার জন্যে প্রস্তুত হবার আদেশ এলো! ·

সূর্য সেন জীবনকে এড়িয়ে চলবাব পক্ষপাতী ছিলেন না। জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই জীবন-দানের ব্রত তিনি গ্রহণ কবেছিলেন। বিয়ে তিনি কবলেন। কিন্তু বিবাহ তাঁর 'বন্ধন'রূপে দেখা দিল না। বন্ধন মাঝে 'মুক্তি'-র স্বাদ লাভ কবার শিক্ষা তিনি পেয়েছেন।···

'মাস্টারদা'কে ছাত্ররা ভয় কবে, ভালবাসে, ভক্তির চোখে দেখে। মাস্টারদার কথামত কাজ করতে পারা তাদেব কাছে শ্লাঘার বস্তু। অহিংস-কংগ্রেসের কাজে স্বেচ্ছাসেবকদল গড়া হয়েছে। লোকে জানে এরা অহিংস-সন্তানদল। কিন্তু মাস্টারদা জানেন—এবা সিংহশাবক-বাহিনী, আগামী দিনের দুর্ধর্ষ বিপ্লবী ফৌজ।···

এদিকে জালিনওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনতাকে ডায়ার-ওডায়ারের দল পশুর মত হত্যা করেছে। সেই বীভৎস অত্যাচারেব কাহিনী সারা দেশে বিপুল উত্তেজনা এনেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রশান্তি বিনষ্ট হয়েছে। তিনি প্রতিবাদে 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করেছেন। সারা ভারতবর্ষময় বিক্ষোভ। চট্টগ্রাম জাতীয়-বিদ্যালয়ের বালকেরাই-বা চুপ করে থাকবে কেন? তারা মাস্টারদাকে ধরল তাদের প্রতিবাদ-সভায় সভাপতিত্ব করার জন্যে।

মাস্টারদা স্মিতহাস্যে আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে উত্তর দিলেন—'এত বড অন্যায়, এত বড অপমান তোরা শুধু সভায় প্রতিবাদ করেই ভুলে যাবি? প্রতিকার খুজবি না?'…

এ মন্তব্যের অর্থ ছেলেবা অনেকেই বুঝলো না। দু-চারজন হয়তো কিছু বুঝলো।…

সভাসমিতির ব্যবস্থা ভালই হয়েছে। কিন্তু কাযকালে মাস্টাবদাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনি কর্মী। বক্তৃতা দেবার জন্যে তাঁর জন্ম হয় নি।

সভাসমিতি বা প্রতিবাদেব কঠোব ভাষাবিন্যাসেও কিছু সংখ্যক ছেলের মন শান্ত হলো না। তারা মাস্টারদার চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে। সূর্য সেনের গোপন বিপ্লববাদীদল এদেরকে নিয়েই ক্রমে দানা বাঁধতে লাগল।…

১৯২১ সালে মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলন মাথা তুলে দাডাতেই বিপ্লবীরা ঐ আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করা স্থির করেছিলেন। মাস্টারদা-ও তাই বন্ধুদের নিয়ে আন্দোলনের পুরোভাগে ঝাঁপিয়ে পডলেন। ফলে বিপ্লবকর্মের প্রস্তুতির পক্ষে তাঁর 'রিসোর্সফুলনেস' বেড়ে যেতে লাগল। এ বছরই শেষের দিকে গান্ধীজির অসহযোগ-আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এল। তাঁর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে জাতির হাতের মুঠোয় 'স্বরাজ' তুলে দেবার প্রতিজ্ঞা ভেস্তে গেছে। শুরুতে তাঁর আন্দোলনকে এই প্রতিজ্ঞা যেমন তেজী করেছিল, বৎসরান্তে তেমনি সে-আন্দোলনকে প্রতিজ্ঞার ব্যর্থতা মিইয়ে দিল। ১৯২২ সালে 'চৌরিচৌরা'য় কর্মীদের অহিংসাবোধ অটুট না-থাকায় গান্ধীজি তাঁর আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। জাতির চিত্ত নৈরাশ্যে বিধুর হয়ে গেল।

চট্টগ্রামে সূর্য সেন এবং তাঁর অন্তরঙ্গ সহকর্মী অম্বিকা চক্রবর্তী ও নির্মল সেন প্রমুখ দলকে বিপ্লবমুখী করার কাজে লেগে গেলেন। আত্মোন্নতি ও যুগান্তরের নেতাদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ বেড়ে গেল। দলবৃদ্ধিকল্পে এবং যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র

সংগ্রহার্থে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু অর্থ কোথা থেকে আসবে? দলের ছেলেরা নিজেদের বাড়িঘর থেকে ছলেবলে যা যোগাড় করে, তাতে দৈনন্দিন চাহিদা হয়তো মেটে। কিন্তু তারপর?

টাকা চাই। মিলবে কি করে? বিপ্লবীরা পথ পাচ্ছেন না।···তাঁদের গোপন বৈঠক বসেছে। কর্মীরা ডাকাতি করতে চান। সূর্য সেন বিশেষ ভাবিত। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি বললেন—'করো। তবে দেশের লোকের নয়, সরকারের বা যে কোন বিদেশী বণিকের তহবিল লুটে নিতে পার।'

নেতার নির্দেশ কর্মীরা মেনে নিলেন। ১৯২৩ সালের ২৩শে ডিসেম্বর 'পাহাড়তলী ডাকাতি' সংঘটিত হতে দেখা যায় সূর্যবাবুদের নেতৃত্বে। এ ডাকাতি করেন তাঁর দল রেল-কোম্পানির ঘরে। ডাকাতির জের টানতে হলো সূর্যবাবুদের খুব বেশি। সূর্য সেন আবার নতুন করে বুঝলেন যে, ডাকাতি বিপ্লবীদলকে এতই বিব্রত করে তোলে মামলামোকদ্দমা ও ধরপাকড়ের দুর্ভোগে যে, বিপ্লবের কাজ তাতে বিঘ্নিত হয়।

এই সূত্রে সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী ও অনন্ত সিং একত্রে ধরা পড়লেন। 'পাহাড়তলী-ডাকাতি'র মামলা শুরু হল। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সুদক্ষ পরিচালনায় মামলা ফাঁস হয়ে গেল। তিনজনেই বেকসুর খালাস পেলেন। আরব্ধ কর্মে তাঁরা পুনরায় আত্মনিয়োগ করলেন।···

পূর্বেই বলেছি যে, বিপ্লবী-নেতারা কংগ্রেসের নীতিকে 'পলিসি' রূপে গ্রহণ করে কংগ্রেসে ঢোকার পক্ষপাতী হন। এবং বৃহত্তর সশস্ত্র-বিপ্লবের প্রস্তুতির সুযোগ কংগ্রেসী-আন্দোলন থেকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত তাঁরা নেন। কিন্তু তাঁদের তরুণ সহযোগীদেব বেশিদিন এ পন্থা সহ্য হলো না। গান্ধী-আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং তাদের নিজস্ব ধারণায় নিজেদের নেতাদের বিপ্লবউদ্যমে গাফিলতি তাঁদেরকে চঞ্চল করে তোলে। ফলে তরুণ-বিপ্লবীদের বিদ্রোহ মাঝেমাঝে সশস্ত্র-ঘটনার সৃষ্টি করে। কলিকাতা শাঁখারীটোলা পোস্টআপিসে হানা, টেগার্ট ভ্রমে 'ডে'সাহেবের নিধন, চট্টগ্রামের দারোগা প্রফুল্ল রায়ের হত্যা, মানিকতলায় বোমা আবিষ্কার, মীর্জাপুরের দোকানে বোমা নিক্ষেপ, দক্ষিণেশ্বর বোমার কারখানা আবিষ্কার, কাকোরী ট্রেণ-ডাকাতি, আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ভূপেন চাটার্জিকে হত্যা প্রভৃতি এ্যাকশান্ সেই বিদ্রোহেরই যে পরিচয় তা-ও পূর্বেই বলা হয়েছে। বিপ্লবী নেতাদের অজ্ঞাতে এসব ঘটলেও পুলিশের সূক্ষ্ম বিচার করবার সুযোগ বা ইচ্ছা

না থাকায় তাঁরাই সর্বাগ্রে ধৃত বা নজরবন্দী হতেন। ১৯২৪-২৫ সালের মধ্যে ছোটবড় সকল নেতাই ধরা পড়ে গেছেন। সূর্য সেন কিছুদিন পলাতক থাকলেও অবশেষে রাজবন্দী হলেন।...

১৯২৮ সাল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক সমাবেশ হচ্ছে। মূল সভাপতি মতিলাল নেহরু। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন। স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ( G. O. C. ) সুভাষচন্দ্র। এই সঙ্গে হচ্ছে সর্বভারতীয় যুব-কংগ্রেসের অধিবেশন। তার মূল সভাপতি নরিম্যান্ এবং অভ্যর্থনা-সমিতির চেয়ারম্যান সুভাষচন্দ্র। কংগ্রেস-স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর একটি শাখা নারীবাহিনীও গঠিত হয়েছিল। তার অধিনায়িকা ছিলেন লতিকা বসু।

১৯২৮ সালের মধ্যে বন্দীরা সবাই মুক্তি পেয়েছেন। বাঙলার কংগ্রেস তাঁদেরই হাতের মুঠোয়। তাই কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর অধিনায়কবৃন্দরূপে নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের দেখা গেল। বিপ্লবীরা দলে দলে এই বাহিনীতে ঢুকেছেন সৈনিকের কায়দায় কুচকাওয়াজ শিখে নেবার আগ্রহে। তা'ছাড়া আড়াই হাজারের অধিক যুবক এই বাহিনীতে যোগ দেওয়ায় বিপ্লবীদের দলবৃদ্ধির কাজেও বিশেষ সুবিধে হবার কথা।

স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী স্বভাবতই সামরিক-রীতিতে কতকগুলো বিভাগে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে দক্ষিণ-কলিকাতা-বিভাগটি নিয়মানুবর্তিতায়, সুশিক্ষায় এবং কর্তব্যনিষ্ঠায় বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। এর প্রাণপ্রতিষ্ঠায় মেজর সত্য গুপ্তও শহিদ যতীন দাসের অবদান অপূর্ব।

কলিকাতা-কংগ্রেস-অধিবেশন 'বিপ্লবী ভারতে'র ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত এই কংগ্রেসেই বিপ্লবীদের প্রতিনিধিরূপে সুভাষচন্দ্র 'পূর্ণ স্বাধীনতা' দাবি করেন ভারতবর্ষের জন্যে। দ্বিতীয়ত এই কংগ্রেসের এই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীই হলো ১৯২৯ সাল থেকে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের পূর্বকাল পর্যন্ত বিপ্লবকাণ্ডের মূলাধার। সুভাষচন্দ্রের পার্ক-সার্কাস ময়দানের কর্নেল লতিকা বসু পরিচালিত নারী-বাহিনী আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কর্নেল লক্ষ্মী পরিচালিত 'ঝাঁসি রাণী বাহিনী'র অঙ্কুর। সুভাষচন্দ্রের 'কলিকাতা কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী' রূপ বীজেরই রূপান্তর নেতাজীর দুর্জয় 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' রূপ মহা-মহীরুহ !!...

কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হতেই 'স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী' ভেঙ্গে গেল না। কারণ, সত্যি সুভাষচন্দ্র এবং বাঙলার বিপ্লবীরা পার্ক-সার্কাস ময়দানে মহাত্মা গান্ধীর ধারণা মত 'Philip's circus'-এর মেলা বসান নি। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' সারা বাঙলায় ছড়িয়ে পড়ল। শহর-পল্লীর রাস্তাঘাটে সামরিক পোষাক পরিহিত যুবকদল সামরিক-কায়দায় নিয়ত পা মিলিয়ে চলছে। তাতে বাঙালীর রক্তে দোলা লাগল। তরুণের স্বপ্নে এলো আগল ভাঙ্গবার দুর্বার বাসনা।

'বেঙ্গল ভলান্টিয়াস'কে সারা বাঙ্গলায় শক্ত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব সবগুলো বিপ্লবীদলই অল্পবিস্তর গ্রহণ করায় এর প্রসার বিপুল উদ্যমে বৃদ্ধি পেতে লাগল। কিন্তু যাঁরা সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে 'গ্রুপ্‌ইজম'-এর ঊর্ধ্বে একে গোটা বাংলার একটি 'মুভমেণ্ট' রূপে দাঁড় করাতে গিয়ে সেদিন অসম্ভব কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতম হলেন—সত্য গুপ্ত, পঞ্চানন চক্রবর্তী, প্রতুল ভট্টাচার্য, জগদীশ চাটার্জি, বিনোদ চক্রবর্তী, জোতিষ জোয়ারদার, বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত, ননী চৌধুরী, সৌরভ ঘোষ, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল প্রমুখ বীরবৃন্দ। এঁদের কেউ কেউ ফাঁসির মঞ্চে জীবন দান করে গেছেন। এঁদের প্রত্যেকের সংগঠন-ক্ষমতা ও বৈপ্লবিক-কার্যে অবদান প্রথম শ্রেণীর।

এই সামরিক স্বেচ্ছাবাহিনী তথা 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' বাংলার তরুণ-মানসে অদ্ভুত শৌর্যশক্তির ছায়া ফেলেছিল। সুভাষচন্দ্রের আসন ভারতের যুব-হৃদয়ে অভ্রান্ত সত্যে স্থান পেল। অবশ্য যাঁরা, গান্ধীজির অহিংসা-মন্ত্রে মুগ্ধ, অথবা যাঁরা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে অক্ষম,—সেসব শিক্ষিতের দল এই স্বেচ্ছাবাহিনী নিয়ে সেদিন যথেষ্ট ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছিলেন। গান্ধীজি স্বয়ং পার্কসার্কাস ময়দানে মিলিটারি পোষাকে সজ্জিত হাজার হাজার স্বেচ্ছাসৈণিক দেখে ভয় পেয়ে যান। তিনি বিজ্ঞ লোক বলেই সুভাষচন্দ্র ও তাঁর বাহিনীর মধ্যে অহিংসামন্ত্রের বিরোধী ঘোর 'শত্রু'কে মনে মনে আবিষ্কার করেন। তিনি অহিংসামন্ত্রের ঋষি। 'স্বাধীনতা' থেকে 'অহিংসা' তাঁর কাছে বৃহত্তর বস্তু। হিংসায় দেশ স্বাধীন হলে তাঁর আদর্শের মৃত্যু ঘটে। অতএব সর্বজন সমক্ষে "Children's Pantomime", "Philip's Circus" ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে সুভাষচন্দ্রের এই ঐতিহাসিক প্রচেষ্টাকে হেয় করবার জন্যে গান্ধীজি রূঢ় রসিকতার আশ্রয় নেন। বাংলাদেশের সুভাষবিরোধী কয়েকটি কাগজও 'গক্' (G.O.C),

"'খোকা ভগবান' ইত্যাদি মধুর বাক্যে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে সস্তা রসিকতা সৃষ্টি করে নিজেদেব দাসসুলভ অজ্ঞতার পরিচয় দেন।...

* * * *

সূর্য সেন কদম বাড়িয়েই চলেছেন। চট্টগ্রামে পূর্ণ উদ্যমে সামরিক স্বেচ্ছা-বাহিনী গঠন করা শুরু হয়েছে। শহরে এবং গ্রামে গ্রামে তাঁর দল দিন দিন প্রসারিত হতে লাগল। ১৯৩০ সালের লবণ-সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হয়ে গেছে। বিপ্লবীদের যুবকসম্প্রদায় অস্থির হয়ে উঠেছেন। প্রবীণেরাও দল সামলাবার জন্যে কিছু করার ভাবনা ভাবছেন। কিন্তু কার্যত তাঁরা এগুচ্ছেন না। বিপ্লবের প্রস্তুতি তাঁদের মতে অনেক পিছিয়ে আছে, কাজেই 'যা-কিছু একটা করে নিঃশেষ হয়ে যাবার' আগ্রহ তাঁদের কম। কিন্তু চট্টগ্রামের কথা আল্‌দা। সূর্য সেনের দল সবার অলক্ষ্যে পূর্ণ প্রস্তুতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। একটা জেলা ধরে টান দেবার ক্ষমতা তাঁদের প্রায় আয়ত্তে।...তাঁরা স্থির করলেন কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ না করে যুগান্তরের প্রবীণদের পরামর্শ না নিয়ে যথাসময়ে বৃটিশের ওপর হানবেন তাঁরা চরম আঘাত। আগুন জ্বলে উঠবে চট্টগ্রাম জেলায়—তারপব সেই অগ্নিশিখা থেকে শিখা জ্বেলে নিয়ে অপর জেলা, এবং অপর জেলাগুলো থেকে প্রদেশে-প্রদেশে বিপ্লববহ্নি জ্বেলে দিক বিপ্লবীরা, যদি সত্যি তাঁরা কাজের কাজ করতে চান। মোটের ওপব প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলে চট্টগ্রাম কাবো জন্যে অপেক্ষা করবে না। কারণ অপেক্ষা মানেই ব্যর্থতার মৃত্যু।...

* * * *

ক্রমশ কাজ শুরু করে দেবার অবস্থা এসে গেল। অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় হয়েছে। বোমার কারখানাগুলোও বসে নেই। প্যারেড এবং অস্ত্র-চালনা-শিক্ষাও ছেলেরা যথাসম্ভব পাচ্ছে। গোপন ঘাঁটি প্রচুর ঠিক করা আছে। নেতার আহ্বানে একটি অর্থভাণ্ডার খোলা হয়েছে। সে-ভাণ্ডার কেবল দলের ছেলেদের আপন গৃহ থেকে আনীত অর্থেই থাকবে ভরা। ইতিমধ্যে ঐ ভাণ্ডারের সঞ্চয় প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকার কাছে এসে গেছে! প্রস্তুতির আর বাকি ... ? চট্টগ্রামের তরুণ রক্তে লেগেছে 'সর্বনাশের নেশা'!...

## অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

১৮ই এপ্রিল। ১৯৩০ সাল। বাংলার বিপ্লব-জীবনের এক উজ্জ্বল দিন। চট্টগ্রাম শহর। রাত দশটায় 'অস্ত্রাগার' আক্রমণের সময় নির্ধারিত হয়েছিল।

ঐ দিনটি বেছে নেবার তাৎপর্য ছিল। আইরিশ-বিপ্লবীদের 'ইস্টার-বিদ্রোহে'র স্মৃতি ঐ দিবসের সঙ্গে জড়িত। সেদিন ছিল গুডফ্রাইডে।…

আইরিশ-বিপ্লবীদের সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবীরা মানসিক একাত্মতা বোধ করতেন। ভারতের 'টেরেন্স ম্যাকসুইনি' যতীন দাসকে আমরা দেখেছি। ভারতের 'ইস্টার-রাইজিং' 'চট্টগ্রাম-বিদ্রোহ' এবার আমরা দেখবো। ভারত-আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লব-চেতনা একই প্রাণসুরে স্পন্দিত বলেই সুভাষচন্দ্র এবং ডি-ভ্যালেরার বন্ধুত্ব ছিল অমন স্বতন্ত্র ও সুন্দর।

ইতিপূর্বে জাতীয় সপ্তাহের শেষ দিবসে (১৯৩০ সাল) বিপ্লবীদের একটি চরম বৈঠক সংগোপনে বসেছিল। সে বৈঠকেই স্থির হয়েছিল বিদ্রোহের তারিখ ও ক্ষণ। আরো স্থির হয়েছিল যে—বিপ্লব-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হলেন সূর্য সেন এবং 'ওয়ার কাউন্সিল' তথা যুদ্ধের অধিনায়ক-কমিটীর সভ্য হলেন নির্মল সেন, লোকনাথ বল, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী ও উপেন ভট্টাচায। বাহিনীর নাম স্থির হয়েছিল 'ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি'। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশ্বস্ত প্রধান কর্মীদের অনেকে। তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করেছিলেন যে অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে 'পুলিশ আর্মারি' আক্রান্ত হবে। নির্মল সেন ও লোকনাথ বলের নেতৃত্বে আক্রমণ করা হবে 'রেলওয়ে আর্মারি'। অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে আক্রমণ করা হবে 'টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ। তিনটি দল একই সময়ে সঙ্গীদের সহ তিনটি মোটরে যথাস্থানে পৌছে আক্রমণ চালাবেন। এই মোটরবাহিনী ব্যতীত এক পদাতিক-বাহিনী—সংখ্যায় তিরিশ জন—পুলিশ-আর্মারির কাছে এক গুপ্ত স্থানে অপেক্ষা করবেন। সংকেত পেলেই আক্রমণকারী বিপ্লবীদের সাহায্যে তাঁরা ছুটে আসবেন। অপর আর একটি মোটরে রক্ষীদল সহ সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন পুলিশ-আর্মারির কাছে সংগোপনে অপেক্ষা করবেন। সেই পূর্বনির্দেশিত স্থানটিই হবে সর্বাধিনায়কের 'হেড কোয়ার্টার'। এ্যাক্‌শান-স্কোয়াড গুলো নিজেদের কাজ সমাপ্ত করে সর্বাধিনায়কের দপ্তরে ফিরে এসে রিপোর্ট করবেন, এটাও স্থির ছিল।

দুঃসাহসে বলীয়ান, দেশমুক্তির সূচনাসৃষ্টির নেশায় মত্ত, বিপ্লবের বহ্নিশিখায় ভাস্বর, স্বজাতিপ্রেমের রসে ভরপুর বিদ্রোহী তরুণদল সকল ফ্রণ্টেই জয়ী হলেন। ১৮ই এপ্রিলের সেই রজনী জাতির ইতিহাসে সোনার অক্ষরে যে যুদ্ধলিপি রচনা

করছে তা ইতিহাস-প্রখ্যাত। এই অভিযান বাঙালীর দৃপ্ত পদযাত্রার ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেল। বালাসোরের পঞ্চবীরের আত্মা চট্টগ্রামের অজস্র বীরবৃন্দের রক্তে কোন্ লগ্নে যেন আপন অম্লান রক্তধারা প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন! দেশবাসী বিস্ময়ে, পুলকে ও আত্মগরিমায় উচ্ছল হয়ে সমস্বরে 'স্বাধীনতা-সাপ্তাহিকে'র শুধু বলে উঠল: 'ধন্য চট্টগ্রাম' !!...

পরাধীন ভারতের মুক্তিকামী-ইচ্ছা চট্টগ্রামে, কর্ণফুলীর তীরে, প্রচণ্ড শক্তিতে বৃটিশের আত্মম্ভরিতাকে সেদিন আঘাত দিল। সাহেবদের স্ত্রীপুরুষ দল বেঁধে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল কর্ণফুলী নদীর মোহনায়। তিনদিন কোন শাসনব্যবস্থা ছিল না শহরে। বিপ্লবীদের সঙ্গে লড়তে এসে দেশী ও বিলাতী কর্মচারীরা জীবন দিল কিছু, পালিয়ে গেল বহু। ম্যাজিস্ট্রেট উইলকিনসন মোটরে ছুটে এসেছিলেন বীর-বিক্রমে। বিদ্রোহীর গুলীতে তাঁর বডিগার্ড ঘায়েল হল, ড্রাইভার মারা গেল। সাহেব বুদ্ধি করে মোটরের নীচে ঢুকে গিয়ে মরার মত পড়ে রইলেন। মোটরটি অজস্র গুলীর আঘাতে শতচ্ছিদ্র হলো। সাহেব অবশ্য বেঁচে গেলেন।

বিদ্রোহীরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গুলী দখল করলেন। তারপর দু'টি আর্মারিতেই আগুন লাগিয়ে দিলেন। আতঙ্কে ও বিস্ময়ে আঁধার নিশীথে শহরবাসী দেখল যে—লেলিহান শিখা ঊর্ধ আকাশে বিছিয়ে গেছে! সর্বগ্রাসী বহ্নি তখন পুলিশ ও রেলওয়ে-লাইনের দিক থেকে উৎসারিত হচ্ছিল !...

বিপ্লবীরা ইংরেজের 'ইউনিয়ান জ্যাক' নামিয়ে ফেললেন। তার স্থানে উড্ডীন হল জাতীয় পতাকা।

নির্দিষ্ট কাজ শেষ হতেই সকল ফ্রণ্ট থেকে কর্মীরা ফিরে এলেন হেড্ কোয়ার্টারে, অর্থাৎ পুলিশ-লাইনের সেই নির্দিষ্ট স্থানে। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি ঘন ঘন উচ্চারিত হতে লাগল। সেই ধ্বনি শহর পার হয়ে কর্ণফুলীর শতসহস্র তরঙ্গে কেঁপে কেঁপে গেল, পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে বনের নিভৃত নিরালায় প্রতিধ্বনিত হয়ে চলল। চট্টগ্রামের বুকে মৃত্যুবিজয়ী বীরগণের জয়নাদ অভূতপূর্ব জীবনের সাড়া দিল।

বিপ্লবীরা সর্বাধিনায়কের সম্মুখে সামরিক রীতিতে লাইনবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। 'ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি' সগৌরবে সর্বাধিনায়ককে 'গার্ড-অব্-অনার' জানিয়ে সম্মানিত হলেন।...

এদিকে ঠিক ৯-৪৫ মিনিটে একদল বিপ্লবী শহর থেকে ৪০ মাইল দূরে 'ধুম'

স্টেশানে কতগুলো 'ফিশ্-প্লেট্' তুলে একখানা মালগাড়িকে লাইনচ্যুত করে চট্টগ্রাম মেল্ ট্রেনটিকে আটক করার ব্যবস্থা করেন। তা' ছাড়া ৩৪ মাইল দূরে 'লাঙলকোটে' টেলিগ্রাফের তার কেটে ও স্থানে-স্থানে লাইনের 'ফিশ্-প্লেট' সরিয়ে তাঁরা চলাচল ও সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা নষ্ট করে রাখেন।

বিপ্লবীদল হেডকোয়ার্টারে একত্রিত হয়ে অতঃপর কি প্ল্যানে কাজ করা হবে তা' আলোচনা করছেন। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে অনতিদূরের 'ওয়াটার ওয়ার্কস্'-এর দিক থেকে 'লুইস্ গানে'র অসংখ্য গুলী আসতে লাগল। বিপ্লবীদের জানা ছিল না যে ওখানে একটি লুইস্ গান ছিল। গুলীর প্রত্যুত্তরে এঁরা-ও প্রচুর গুলীবর্ষণ করতে লাগলেন।...সহসা সবাই দেখলেন যে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় কে যেন আর্মারির দিক থেকে ছুটে আসছে! কিছুটা কাছে আসতেই চেনা গেল। সকলে চিৎকার করে উঠলেন—হিমাংশু সেন যে!...তাঁকে টেনে এনে মাটিতে চেপে ধরে তাঁর গায়েব আগুন নেভান হল। তারপর কোনো পরামর্শের অপেক্ষো না করে অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষ তাঁকে মোটবে তুলে ছুটে চলে গেলেন শহবের দিকে কোন আস্তানায় চিকিৎসার জন্যে তাঁকে রেখে আসতে। তাঁদের সঙ্গে গেলেন জীবন ও আনন্দ।...

এদিকে গুলীবর্ষণ চলছে উভয় তবফেই। বিদ্রোহীরা ভাবলেন যে, পুলিশ হয়তো রি-ইন্ফোর্সমেন্টেব ব্যবস্থা করেছে। ভাবলেন, হয়তো তাঁদেরকে ঘেরাও করে ফেলবে সামরিকবাহিনীর সাহায্যে। সূর্য সেন তখন আদেশ দিলেন আত্মগোপনের পথ দেখতে। শহরে যাওয়া ঠিক নয়। পাহাডের দিকে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষের মত নেতৃস্থানীয় সুদক্ষ সাথীরা যে ফিরে আসছেন না? দু' ঘণ্টা কেটে গেছে—আর তো অপেক্ষা করা চলে না। হয়তো ওঁদের চারজনকে আটক করে ফেলেছে শত্রুরা। হাঁ, হয়তো তা-ই। কাজেই সবাধিনায়ক হুকুম দিলেন যে, যথাসম্ভব অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে এগুতে হবে পাহাড়ের দিকে।...

দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের, দুর্ভাগ্য বিদ্রোহীদের। ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা সহজ যুদ্ধ ত্যাগ করে কঠিনতর যুদ্ধে এগিয়ে চললেন। কারণ পুলিশের কোন রি-ইন্ফোর্সমেন্ট-ই হয় নি। মুষ্টিমেয় কর্মচারী একটিমাত্র লুইস্ গান নিয়ে লড়ছিল। তারা স্থির করতে পারছিল না যে পালাবে, না আত্মসমর্পণ করবে। সমস্ত শহর অরক্ষিত, তিন দিন পর্যন্ত বাইরের জগতের সঙ্গে চট্টগ্রামের কোন সম্পর্ক ছিল না।

কিন্তু ভাগ্যবিধাতার লিখন আলাদা। ভুল ধারণা করে বিদ্রোহীরা বুভুক্ষু ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় বহনযোগ্য স্বল্পতর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দুর্গম পর্বতের বন্ধুর পথে যাত্রা করলেন। পাহাড়ি-পথের সন্ধান জানতেন অম্বিকা চক্রবর্তী। তিনি চললেন পথ দেখিয়ে। সহজতর যুদ্ধের সম্ভাবনা ত্যাগ করে কঠিনতর যুদ্ধের বিপদে তরুণ ও কিশোর বীরদের এই পদযাত্রার পরিণতিই 'জালালাবাদ-ইতিহাস'।...

## জালালাবাদ-যুদ্ধ

পাহাড়ের গায়ে বিদ্রোহীদের সমাবেশ সরকার পক্ষের অজানা রইল না। তাই 'ইস্টার্ন রাইফেলস্ বাহিনী' ও 'সুর্মাভেলী বাহিনী' সহ পুলিশ ও সরকারের বড়কর্তারা জালালাবাদ পাহাড় ঘিরে ফেলার কল্পনা নিয়ে এগিয়ে এলেন। কিন্তু তাঁদেরও অসুবিধা ছিল। তাঁরা জানতেন না কোন্ বিশেষ স্থানে বিদ্রোহীরা ওৎ পেতে আছেন। তাঁরা জানতেন না কেমন তাদের লোকবল এবং অস্ত্রবল।

জালালাবাদ-যুদ্ধে তাই সরকার পক্ষের হার হলো। এই যুদ্ধে বিজয়ী বিপ্লবীদলের অধিনায়ক লোকনাথ বলের লিখিত বিবরণের মূল্য খুব বেশি। তিনি লিখেছেন 'যুগান্তর' পত্রিকার স্বাধীনতাসংখ্যায় :—

"বাইশে এপ্রিল প্রাতে দীর্ঘপথ পার হবার পর জালালাবাদ পাহাড়ে উঠে আশ্রয় নিয়েছি। ১৮ই এপ্রিল ( ১৯৩০ ) অস্ত্রাগার দখল করার পর চট্টগ্রাম আমাদের আয়ত্তে আসে। তারপর বিভিন্ন পাহাড়ে আমরা দিন কাটাই। এই ক'দিন আহার জোটে নি। পাহাড়ের ঘোলা জল এবং বুনো কাঁচা আম ছিল আমাদের পানীয় ও আহার। ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে ওঠার সময় অনেক গ্রামবাসী আমাদের দেখেছিল। কাজেই আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, পুলিশ এবার আমাদের খুঁজে পাবে। দুর্যোগের জন্যে মনের দিক থেকে তাই আমরা তৈয়ের ছিলাম। অবশ্য তিন দিন ধরে অভুক্ত অবস্থায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা হয়েছে। দেহের দিক থেকে আমরা ক্লান্ত।...

"বেলা অনুমান পাঁচটা। হঠাৎ পাহাড়ের উপর থেকে আমাদের রক্ষীরা বিপদ-ধ্বনি বাজিয়েছেন। সবাই পাহাড়ের চূড়ায় জড় হলাম। দেখলাম একদল সৈন্যবাহিনী সঙ্গীন উঁচিয়ে আমাদের পাহাড়ের দিকে ছুটে আসছে। আমরা মরিয়া হয়ে রাইফেল বাগিয়ে দাঁড়ালাম। সৈন্যবাহিনী আমাদের নিশানার মধ্যে আসতেই গুলীবর্ষণের নির্দেশ দেওয়া হল। আমাদের গুলীবর্ষণ শুরু হতেই সৈন্যরা পিছু হটতে লাগল। কিছুটা দূরে তারা পেল একটি পাহাড়ী খাদ।

সেখানে তখন জল ছিল না বললেই হয়। সেই খাদে ঢুকে তারা পাল্টা জবাব দিতে শুরু করল। প্রায় পনের মিনিট যুদ্ধ চলার পর আমরা হঠাৎ লুইস্‌গানের গুলীবর্ষণের আওয়াজ শুনলাম। গুলীবর্ষণ ক্রমশ তীব্রতর হয়ে উঠল। আমার পাশে আমার ছোটভাই হরিগোপাল ('টেগরা') আহত হয়ে ঢলে পড়লেন। বলে গেলেন—'দাদা! আমি চললাম। তোমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করো।' দেখতে দেখতে ত্রিপুরা সেনগুপ্ত, নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য, প্রভাস বল, মধু দত্ত, নির্মল সেন, অর্ধেন্দু দস্তিদার, জিতেন দাসগুপ্ত, পুলিন ঘোষ, শশাঙ্ক সেন, মতি কানুনগো আহত হয়ে ধুলোয় গড়িয়ে পড়লেন। তাঁদের রক্তে লাল হয়ে উঠল জালালাবাদের মাটি।···তখন অনুমান সাতটা। হঠাৎ সরকারী সৈন্য-বাহিনীর দিক থেকে তিনবার হুইসেল বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের

হরিগোপাল বল (টেগরা)

ত্রিপুরারঞ্জন সেনগুপ্ত

গুলীবর্ষণের আওয়াজ থেমে গেল। আমরা 'লাইং ডাউন্ পজিশন্' থেকে লাফিয়ে উঠে দেখলাম সৈন্যবাহিনী পলায়ন করছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গুলীবর্ষণ পুনরায় শুরু হলো। আমাদের 'বন্দেমাতরম্' ও 'ইন্‌ক্লাব্ জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিকদিগন্ত কাঁপিয়ে তুলল। উঃ, সে কি বিজয়োল্লাস! তিন দিনের অভুক্ত, পথশ্রমে ক্লান্ত, তৃষ্ণায় কাতর জনপঞ্চাশেক বিপ্লবী (তাঁদের অধিকাংশই ছিল

পনের-ষোল বছরের কিশোর ) দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এবং মৃত্যুনেশায় মত্ত হয়ে দাঁড়িয়েছেন একদিকে—আর অন্যদিকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, রণবিদ্যায় পারদর্শী, বহু যুদ্ধবিজয়ী বৃটিশের সৈন্যবাহিনী। তাই সে-মুহূর্তের জয়লাভ বিপ্লবীদের ইতিহাসে কম গৌরবের কথা নয়।”···

পাহাড়ের গা বেয়ে কালের যবনিকা নেমে আসছে। সন্ধ্যা গাঢ়তর হয়ে এল। জালালাবাদের রণাঙ্গনে শায়িত শহিদবৃন্দ। সর্বাধিনায়কের আদেশে মৃত সৈনিকদের 'গার্ড-অব-অনার' দেওয়া হল। তারপর অঙ্গ থেকে অস্ত্রশস্ত্র অপসারিত করে, অন্তহীন আকাশের নীচে, কঠিন ধরণীর ধূলিশয্যায় বীরদের রেখে সমগ্র বাহিনী চোখের জলে বিদায় নিলেন স্থানান্তরে যাবার জন্যে। এই যুদ্ধে যাঁরা আত্মদান করেছিলেন তাঁদের নাম হলো—নরেশ রায়, ত্রিপুর সেনগুপ্ত, বিধু ভট্টাচার্য, হরিগোপাল বল, মতি কানুনগো, প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত, নির্মল লালা, জিতেন দাসগুপ্ত, মধু দত্ত, পুলিন ঘোষ, অর্ধেন্দু দস্তিদার। আহত অম্বিকা চক্রবর্তীকেও মৃত মনে করে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রেখে অন্যান্য আহতদের নিয়ে সর্বাধিনায়কের বাহিনী গভীর অন্ধকারে পাহাড়ের পথ ভেঙে দূরে সরে যেতে চাইলেন। কারণ প্রভাত হতেই ইংরেজের তিন-চারটি সামরিক ডিভিশন তাঁদের ঘিরে ফেলে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। সূর্য সেন খবর পেয়েছেন যে, ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম সৈন্যে ছেয়ে গেছে। তারা প্রত্যেক ইঞ্চি জমি রাইফেলের ডগা দিয়ে চষে ফেলবে।

ঘনান্ধকারে, দুর্গমপথে ক্লান্ত পদক্ষেপে চলতে গিয়ে বাহিনীর একাংশ সহ সূর্য সেন ও নির্মল সেন কিন্তু লোকনাথ বল ও বাহিনীর অপরাংশকে হারিয়ে ফেললেন! সর্বধিনায়কের সঙ্গে তাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন লোকনাথ বল।···

সূর্য সেন ও তাঁর বন্ধুগণ ভোরের দিকে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলেন। দূরে দেখা যায় জালালাবাদ। সেখানে শায়িত শহিদকুল—যাঁরা রক্তাক্ষরে লিখে রেখেছেন মুক্তির বাণী। তাঁরা স্বাধীনতার অগ্রদূত। মৃত্যুকে বরণ করে ঐ কিশোরদল সর্বাধিনায়কের অগ্রজ হয়েছেন। তাঁরা জাতির নমস্য।····

* * * *

অম্বিকা চক্রবর্তীর চেতনা ফিরে আসতেই মৃতদের দেহস্তূপ থেকে তিনি নিজেকে অতি কষ্টে বের করে আনলেন। তারপর আপ্রাণ চেষ্টায় পথ-চলা শুরু করলেন ঘন অন্ধকার ঠেলেঠুলে। পথ তাঁর কিছুটা জানা থাকায় 'ফতেয়াবাদ'

গ্রামের এক আশ্রয়ে তিনি এসে উঠলেন। কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেলেও তিনি আজ নিঃসঙ্গ। কোথায় মাস্টারদা, নির্মল সেন, লোকনাথ বল? কোথায় গনেশ ঘোষ, অনন্ত সিং? কোথায় অন্য সব মৃত্যুপথযাত্রী সাথী? তিনি একা। এই ভূমণ্ডলে তাঁর সঙ্গী কেউ নেই। তিনি একা!!...

* * * *

২৩শে এপ্রিলের প্রভাত। সারা শহর মিলিটারি পাহারার চাপে অতিষ্ঠ। 'আর্মড্‌কার'গুলি দৈত্যের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। গত দিনের অপরাহ্নে যে বীরপুরুষেরা কতিপয় বিপ্লবীর সঙ্গে যুদ্ধে হেরে পালিয়ে এসেছিল তারাই আজ উন্মাদের বার্যে নিরীহ নগরবাসীকে নির্যাতন করছে। ভোরের স্পেশাল ট্রেনে আরো এক হাজার জঙ্গীপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। রেলের ইঞ্জিনে লুইস্‌গান্‌ বসিয়ে মেইন লাইনে এবং শাখা লাইনগুলোয় সৈনিকেরা চট্টগ্রাম জেলায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। উদ্দেশ্য শুধু জানান দেওয়া—'ওরা কেউ নয়। আমরা আছি। এখনো আছি।'...

ইংরেজের সশস্ত্রবাহিনী বীরদর্পে এবার জালালাবাদ পাহাড চষে ফেলবে। এবার তাদের জয় নিশ্চিত। দলে দলে বাহিনীর লোকেরা নানা পথে পাহাড়ে উঠতে লাগল। পাহাড় যেন শ্মশান। গতকল্যের ভীষণ যুদ্ধে স্তব্ধ পাহাডের কোথাও যেন প্রাণ নেই। পত্রহীন বৃক্ষলতা, কলরব নেই পাখির কণ্ঠে, বনের পশু উধাও।

সেনাবাহিনীর বড বড কর্মচারীরা বুঝলেন যে, বিপ্লবীরা পালিয়েছে। কিন্তু তাঁদের সম্মুখে পাহাডের ভূমিশয্যায় শুয়ে আছেন বারটি বীর। তাঁদের মধ্যে একটি গুলীবিদ্ধ হয়েও প্রাণ হারান নি। অর্ধেন্দু দস্তিদারকে জেল-হাসপাতালে পাঠান হল। সেখানেই তিনি দেহরক্ষা কবে অমর হলেন।...

খাঁটি ইংরেজ শত্রুকে ঘৃণা করলেও তাব বীরত্বে শ্রদ্ধাবান। কারণ, ইংরেজ বীরের জাত। মৃতেব সঙ্গে লডাই করে কাপুরুষ। ইংরেজ কাপুরুষ নয়। কাজেই মৃত বীরদের দেহগুলো পর পর সাজান হবার পর পুলিশ তাঁদের ফটো তোলা, তাঁদেব সনাক্ত করা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ শেষ করলে। সামরিক-কর্মচারী ও সেনাবাহিনী চট্টগ্রামের বিদ্রোহী শহিদদের 'সামরিক কায়দায় অভিনন্দন' জানালেন!...তৎপর চিতাশয্যায় প্রচুর পেট্রল ঢেলে আগুন দিতেই সহস্রশিখা মেলে ধরণীর দাহ উর্ধমুখী হল।—

"...তোমার দক্ষিণ করে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
দুঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার
জ্বলিয়াছে বিদ্ধ করি দেশের আঁধার
ধ্রুবতারকার মতো? জয় তব জয়!"...

জালালাবাদের শহিদবৃন্দ মৃত্যুহীন আলোকে উদ্ভাসিত করে গেলেন পৃথিবীর মুখ। বিশ্বের নির্যাতিতের দল এই আলোকশিখা থেকে আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে পথচলার সংকল্প গ্রহণে ধন্য হলো।

## কালারপোল লড়াই

জালালাবাদ-যুদ্ধের রাতে পাহাড়ী-পথের ঘনান্ধকারে মাস্টারদা-নির্মলসেনের দল থেকে লোকনাথ বলের দল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করে শেষটায় তাদের মিলন ঘটে 'কোয়াপাড়া' গ্রামে। এই গাঁয়ে পূর্বেই মাস্টারদারা আশ্রয় পেয়েছিলেন দলের অনন্যসাধারণ হৃদয়বান সাহসী কর্মী বিনয় সেনের গৃহে। মায়ের গহনা বিক্রয় করে, বাসনপত্তর বন্ধক দিয়েও দিনের পর দিন এই পলাতকদলকে বিনয় সেন আহার দিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন।

* * * *

বিপ্লবীরা নতুন কার্যক্রম স্থির করার আগ্রহে আলোচনায় রত। মাস্টারদা বলছেন: "আমরা এবার 'একলা' চলছি পথ। বৃহত্তর ভারতে, এমন কি বৃহৎ বাংলায়ও আমাদের 'কর্মক্ষেত্র' নয়। আমাদের স্বেচ্ছায় বেছে নেওয়া কর্মস্থান চট্টগ্রামের সীমায়। কিন্তু প্রচণ্ডতম আঘাত এখান থেকেই বৃটিশের ওপর আমরা হানবো বারে বারে। এ আঘাতের ঢেউ সুদূরবাসী সতীর্থদের বিপ্লবমুগ্ধ প্রাণে নিশ্চয়ই সাড়া আনবে। লাহোরে যতীন দাসের অনশনে মৃত্যুবরণের যাতনা দূরান্তে এই চট্টলার বুকে বসেও আমরা কত গভীর করে অনুভব করেছি। তেমনি একটি জেলার সসীম ক্ষেত্রের বিদ্রোহের বাণী বাংলা ও ভারতের প্রাণবন্ত অংশে নিশ্চয় প্রেরণা যোগাবে। আমি চট্টগ্রামে বসেই চট্টগ্রামের তরুণ-শক্তির স্বপ্নকে রূপ দিতে গিয়ে আমার শেষ শয্যা বিছিয়ে দেব। যদি তোমাদের কেউ এখানে থাকতে না পারো তবে বাইরে পালিয়ে গিয়ে বিপ্লবকর্মের ক্ষেত্র রচনা করো।"

(চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন—পৃঃ ১৫৬)

মাস্টারদার বিশ্বস্ততম সুদক্ষ সতীর্থ, 'ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি'র প্রাণস্বরূপ নির্মল সেন বলেন : "মনে রেখো আমাদের মধ্যে মরতে সকলেই পারে। কিন্তু বাঁচতে বা বাঁচাতে পারে ক'জন ? পলাতকজীবন আমাদের শুরু হয়েছে ; অনন্ত কাজ পড়ে আছে সুমুখে। হুজুগের মুখে কোন কিছু করা যাবে না। প্রস্তুতির প্রয়োজন। চাই ধৈর্য, চাই সতর্কদৃষ্টি ও বিচক্ষণ পদক্ষেপ।"

( চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন )

তারপর দক্ষ কর্মী তরুণ মহেন্দ্র চৌধুরীর পানে তাকিয়ে বললেন নির্মল সেন : "পারবে যে-কাজ দেব তা করতে ?"

মৃত্যুপাগল দুঃসাহসী মহেন্দ্রকে গঠনকাজে জড়িয়ে ফেলতে চান তাঁর নেতা। মহেন্দ্র দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন : "পারব।"

( চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন )

স্থির হলো পলাতক-জীবনে আগামী য়্যাক্‌শানের জন্যে তৈরি হতে হলে এবং পর পর য়্যাক্‌শান সাফল্যের সহিত করে যেতে হলে একটি সুদক্ষ বিপ্লবী গোয়েন্দা-বিভাগ থাকা আবশ্যক। নেতাদের বিচারে এ বিভাগের দায়িত্ব মহেন্দ্র চৌধুরী গ্রহণ করলে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। মহেন্দ্রের সহকারীরূপে আরো তিনটি উপযুক্ত তরুণকে দেওয়া হল। মহেন্দ্রের যোগাযোগ থাকবে শুধু মাস্টারদা ও নির্মল সেনের সঙ্গে, দলের আর কারো সঙ্গে নয়। বলা বাহুল্য মহেন্দ্র চৌধুরী অপূর্ব দক্ষতায় তাঁর কর্তব্য পালন করে গেছেন। তাঁর বিভাগটির সহায়তা ব্যতীত সর্বাধিনায়কের কর্মকাণ্ড অপ্রতিহত হতে পারতো না। মহেন্দ্র চৌধুরীর এ-কাজের প্রধান সহায়ক ছিলেন সতীনাথ সেন। সতীনাথবাবু আপাতদৃষ্টিতে ছিলেন মাস্টারদার গৃহীভক্ত। কিন্তু গৃহ তাঁর কাছে কোন কালে বন্ধনরূপে আসে নি। গৃহ ছিল তাঁর 'ক্যামোফ্লাজ'। কাজেই যে-সাহায্য তিনি এই 'ক্যামোফ্লাজ'-এর আশ্রয়ে সেই দুর্দিনে বিপ্লব-কার্যে যোগ দিতে পেরেছিলেন তা' অতুলনীয়।...

* * * *

নির্মল সেন মাস্টারদার কাছে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করলেন যে, 'মৃত্যু-পাগল ক'টি ভাইকে ছেড়ে দিতে হবে।

'কেন ?'

'পাহাড়তলীর শ্বেতাঙ্গপাড়া আক্রমণ করার ইচ্ছা তাদের। এসব ফিরিঙ্গীরাই

পুলিশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সারা শহরে অকথ্য অনাচার চালিয়ে যাচ্ছে। সবার আত্মপ্রত্যয় লুপ্ত হবে এখুনি কোন প্রত্যুত্তর না দিলে।'

( চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন )

মাস্টারদা স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন : 'যে যজ্ঞ আরম্ভ করেছি তাকে অনির্বাণ রাখতে হলে এমনি প্রাণ-নিবেদনে যজ্ঞকুণ্ডের বহ্নিকে জাগিয়ে রাখতে হবে বই কি !'

( চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন )

স্থির হলো রজতকুমার, মনোরঞ্জন, দেবীপ্রসাদ, ফণীন্দ্র নন্দী, স্বদেশ রায় ও সুবোধ চৌধুরী এ কাজের দায়িত্ব পাবেন।

*　*　*　*

৫ই মে। শহরে শ্বেতাঙ্গ-সম্প্রদায়ের পাড়া পুলিশ, আই-বি ও সান্ত্রীদের খবরদারীতে সচকিত। ছয়টি পলাতক বিপ্লবী সঙ্গোপনে সে-পাড়া ঘুরে দেখলেন। কিন্তু কাজের সুবিধে না হওয়ায় তাঁরা রজতের মা ( চট্টগ্রাম-বিপ্লবীদের সাক্ষাৎ জননী ) বিনোদিনী দেবীর কাছে চলে গেলেন একটু মায়ের স্নেহ-আশীর্বাদ মৃত্যুর পূর্বে আহরণ করার জন্যে।

রজতদের বাড়ি নিকটেই। বাড়িতে ঢুকেই রজত মা'র কাছে আব্দার করে বললেন : 'আমরা ছ'জন এসেছি, তাড়াতাড়ি খেতে দাও।'

মা'র পায়ে সবাই উপুড় হয়ে প্রণাম করলেন। জননীর প্রাণ কান্নায় আকুল। আশীর্বাদ করলেন তিনি। ছুটে গেলেন রান্না ঘরে। খাবার তৈরী করতে হবে !···

রজত তাঁর ছোট ভাইকে বাড়ির সুমুখে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন পাহারা দেবার নির্দেশ দিয়ে। কিছুক্ষণ পরে ভাতের থালা সাজিয়ে মা তাঁর ছ'টি অভুক্ত সন্তানকে খেতে ডাকলেন। এমন সময় ছোট ভাই ছুটে এসে জানাল যে, পুলিশ আসছে।···থালার ভাত কেউ স্পর্শ করতে পারলেন না। ছ'জনই খিড়কি পথে বেরিয়ে গেলেন। চিত্ত তাঁদের ভাবনাহীন। তাই যাবার কালে রজত বলে যেতে পারলেন : "মা, দুঃখ কোরো না। চট্টলার পথে পথে, গাঁয়ে গাঁয়ে তোমার মত আরো 'মা' আছেন বিপ্লবীদের ক্ষুধায় অন্ন দান করার জন্যে।"···

মা'র বুকখানা শতধা-বিভক্ত হয়ে গেল। সারা মর্মে আকুল ক্রন্দনধ্বনি। কিন্তু চোখে একফোঁটা জল আসতে দিলেন না, যদি তাতে পুত্রদের অকল্যাণ হয় !···

রজতের গর্ভধারিণী, বিপ্লবীদের জননী বিনোদিনী দেবীকে আমরা

দেখলাম। মমতায় করুণ, কর্তব্যে কঠিন এই নারীর স্নেহচ্ছায়ে চট্টগ্রামের বহু কিশোর-তরুণ আপন জীবনপাত্র রসোচ্ছল করে নিয়েছেন। তাই তাঁদের মৃত্যু-বর্ণবিভয়ে সমুজ্জ্বল। তাই তাঁদের কর্ম প্রাণরসে নিটোল। তাঁরা জীবনে-মরণে অকিঞ্চন হতে পেরেছিলেন।...

বিপ্লবীরা ছুটে চলে এলেন নদীতীরে। সাম্পানযোগে পাড়ি দিলেন দু'কূল-প্লাবী কর্ণফুলী। পুলিশ পেছন নিয়েছে। এলেন কালারপোল গাঁয়ে। পুলিশের 'ডাকাত' 'ডাকাত' চিৎকারে গ্রামবাসী তাঁদের ঘেরাও করে ফেলবার চেষ্টা করল। ডাকাত ধরতে পারলেই বিস্তর পুরস্কার-প্রাপ্তির লোভ আছে। বিপ্লবীরা গুলি ছুঁড়তে লাগলেন। বাধা দিতে এসে অনেকে প্রাণ হারাল। ইতিমধ্যে একটি পুলের কাছে তিন দল পুলিশ ও গ্রামবাসীদের একটি দল পথ আগলে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গেছে। বিদ্রোহীরা ছুটতে ছুটতে সেইস্থানেই এসে গেলেন। যুদ্ধ হলো। স্বল্পক্ষণের জন্য হলেও, তীব্রতর। সুবোধ চৌধুরী আহত অবস্থায় বন্দী হয়েছেন। ফণীন্দ্র নন্দীও পিঞ্জরাবদ্ধ। চট্টগ্রাম গোয়েন্দা-বিভাগের কর্তা কুখ্যাত আসানুল্লার দল, ডি-আই-জি ফার্মারের দল এবং কর্নেল ডেলাস্মিথের দল পুলিশ-শক্তিকে প্রচণ্ডতর করেছে। তারা এবার চারটি কিশোর বীরকে ধরবার জন্যে উন্মত্ত। কিন্তু রজত, স্বদেশ, দেবীপ্রসাদ ও মনোরঞ্জন আঁধারের বুকে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল! পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে না!...

তখন রাত দুটো। পুলিশ ধারেপাশের সবগুলো গ্রামই ঘেরাও করে রেখেছে। প্রভাতের অপেক্ষায় তাদের প্রতীক্ষা।...ইতিমধ্যে ওঁরা চারজন ছুটতে ছুটতে 'জুলধা' গ্রামের এক মুসলমান গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকে গৃহিণীকে সকাতরে বললেন: "মা, আমরা আজ তিন দিন কিছু খাই নি, দুটো পান্তাভাত দেবে?"

বাঙলার মেয়ের 'মা ডাকিতে প্রাণ করে আন্‌চান, চোখে আসে জল ভরে'! মুসলমান এই দয়াময়ী নারী আশ্রয়প্রার্থী বালকদের ঘরে নিয়ে বসালেন। উনুনে ভাত চাপিয়ে দিলেন। কিন্তু হায়রে নিষ্ঠুর বিধাতা! নিয়তির এই কি নির্দেশ?...

ক'র কাছে, কোথা থেকে যেন খবর পেয়ে পুলিশ সরবে ঐ আশ্রয়স্থলে এসে গেল। উপায়ান্তর নেই। মুসলমান-গৃহস্থেরই পরামর্শে বিদ্রোহীরা বাড়ি থেকে সামান্য দূরের শণ-বনে লুকিয়ে রইলেন। ক্ষুধার অন্ন পুনরায় হাঁড়িতে পুড়ে গেল। মুসলমানী মা'র চোখ দুটি-ও শুষ্ক রইল না।...

রাত্রি প্রভাত হতেই স্বল্পঘন শণ-বনে বিদ্রোহীদের দেখতে পেল পুলিশ।

ডি-আই-জি মিঃ ফার্মারের বাহিনী তাঁদের ঘিরে ফেলেছে। পুলিশ চেঁচিয়ে বলল : সারেন্ডার্ !' ..উত্তরে বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল।···প্রবল সংঘর্ষ।... 'সপ্তরথী'র দুর্বার শক্তি 'চট্টলার অভিমন্যু'কে পরিবেষ্টিত করেছে! কিছুক্ষণের মধ্যেই রজত-স্বদেশ-দেবীপ্রসাদ-মনোরঞ্জন আহত হলেন। আহত অবস্থায়-ও তাঁরা মাটিতে বুক রেখে গুলী ছুঁড়তে লাগলেন। জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তাঁরা যুদ্ধ করে গেলেন। চারটি কিশোর বিদ্রোহীর মহা মৃত্যু সেই প্রভাতের পূর্বাকাশে সোনার লিপিতে লেখা রইল।···বিনোদিনী দেবী তখনো ভাবছিলেন, ওঁরা তাঁর কাছে ফিরে যাবেন !!...

সংগ্রামী ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার পথে আর এক পা এগিয়ে দিল রক্তক্ষরা এই "কালারপোল"।...

## ফরাসী চন্দননগরে চট্টলার কতিপয় বীর

সেদিন অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় হিমাংশু সেনকে তুলে নিয়ে অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত মোটর যোগে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলেন শহরের দিকে। পথ চেয়ে আর কাল গুণে এদিকে অপেক্ষা করছেন সর্বাধিনায়ক বিশ্বস্ত বন্ধুদের জন্যে। কিন্তু তাঁরা আর ফিরে আসতে পারলেন না। শহরের অবস্থা কঠিন। প্রতিপদে ধরা পড়ার আশঙ্কা। তা'ছাড়া মাস্টারদা তাঁর বাহিনী নিয়ে কোথায় ছুটে বেড়াচ্ছেন জানবার উপায় নেই। হিমাংশুকে 'চন্দনপুরা'য় সুখেন্দু দস্তিদারের হেফাজতে রেখে তাঁরা গেলেন রজতের বাসায়। বিপ্লবী-জননী অভুক্ত সন্তানদের সহস্তে থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।...

* * * *

সারা চট্টগ্রাম পুলিশ ও সেনাবাহিনীর দাপটে তোলপাড়। গণেশবাবুরা কুমিল্লার পথে হাঁটা দিলেন দুর্ভেদ্য অন্ধকারের আহ্বানে।...

২২শে এপ্রিল মাস্টারদা-নির্মলসেন-লোকনাথ বল জালালাবাদে বিজয়-নিশান উড্ডীন করেছেন প্রচুর তরুণ-রক্তের ধারা বইয়ে। এদিকে অপর চারটি বিপ্লবী ফেণী-স্টেশনে আত্মরক্ষার সংগ্রাম রচনা করেছেন বিষম বীরত্বে! আবার ঐ ২২শে এপ্রিল-ই রাত আটটায় 'ভাটিয়ারি' স্টেশানের স্টেশান্‌মাস্টার চারটি যুবককে কুমিল্লার টিকিট ক্রয় করতে দেখে সন্দেহ করলেন। তিনি তাঁদের টিকিটের নম্বর-গুলো তার-যোগে জানিয়ে দিলেন সীতাকুণ্ড, ফেণী ও লাক্‌সামের রেলকর্তৃপক্ষকে নিজের সন্দেহের কথা প্রকাশ করে।

ফেণীর দারোগা সদলবলে স্টেশানে উপস্থিত। গাড়ি স্টেশানে পৌঁছতেই দারোগার সংকেতে যুবক চারটিকে গাড়ি থেকে নামান হল। স্টেশানমাস্টারের ঘরে তাঁদের নিয়ে আসার পর দারোগা তাঁর সহকারীকে আদেশ দিলেন যুবকদের দেহ-তল্লাসী নিতে। বিপ্লবীরা প্রমাদ গণলেন। মুহূর্তে পিস্তল গর্জে উঠল। বিস্তর গুলীবর্ষণে পুলিশের কিছু লোক ঘায়েল হল, কিছু পালাল। গাড়ির প্যাসেঞ্জার ও স্টেশানের লোকজন পাগলের মত ছুটাছুটি করে সর্বত্র একটা অদ্ভুত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করায় বিপ্লবীরা সুযোগ পেলেন ঘনান্ধকারে গাঁয়ের পথে পালিয়ে যেতে।

ফেণীর এই সংঘর্ষের সংবাদ চট্টগ্রামে তার-যোগে জানান হল। কিন্তু তখন কর্তারা সমগ্র শক্তির বিনিময়ে জালালাবাদের বিদ্রোহী-বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করছেন!…

* * * *

অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, জীবন ও আনন্দ নির্বিঘ্নে কলকাতা পৌঁছে গেলেন। তাঁদের আশ্রয় দেবাব অনেকটা দায়িত্ব নিলেন যুগান্তবেব কর্তৃপক্ষ। এদিকে সূর্য সেন-ও এ সংবাদ পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। তিনি নির্মল সেনের সঙ্গে একমত হয়ে লোকনাথ বলকে পরামর্শ দিলেন কলকাতা পালিয়ে গিয়ে গণেশবাবুদের সঙ্গে মিলিত হতে। সর্বাধিনায়কের ধারণা যে—লোকনাথ বলের মত ব্যক্তি, যাঁর চেহারা চোখে পড়ার মত বীর্যদৃপ্ত ও সুন্দর, যাঁকে চেনে না এমন লোক চট্টগ্রাম শহরে বিরল—তাঁর পক্ষে পালিয়ে-পালিয়ে ঘোরা বিপজ্জনক। অথচ এই সুদক্ষ কর্মী যদি অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষের সঙ্গে কলকাতায় মিলিত হতে পারেন তবে ভবিষ্যৎ কর্মোদ্যোগ ( চট্টগ্রামের বাইরে ) সফলতর হতে পারবে।…সতীনাথ সেন লোকনাথবাবুকে কলকাতা পালিয়ে যাবার ব্যাপারে যথাপ্রয়োজন সাহায্য করলেন।

লোকনাথ বল নিজের বুদ্ধিবলে বিনা ঝামেলায় কলকাতা এসে যুগান্তরের নেতাদের সাহায্যে গণেশ ঘোষদের আস্তানায় উপস্থিত হলেন।…

* * * *

চন্দননগর। বাংলার বিপ্লবীদের বিচিত্র কার্যকলাপে ফরাসী-অধিকৃত এ শহরটি খ্যাত। এর ধূলিকণায় রোমান্টিক স্বপ্ন বিছানো। যুগান্তর-কর্তৃপক্ষ এখানেই একটি গৃহ ভাড়া নিলেন দলের বিশ্বস্ত কর্মী শশধর আচার্যের নামে। অনাড়ম্বর ও অতি মধুর স্বভাবের এই মানুষটি ইস্পাতের মত দৃঢ় ও বজ্রের মত কঠিন তাঁর কর্তব্যপালনে। শশধর ছিলেন অবিবাহিত এবং রেলের কর্মচারী।

কিন্তু বিবাহিত লোক ছাড়া সেসময় কোথাও বাড়ি ভাড়া পাওয়া যেত না। বাড়ি পেলেও পুলিশের নজরে সে-বাড়ি পড়বেই। সুতরাং দলের-ই একটি মহিলা কর্মীকে শশধরবাবুর স্ত্রীর ভূমিকায় ঐ গৃহের ভার নিতে রাজী করান হলো। তাঁর নাম সুহাসিনী গাঙ্গুলী। সুহাসিনী দেবী বাংলার রাজনৈতিক জীবনে সুপরিচিতা। তিনি আজ ইহজগতে নেই। কিন্তু এ মহিলা ছিলেন খাঁটি বিপ্লবিনী। তাঁর ত্যাগ, সাহস, নিষ্ঠা ও সারা জীবনের দুর্জয় কর্মতপস্যা বিপ্লবী তথা মানুষের কাছে গৌরবের বস্তু।

শশধরবাবু ও সুহাসিনী দেবী পরস্পরের অজানিত। এবং, ভবিষ্যৎ জীবনেও তাঁরা বিভিন্ন কর্মপথে পরস্পর অজানাই রয়ে গেছেন। কিন্তু চন্দননগরের ঐ আশ্রয়কেন্দ্রকে ঘিরে মাসের পর মাস তাঁরা স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করে গেলেন। এ সম্ভব হলো শুধু আদর্শের প্রতি নিষ্ঠায় এবং দলের প্রতি আনুগত্যে তাদের কোন ফাঁকি ছিল না বলে। তাঁদের ভূমিকা পাড়াপ্রতিবেশীর মনে কোন সন্দেহ আসার অবকাশ দেয় নি। প্রতিবেশীরা হয়তো শুধু ভেবেছে—গৃহের দরজা-জানালা সারাক্ষণ বন্ধ থাকে কেন? কিন্তু তারা তো জানতো না যে চট্টগ্রামের দুধর্ষ বিপ্লবী গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত ঐ গৃহেই আশ্রিত!

বেশ নিরাপদেই ও-আস্তানায় তাঁরা বাস করছিলেন।...শশধর প্রায়ই কলকাতা যাতায়াত করেন। লোকে ভাবে—লোকটা কোন আপিসের কেরানী হবে, রোজ 'ডেইলি-প্যাসেঞ্জারি' করে। আমরা জানি—তাঁর যাতায়াত ছিল যুগান্তর-দলের নেতাদের কাছে নানা প্রয়োজনে।...এছাড়া সবাই ভাবতো, 'ডেইলি-প্যাসেঞ্জার' ঐ শশধরবাবুটির পর্দানসীন-স্ত্রী ঘরে বসে শাঁখাসিঁদুর পরে হয়তো হেঁসেল ঠেলছেন। কাজেই নিখুঁত এই সংসারটি নিয়ে কারো অহেতুক মাথাব্যথা ছিল না।...

*　　*　　*　　*

কিন্তু হঠাৎ ঘটে গেল এক অঘটন। ১৯৩০ সনের ২৮শে জুন। বিদ্রোহী অনন্তলাল সিংহ স্বেচ্ছায় এসে ধরা দিলেন ১৩নং ইলিসিয়াম্ রো'তে পুলিশের বড়কর্তাদের কাছে। পুলিশ বিস্মিত। দেশবাসী স্তম্ভিত। মহা উৎসবে দুরন্ত ব্যাঘ্রকে খাঁচায় পুরে বিচারের জন্য চট্টগ্রাম-জেলে পাঠান হল।...

অনন্ত সিং কেন ধরা দিলেন? তার কারণ বলবার পূর্বে তদানীন্তন আই-জি

অব. পুলিশ, মিঃ লোম্যানের কাছে লিখিত অনন্তবাবুর ইংরাজি পত্র ও তার অনুবাদ ( বাংলায় ) এখানে দেওয়া হল।

( Original Version )

'Dear Mr. Lowman,

I shall meet you on 28th June, 1930. It is sure that you will never miss that opportunity to arrest me then and there. Yes, I am also quite ready for it. Never think it, please, that I am going to Surrender. When does a person Surrender? When he becomes quite helpless and finds no other means to protect him then and then only he yeilds.

Am I helpless now? No, certainly not. I have arms to protect me, ample money to spend in time of need, many helpers to help me and good many shelters in Bengal, outside Bengal, as well as outside India to abscond.

Now I am absconding with my friends and we are quite safe. But still I am allowing my arrest and why? Do you think I am repentant for my action? No, never, not a bit sorry. Then is it a mandate on me by any authority? No. It is my personal matter and absolutely private.

I am,
Revolutionary
Ananta Lal Sinha.

( বাংলা অনুবাদ )

প্রিয় মিস্টার লোম্যান্

১৯৩০ সালের ২৮শে জুন আমি আপনাকে দেখা দিব। আমি নিশ্চয় করিয়া জানি যে তখন আমাকে গ্রেপ্তার করিবার সুযোগ আপনি হারাইবেন না। তবে ইহার জন্য আমি প্রস্তুত। জানিয়া রাখুন, ইহা আমার 'আত্মসমর্পণ' নহে। লোকে কখন আত্মসমর্পণ ( Surrender ) করে? যখন সে যথার্থই অসহায় ও আত্মরক্ষার পথ দেখিতে পায় না তখনই তাহাকে নতি স্বীকার করিতে হয়।

আমি কি সত্যই এখন সহায়হীন? নিশ্চয়ই নহে। আমার আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র আছে, প্রয়োজনে ব্যয় করিবার অর্থ আছে, সাহায্য পাইবার বন্ধু

আছে। বাংলার বাহিরে এবং ভারতে ও ভারতের বাহিরে পালাইয়া থাকিবার আশ্রয় আছে। তা'ছাড়া আমি এখনো সম্পূর্ণ নিরাপদ। তবু আমি কেন ধরা দিতেছি? আপনি মনে করিতে পারেন যে, আমি অনুতপ্ত। না, কখনো না। আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নহি। তবে কি আমার সর্বাধিনায়কের এই আদেশ? না। ইহা আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। ইহা গোপনীয়।

ভবদীয়
বিপ্লবী
অনন্তলাল সিংহ

আমরা চট্টগ্রামে ফিরে যাচ্ছি।…

'চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন'-মামলা বিশেষ আড়ম্বরে শুরু হয়েছে। বহু বিপ্লবী গ্রেপ্তার হয়েছেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের নির্যাতনের সীমা নেই। মামলার আসামী করবার পূর্বে থানায় ও হাজতে দলে দলে কিশোর, বালক ও তরুণদের নিত্য ধরে আনা হচ্ছে। তাদের হাড়গোড় ভেঙে, অপমানের চূড়ান্ত করে, পিতামাতা-আত্মীয়স্বজনকে মারধোর করে, বাড়িঘর-জিনিসপত্র লুটপাট করে পুলিশ ও ফিরিঙ্গী সম্প্রদায় চট্টগ্রামে এক নরক সৃষ্টি করে বসেছে। অত্যাচার ও প্রলোভনের খপ্পরে অনেকে পড়ে যাচ্ছে। এরা বালক ও কিশোর বয়সের ছেলে, এরা দেশপ্রেমের আবেদনে, ভাবা[illegible]েগে দলের মধ্যে ও দলের চতুষ্পার্শে এসে গেছে। এদের মনের বল সামান্য। এদের দীর্ঘদিনের শিক্ষা ও তপস্যা নেই। পুলিশ সেই সুযোগ নিয়ে এদের মধ্যে থেকেই রাজসাক্ষী তৈরি করছে, এদের মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করছে। ফলে 'অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন-মামলা' বিপ্লবীদের সম্মান এমনই ক্ষুণ্ণ করতে যাচ্ছে যে অত বড় বিদ্রোহের মূল্য কিছুমাত্র আর থাকছে না। সুতরাং অনন্ত সিং প্রমুখ পলাতক নেতারা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে বসে গভীর চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন। মাস্টারদা ও অন্যান্য বীর সহকর্মীরা অরণ্যেপর্বতে লুকিয়ে থেকে পুনঃপুনঃ বৃটিশের দম্ভে আঘাত হানছেন—সেই অপ্রতিহত অভিযান ব্যর্থ করে দেবে কি নেতৃত্বহীন বালক-বন্দীদল চট্টগ্রামের জেলে ও পুলিশের হাজতে বসে?…তা' হতে পারে না। অনন্ত সিংকে যেতেই হবে চট্টগ্রাম-জেলে বালকবন্ধুদের পাশে। তাদের টেনে আনতে হবে পুলিশের কূটচক্র থেকে।…

তাই অনন্ত সিং ঐভাবে ধরা দিলেন। চট্টগ্রাম-জেলে তাঁর উপস্থিতি

'মিরাকল্' সৃষ্টি করল। যারা পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করেছিল তারা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সেসব উক্তি এই বলে প্রত্যাহার করল যে, পুলিশের নির্মম মারের চোটে পুলিশের শেখানো কথা-ই তারা পূর্বে বলেছিল।

জেলখানা ও হাজতগুলোর আবহাওয়া বদ্‌লে গেল। মামলার চেহারা অভিনব রূপ ধারণ করল। কিশোর ও বালক আসামীরা নেতার সান্নিধ্যে হৃত বীর্য ফিরে পেল।

অনন্ত সিংহের গঠনশীল বিপ্লবীনেতৃত্বের পরিচয় নতুন করে পেয়ে দেশবাসী মুগ্ধ হলো, শত্রুর চমক ভাঙলো।...

*    *    *    *

আবার চন্দননগর।...

সে এক অশুভ রজনী। ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ সাল। চন্দননগর গোন্দলপাড়ার দ্বিতল গৃহের সবাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। 'কী-ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী।'—হতভাগিনী এই বাংলাদেশ। তাই বাঙলার বিপ্লবীদের বিনিদ্র আঁখিপাতে আজ নিথর নিদ্রার এই সমাবেশ। জীবন ঘোষাল—সবাই ঘুমুচ্ছেন। ঘুমুচ্ছেন শশধর আচার্য। ঘুমুচ্ছেন সুহাসিনী দেবী।

জীবন ঘোষাল

এদিকে কোন এক অজ্ঞাতসূত্রে খবর পেয়ে কলকাতা থেকে দলবল নিয়ে ছুটে এসেছেন পুলিশ কমিশনার টেগার্ট, ডেপুটি কমিশনার বার্টলি ও ম্যাকেন্‌টি। আরো এসেছেন ছোটবড় বহু কর্মচারী। এসেছে বিরাট ফৌজ। তস্করের মত ঢুকেছে পুলিশ ও সান্ত্রীদল ফরাসীরাজ্যে—চন্দননগরে। অনুমতি নেয় নি পর্যন্ত ফরাসী-সরকারের কাছ থেকে তাঁদের রাজ্যে প্রবেশ করার। সময় কই? ..পরে অবশ্য ইংরেজ-ফরাসীতে এ নিয়ে ঢের বোঝাপড়া হয়েছিল।...

গোন্দলপাড়ার বাড়ি ঘেরাও করে টেগার্ট প্রমুখ বড়কর্তারা চোরের মত

ঢুকলেন গৃহপ্রাঙ্গণে। তারপর? তারপর ভারী বুটের শব্দে জেগে গেলেন বিদ্রোহীরা। পেছনের দেয়াল টপ্‌কে লাফিয়ে পড়লেন সবাই পাশের পুকুর-পাড়ে। গর্জে উঠল বিপ্লবীর পিস্তল। কিছুক্ষণ চলল লড়াই। কিন্তু ঘেরাও-হয়ে-যাওয়া চারটি তরুণ কতক্ষণ লড়বেন বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে? বন্দী হলেন সবাই। জীবন ঘোষাল পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। তাঁর নিষ্প্রাণ আহত দেহ পুকুর থেকে তোলা হলো। বন্দী বীরত্রয়ী শৃঙ্খলঝন্‌ঝনায় চট্টগ্রাম জেলের পথে পা বাড়ালেন।...

## তারিণী মুখার্জীর শেষ রজনী

চট্টগ্রামে শ্বেত-বীরপুঙ্গবেরা বিপ্লবীদের কাছে ধাক্কা খেয়ে নিরস্ত্র ও নিরীহ জনসাধাবণ এবং স্কুল-কলেজের বালকদের উপর যে অত্যাচার চালিয়েছিল তার সীমা নেই। এই তৎকালে অত্যাচারের প্রতীক রূপে পুলিশকর্তা মিঃ ক্রেগ্‌কে ধরে নেওয়া স্বাভাবিক ছিল।...

নেতা সূর্য সেন খবর পাঠিয়েছেন যে ১লা ডিসেম্বর (১৯৩০) মিঃ ক্রেগ্‌ চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা হয়ে চাঁদপুরের পথে কলকাতা যাচ্ছেন।...

পয়লা ডিসেম্বর চট্টগ্রাম-মেল্‌ চাঁদপুর স্টেশনে দৈত্যের বেগে এসে ঢুকলো। দু'টি কিশোর পূর্ব থেকেই সাধারণভাবে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছিলেন। গাড়ি ঢুকতেই তাঁরা প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলো পরপর খুঁজতে গিয়ে দেখলেন একটি কামরায় বসে আছেন উচ্চপদস্থ এক অফিসার—অস্পষ্ট আলোয় তাঁদের মনে হলো ও-ব্যক্তি খাঁটি ইংবেজ, নিশ্চয় মিঃ ক্রেগ্‌।...আর বিলম্ব নয়। কিশোরদ্বয় বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন সাহেবের উপর। রিভলভারের অব্যর্থ গুলী ব্যর্থ হবার নয়। অফিসাবটিব তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হলো।...

চতুর্দিকে হৈ হৈ শুরু হয়ে গেছে। মুহূর্তে সারা চাঁদপুর শহর আর্ত কলরবে মুখর। পুলিশ ও রেল্‌-কর্তৃপক্ষ ছুটে এল। কিন্তু সনাক্ত করল তারা—এ যে রেলেরই পদস্থ কর্মচারী সুদর্শন তারিণী মুখার্জী। বুলেটের আঘাতে মৃত! দেহ তাঁর রক্ত-ধূলায় লুণ্ঠিত!...

এদিকে আততায়ীর খোঁজ নেই। পুলিশ হন্যের মত ছুটোছুটি শুরু করল। মোটরে ও পায়ে-হেঁটে সশস্ত্র পুলিশ সারা চাঁদপুর শহর ও শহব থেকে গাঁয়ে যাবার পথগুলো চষে ফেলায় কাজে ব্যস্ত হল।...

কাঁচা রাস্তা। রাস্তার দু'দিকে ঝোপঝাড়। তার পর খোলা মাঠ। মাঠের ওপারে অজানা গ্রাম। রাত্রির ঘনান্ধকার বন্ধুর মত তাঁদের জড়িয়ে আছে। হোক না পথ অজানা, হোক গ্রামগুলো না-দেখা—ভয় কি? যারা দূরকে করেছে নিকট বন্ধু পরকে করেছে ভাই, তাদের কাছে সবাই তো আপন? নির্ভয়ে তাই পায়ে হেঁটে চলেছন রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তী। তাঁদের কিছুমাত্র উত্তেজনা নেই। কোন্ যাদুমন্ত্রে যেন এই বিপ্লবশিশুরা 'নার্ভ কন্ট্রোল' করার বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে গেছেন।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস

সহসা বিদ্রোহীরা দেখলেন যে, সন্ধানী-আলো ছড়িয়ে কয়েকটি মোটর ছুটে আসছে। হর্ন বেজে যাচ্ছে অনবরত। বিপুল রণসম্ভার। সম্মুখে খোলা মাঠ—সংগোপনে চলার পথ নেই। যে-পথে তাঁরা চলছেন তার দু'পাশের জঙ্গলও ঘন নয়। তবু সেই ঝোপঝাড়ের আড়ালেই তারা গা ঢাকা দিলেন। বৃথা সে আত্মগোপন। পুলিশের সন্ধানী-আলোয় আলোকিত ভুবন। ধরা পড়লেন যুগল কিশোর।

*  *  *  *

রামকৃষ্ণ চট্টগ্রাম কলেজের বৃত্তিভোগী নামকরা ছাত্র। বীরত্বে, দেশপ্রেমে, সাংগঠনিক কার্যে আদর্শ বিপ্লবী তরুণ। বোমা প্রস্তুতকালে গুরুতর রকম আহত হওয়ায় 'অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনে' অথবা 'জালালাবাদ-যুদ্ধে' তাঁকে আমরা দেখি নি। দৈহিক অসুস্থতা থেকেও মানসিক বেদনা এতে তাঁর বেশি ছিল। আজ সার্থকতার পথে রামকৃষ্ণের যাত্রা। ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে রামকৃষ্ণ দীনেশ গুপ্তের পাশের সেলেই স্থান পেয়েছিলেন। দুটি সর্বত্যাগী সাধকের মধ্যে অভূতপূর্ব বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল ঐ ফাঁসির সেলেরই আবহাওয়ায়। দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির পূর্বদিন আবৃত্তি করছেন রামকৃষ্ণ রোদনভরা গাম্ভীর্যে:

'যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা।'
জানি হে, জানি তাও হয় নি হারা'...

সরস মাধুর্যে দীনেশ উত্তর দিচ্ছেন তাপসের কণ্ঠে:

'যাবার দিনে এই কথাটি
বলে যেন যাই—
যা দেখেছি, যা পেয়েছি,
তুলনা তার নাই।'...

রামকৃষ্ণের সঙ্গী বিপ্লবী কালীপদ চক্রবর্তীও সে-রাতে একই সাথে ধরা যে পড়েছিলেন তা বলেছি। বয়স তাঁর খুবই অল্প থাকায় ফাঁসি তাঁকে দেওয়া হল না। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা দিয়ে কালীপদকে কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দেওয়া হল।

রামকৃষ্ণ ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করলেন ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে, দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির কয়েকদিন পরে।...

## আসানুল্লা নিধন

চট্টগ্রামের শহর ও গ্রামাঞ্চলের প্রত্যেক ইঞ্চি জমি পুলিশ ও পল্টনের পদভারে নিয়ত পিষ্ট হচ্ছে। মানুষকে ভীত ও মনুষ্যত্বহীন করে তোলার টেকনিক্ পৃথিবীর সকল সাম্রাজ্যবাদী শাসকদেরই সুন্দর জানা আছে। বৃটিশের দেশী-বিলাতী কর্মচারীরা এ-বিদ্যায় সবার উপরে। ভীত, সন্ত্রস্ত চট্টগ্রামবাসী নিজ গৃহে পরবাসী। তারা তাদেরই পথেঘাটে বুকে ভর দিয়ে হাঁটে। শিরদাঁড়া উঁচু করে চলবার মানসিক শক্তি তাদের লুপ্ত হতে যাচ্ছে।...

এদিকে মাস্টারদা ও নির্মল সেন বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছেন সংগঠনের কার্যে। 'ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি'র কাজ এত ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও ব্যাহত হচ্ছে না।

দেশী অফিসারদের মধ্যে আসানুল্লা সাহেব বড়ই বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছেন। ছাত্র, বালক ও নিরীহ জনসাধারণের উপর অনাচার নানা নৃশংসতায় চালিয়ে যেতে তিনি দক্ষ। ইংরেজের আদর যতই তাঁর ভাগ্যে জুটছে, দেশের লোকের উপর বর্বর অত্যাচারের মাত্রা ততই তিনি বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

বিদ্রোহী তরুণদল আর তাঁকে ক্ষমা করতে পারেন না, কারণ তিনি ক্রমশ হয়ে উঠছেন বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের স্থূল প্রতীক।...

তিরিশে আগস্ট, ১৯৩১ সাল। চট্টগ্রাম শহরের প্রধান খেলার মাঠে অসম্ভব ভিড। খেলায় বিজয়ী দলকে পুবস্কার দেওয়া হবে। বিরাট মঞ্চে উপবিষ্ট জেলাশাসকেরা সকলেই। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, জজ সাহেব, পুলিশ সাহেব—ত্রিমূর্তি তিনটি উচ্চ আসনে বিরাজ করছেন। সম্মুখে একান্ত বশম্বদ আসানুল্লা। তিনি অবশ্য গোয়েন্দা বিভাগের দক্ষ কর্মচারীরূপে পুরস্কৃত হয়ে 'খাঁ বাহাদুর' বনে গেছেন। খেলোয়াডদের পুবস্কার দেওয়া হল। সভার কাজ সমাপ্ত হতেই 'হিপ্‌ হিপ্‌ হুররে' ধ্বনিতে দশ দিক কেঁপে উঠলো। সাহেবরা সভাপ্রাঙ্গণ পেরিয়ে মোটরে উঠছেন বা উঠবেন। আসানুল্লা গেট অতিক্রম কবে দু'চারজন অপেক্ষ্যমাণ ব্যক্তির সঙ্গে সবেমাত্র কথা বলা শুরু করেছেন। তাঁর সশস্ত্র দেহবক্ষীরা বুক টান করে চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় একটি সুদর্শন চৌদ্দ-পনেব বছরের কিশোর এসে পাশে দাঁড়ালেন। দেবশিশুর মত সরল ও সুন্দব মুখখানা তাঁর। তাঁকে কাবো সন্দেহ হতে পারে না।...কিন্তু? কিন্তু এই বালকবীরই ধনুকে টঙ্কার দিয়ে বিশ্বের ভারসাম্য বিঘ্নিত করতে চাইলেন।...সহসা সুকুমার শিশুব হাতে খেলার রজ্জু যেন বিষধর ফণিনীব মত ফণা উদ্যত করল। গোপন রিভলভাব ফুঁসে উঠে বজ্রগম্ভীর নাদে বাজাল মৃত্যুডঙ্কা। পর পব চাবটি গুলীব আঘাতে দর্পী আসানুল্লা ধূলায় গডিয়ে পডলেন রুধিরস্নাত হয়ে।...

তারপরের ইতিহাস সাধাবণ। অসংখ্য পুলিস ও পল্টন সহ সরকারের বড় বড কর্তাদের নাকের ডগা ঘেঁসে যে শিশু ঐ আসানুল্লাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারলেন সবাব অলক্ষ্যে, তাঁকে কর্ম সমাপ্ত হলে সবাই মিলে পাকডাও করা এক মামুলি ব্যাপার।

হরিপদ ভট্টাচার্য গ্রেপ্তার হলেন তন্মুহূর্তে। চরম নির্যাতন চলল তাঁব উপব। সে নিযাতনের কাহিনী আমরা 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগাব লুণ্ঠন' নামক পুস্তক থেকে তুলে দিচ্ছি। কারণ অত্যাচাবের এ একটি Typical উদাহবণ।—সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ 'ভিলেন্‌'-এব পাশে কিশোর বিপ্লবীব তপস্যাদৃপ্ত-রূপ চমৎকাব ফুটে উঠেছে! বঙ্গীয় তথা ভাবতীয় বিপ্লবেব ইতিহাসে হরিপদ একা নন। তাঁব সগোত্র যুবক-যুবতীর সংখ্যা বিপ্লবীদেব মধ্যে যথেষ্ট।...

উল্লিখিত পুস্তকে আছে: "হবিপদ ভট্টাচাযেব প্রত্যেকটি নখের ভিতর দিয়া সুঁচ ফুটাইয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা হইল। তাঁহার কাছে সূয সেন, নির্মল সেন প্রমুখেব বর্তমান ঠিকানা ও তাঁহাদের ভাবী কর্মকাণ্ডের

সংবাদ পাইবার অদম্য আগ্রহের মধ্যেই পুলিশের পক্ষ হইতে তাঁহার উপর নির্যাতন হইয়া উঠিল অমানুষিক ও সীমাহীন। 'সুঁচ'-পর্ব শেষ করিয়া এইবার বৈদ্যুতিক ব্যাট্যারির আশ্রয় গ্রহণ করা হইল। দিনের পর দিন রকমারী অত্যাচারের জলন্ত কটাহে কিশোর বালক হরিপদ দুঃসহ যাতনা সহিয়াছেন। কিন্তু মুখ ফুটিয়া একটি কথা কহেন নাই। দরিদ্র-ঘরের সন্তান, টোলের ছাত্র, অপরিণত বয়স্ক বালক হবিপদ কি অতুলনীয় আত্মিক-শক্তিবলে নিপীড়নের চরম পরীক্ষার মধ্যেও নিজের আদর্শকে অম্লান রাখিলেন! স্মরণকালের ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল।…হরিপদের নিযাতন এইখানেই শেষ হইল না। চট্টলার তরুণ ও ছাত্র-সমাজের রাজনৈতিক চেতনাকে সুতীব্র আঘাতে নিশ্চিহ্ন করিবার সরকারী পরিকল্পনা এই হরিপদকে পুরোভাগে রাখিয়াই কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা চলিল। চারি শতাধিক পুলিশ ও মিলিটারির এক বাহিনী হরিপদকে সম্মুখে রাখিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে টহল দিয়া বেড়াইতে লাগিল। হাঁটে-ঘাটে ঢেঁট্‌রা পিটাইয়া ভিড় জমাইয়া সবার কাছে হরিপদকে বেদম প্রহার করা হইত। পুলিশের লোক তাঁহাকে আদেশ করিত ধ্বনি দিতে—'ইংরাজের জয় হউক, সূর্য সেনের দলের ক্ষয় হউক।' হরিপদ দৃপ্ত কণ্ঠে তাহার বিপরীত ধ্বনি দিয়া বলিতেন—'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক! ইনক্লাব জিন্দাবাদ! মাস্টারদার জয় হউক!'…ধ্বনি ও প্রহার সঙ্গে সঙ্গে চলিত। এই জয়ধ্বনি দিবার সময় একদিন পুলিশের সঙ্গীনের খোঁচায় হরিপদর চোখের কোণ বাহিয়া প্রচুর রক্ত পড়ে। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হরিপদর চোখমুখ অস্বাভাবিকরূপে ফুলিয়া যায়। এইভাবে হরিপদকে সম্মুখে রাখিয়া বর্বরোচিত পীড়নের ইতিহাস রচিত করিয়া চলিল গ্রাম-গ্রামান্তরের পথে পথে বৃটিশের পুলিশ ও পল্টন।'…

কিন্তু হরিপদ ভট্টাচার্য অটল। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, কর্মতাপস এই কিশোর 'মৃত্যুর অন্তরে তখন অমৃতের সন্ধান' পেয়েছেন। তাঁর কাছে তুচ্ছ এই নির্যাতন। তুচ্ছ সর্ব ভয়। দুঃখ কিছু নয়—

"কোথা মিথ্যা রাজা,
　　কোথা রাজদণ্ড তার।
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের
　　কোথা অত্যাচার!"…

হরিপদ ভট্টাচার্যের যথারীতি বিচার হল। বিচারে ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হল। কারণ, বয়স তাঁর অল্প।…

## আক্রান্ত ডুর্নো

১৯৩১ সনের ২৮শে অক্টোবর। ঢাকা নবাবপুর রোডের পাশে একটি বিলাতী মদের দোকান। দোকানের সম্মুখে মোটর রেখে ঢাকার জেলা-হাকিম মিঃ ডুর্নো ঐ দোকানেই ঢুকেছেন। এখানে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের সাহেব-সুবারা সবদা আসেন মদ কেনবার জন্যে। ভাল বিলাতী মদ অন্যত্র পাওয়া যায় না।…

উল্টো দিকে বিনোদ হালুই-এর নাম-করা ঢাকাই-মিষ্টির দোকান। সেখানে খাবার খাচ্ছেন দু'টি যুবক। যুবকদের দৃষ্টি খাবারের দিকে নয়। তাঁরা বারে বারে তাকাচ্ছেন মদের দোকানের দিকেই।…ডুর্নো সাহেব মদের দোকানে ঢুকতেই যুবক দু'টি সন্তর্পণে বেরিয়ে এলেন।…একটু পরেই মালপত্র কিনে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে ডুর্নো মোটরে উঠতে যাচ্ছেন, এমন সময় সহসা বিপ্লবীর রিভলভার গর্জে উঠল। দিনেদুপুরে জনবহুল রাস্তায় এ ঘটনা ঘটতেই সারা শহরে হুলুস্থুল পড়ে গেল। পুলিশ ও মিলিটারি মুহূর্তে ঘটনাস্থলে এসে শুরু করে দিল তাণ্ডবনৃত্য। কিন্তু এই নাটকের নায়কদ্বয়—চট্টগ্রামের সরোজ গুহ এবং যুগান্তরের নোয়াখালিবাসী রমেন ভৌমিক ইত্যবসরে অদৃশ্য হয়ে গেছেন!… ডুর্নোসাহেব আহত হলেন। আহত ডুর্নো আর এদেশে রইলেন না। তাকে বিলেত পাঠিয়ে দেওয়া হল।…

পুলিশ জানলো না যে, সরোজ গুহ ও রমেন ভৌমিক একাজ করেছেন। কিন্তু তালাসী ও ধরপাকড় তাদের করতেই হবে। বহু তরুণকে পুলিশ-হাজতে নিয়ে আসা হল। মারপিট সমানে চলল। যুগান্তরের কর্মী ইন্দু বসুর গৃহেই ছিল পলাতকদের আড্ডা। জালালাবাদ-যুদ্ধের পরই বিনোদ চৌধুরী ও সরোজ গুহ এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন ইন্দুবাবুদের নির্দেশিত আস্তানায়। যুগান্তরের সক্রিয় সহযোগিতায় চট্টগ্রামের পলাতক বিপ্লবী বিনোদ চৌধুরী, সরোজ গুহ ও যুগান্তরেরই রমেন ভৌমিককে নিয়ে এসব ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত। ইন্দুবাবুদের কর্ম প্রসঙ্গে 'বিভি'-র কর্মী ও বন্ধু তাঁতিবাজারের দেবেন্দ্রলাল বসাকের সাহায্যদান ছিল এক দুর্লভ বস্তু। দেবেনবাবুর নিষ্ঠা, কর্তব্যবোধ ও মন্ত্রগুপ্তির ধারণা ছিল

অসাধারণ। তাঁকে কেউ বুঝতো না। ভস্মাচ্ছাদিত স্থির প্রস্তরখণ্ডের নীচে যে আগুন চাপা আছে তা লোকে জানবে কি করে ?…

## এলিসনের মৃত্যুদণ্ড

পূর্বেই বলেছি যে, সূর্য সেন ও নির্মল সেন চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে পালিয়ে থেকে চট্টগ্রামেই ইংরেজকে পুনঃ পুনঃ আঘাত হানা স্থির করলেও তাঁরা লোকনাথ বলকে পাঠিয়ে দিলেন গনেশ ঘোষদের সঙ্গে মিলিত হয়ে অপর বিপ্লবীদলগুলোর সহযোগে কিছু করার জন্যে। ঠিক একই নীতি অনুসারে বিনোদ চৌধুরী ও সরোজ গুহ পালিয়ে চলে যান জালালাবাদ-যুদ্ধের পরই ঢাকা শহরে এবং বিনোদ দত্ত চলে আসেন শহর কুমিল্লায়।

কুমিল্লায় বিনোদ দত্তদের সংগঠন-কার্য পূর্ব থেকেই কিছুটা চলছিল স্থানীয় কলেজের দু-একটি ছাত্রের মাধ্যমে।…বিনোদ দত্ত দেখলেন যে, শহরের ছোটবড় সকলেই আতঙ্কে অস্থির। পুলিশের অত্যাচারে সকলেই জর্জরিত। অথচ তরুণদের প্রাণ চঞ্চল। তাদের নয়নকোণে বিদ্রোহ-বহ্নি। ওষ্ঠে প্রত্যয়লিখা।…

'পুলিশের অত্যাচার' কথাটি বলতেই তরুণদের মনে পড়ে একটি মূর্তি। এলিসন সাহেবের মূর্তি। মিঃ এলিসন হলেন সহকারী পুলিশ-সুপার। বৃটিশ-দম্ভের কুখ্যাত প্রতীক।

বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ হলো।…বিনোদ দত্ত সেই পরামর্শসভায় স্থির করলেন যে, এলিসনকে গ্রহণ করতে হবে বিপ্লবীদের দেওয়া মৃত্যুদণ্ড।…

* * * *

এলিসনের গতিবিধি বিপ্লবীরা লক্ষ্য করে যাচ্ছেন। সুযোগ এল একদিন। কোন একটি পথে সাহেবটি সাইকেলে নিয়মিত যাতায়াত করেন।…একদিন যথাসময়ে সেই পথে অপেক্ষা করছেন একটি সশস্ত্র তরুণ। সাইকেলে আসছেন মিঃ এলিসন। রিভলভারের নিশানায় আসতেই অব্যর্থ গুলীর আঘাতে ধরাশায়ী হলেন তিনি। দম্ভের ফানুস চুপসে গেছে। এলিসন নিহত।…

কুমিল্লা শহরের টনক নড়ে গেছে। পুলিশের তৎপরতার সীমা নেই। কিন্তু আততায়ী কে বা কা'রা তা অজ্ঞাতই রয়ে গেল!…

* * * *

১৯৩২ সনের ১৯শে জুলাই কুমিল্লার রাজপথে পুলিশ-সুপার মিঃ এলিসনকে মৃত্যুর অমোঘ আঘাতে দণ্ডিত করেছিলেন বিপ্লবী শৈলেশ রায়। কাজ হাসিল করেই শৈলেশ রায় কুমিল্লা রেল-স্টেশানে এসে চট্টগ্রাম-অভিমুখী ট্রেনখানায় চেপে বসলেন। 'জেরারগঞ্জ' স্টেশানে পৌঁছে গ্রামের পথ ধরলেন তিনি। বহুকাল পুলিস তো দূরের কথা, তাঁর দলের লোকও অনেকেই জানলো না যে—কে এ-কাজ করলো 'বা কোথায় সে কর্মী উধাও হলো।

## ধলঘাটের যুদ্ধ

'হলদিঘাটে'র সঙ্গে 'ধলঘাটের ধ্বনিগত ও ছন্দোগত মিল আছে। কিন্তু খুঁজে দেখলে আরো মিল পাওয়া যাবে। উভয় স্থানের যুদ্ধ চেহারায় ও ব্যাপ্তিতে আলাদা। হলদিঘাটে যুদ্ধ করেছেন স্বাধীন রাণা প্রতাপ সিংহ স্বাধীন মেবারের গৌরবরক্ষার সংকল্পে। ধলঘাটে যুদ্ধ করেছেন পরাধীন দেশের বিদ্রোহী সূর্য সেন স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবার ঔদ্ধত্যে। হলদিঘাট রাজপুত-বিক্রমের বিস্তৃত বিকাশ। ধলঘাট বাঙ্গালী বিদ্রোহশৌযের দুঃসহ অভিব্যক্তি।...কিন্তু প্রতাপ ও তাঁর সহযাত্রীদের মধ্যে যে দেশপ্রেম, নিষ্ঠা, বীয ও প্রত্যয় ইতিহাসপ্রখ্যাত হয়ে আছে,—সে দেশপ্রেম-নিষ্ঠা-বীর্য ও প্রত্যয়ই সূর্য সেন ও তাঁর সতীর্থবৃন্দের মধ্যে বিরাজিত। কাজেই আদর্শে ও আত্মদানে উভয় যুদ্ধস্থলে ছন্দোমিল অপূর্ব।...

ধলঘাটের আস্তানাটি ভালই জুটেছিল। এখানে আছেন সূর্যবাবু, নির্মলবাবু এবং অপূর্ব সেন। ইহা 'ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি'-র বর্তমান গোপন হেড্‌কোয়ার্টার। কর্মীরা নির্দিষ্ট সময়ে সঙ্গোপনে এখানে যাতায়াত করেন। এই দুর্দিনে সমস্ত চট্টগ্রামের বিপ্লবী-সংস্থাটি পরিচালিত হচ্ছে এ আশ্রয়কেন্দ্র থেকে, ক্রিয়াকর্মের নির্দেশ যাচ্ছে এখান থেকেই। মাস্টারদা ও নির্মল সেন যেখানে—দলের প্রাণ, মস্তিষ্ক ও ওজঃশক্তি সেখানে।...

বেশ কিছুকাল যাবৎ পলাতকেরা নিরাপদে এ আস্তানায় বাস করছিলেন। গৃহকর্ত্রীর নাম সাবিত্রী দেবী। বর্ষীয়সী বিধবা মহিলা। তাঁর সংসারে আছেন কন্যা স্নেহলতা এবং পুত্র রামকৃষ্ণ। মাটির দোতলা গৃহ। দোতলায় থাকেন পলাতকেরা। একতলায় থাকেন বাড়ির লোক। মহিলা-বিপ্লবীরা এলে সাবিত্রী দেবীর কাছেই থাকতে পারেন। অসুবিধা কিছু নেই এ আস্তানায়।...সম্প্রতি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বেথুন কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা ছেড়ে

ধলঘাটের আশ্রয়কেন্দ্রে এসেছেন নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার নির্দেশ পেয়ে।...

সেদিন ১৩ই জুন, ১৯৩২ সন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। রাত ক্রমে গাঢ় আঁধারে ডুব দিচ্ছে।...অপূর্ব সেনের জ্বর। কিন্তু সারাদিন এই মানুষটি হৈ-হল্লা করে কাটিয়েছেন। কী জীবন্ত ছেলে!...অপূর্বের জন্যে বার্লি জ্বাল দিতে হবে। প্রীতিলতা তাই নীচে গিয়েছেন। বার্লি তৈরি হয়েছে। পরমানন্দে অপূর্ব তা খাবেন। মাস্টারদাকে খাবার দেওয়া হতেই প্রীতিলতা সবেমাত্র উপরে উঠে এসেছেন 'নির্মলদা'কে আহারের জন্যে ডেকে নিতে। এমন সময় তড়িৎবেগে মাস্টারদা নীচে থেকে উপরে উঠে এসে বললেন: 'পুলিশ!'...

চকিতে নির্মল সেন, অপূর্ব সেন ও মাস্টারদা কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। প্রীতিলতা সঙ্গ ছাড়তে নারাজ। কিন্তু মাস্টারদার আদেশে তাঁকে নীচে গৃহকর্ত্রীর কাছে চলে যেতে হল। প্রাণ দেবার সুযোগ চলে গেল! ক্ষুব্ধ তাঁর মন। কিন্তু নেতার আদেশ যে অলঙ্ঘ্য!...

দোতলায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনটি বিদ্রোহী মৃত্যুদূতের মত। বীর্যের সাধনায় তাঁরা সিদ্ধ, দেশপ্রেমের তপস্যায় তাঁরা সার্থক।....

পুলিশ কি করে যেন টের পেয়েছে যে সূর্য সেন এ-আস্তনায়ই আছেন। তাই মহা সমারোহে একদল সিপাহীর পুরোভাগে ক্যাপটেন ক্যামারন এলেন ছুটে। আস্তানাটি ঘেরাও করা হলো। পল্টনের সাহেব বিপ্লবীদের নাড়ীনক্ষত্র স্বভাবতই জানেন না। তাই মিঃ ক্যামারন গৃহপ্রাঙ্গণে ঢুকেই বীরদর্পে খোলা রিভলভার হস্তে মই বেয়ে দোতলায় উঠছিলেন। মুহূর্তে গর্জে উঠল নির্মল সেনের আগ্নেয়াস্ত্র। বীরবর ক্যামারন ধূলায় গড়িয়ে পড়লেন।...উভয়পক্ষে চলেছে অবিরাম গুলীবর্ষণ। বন্যাধৌত ধলঘাটের মেঘলিপ্ত নৈশ-গগন দীর্ণ করে অজস্র বুলেটের ধ্বনি কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের চূড়া ও বনের সীমা অতিক্রম করে দূর থেকে দূরান্তে।...

সহসা নীচে থেকে শোনা গেল নির্মল সেনের আর্তনাদ। আহত অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে গেছেন মহান্ বিপ্লবী!...মাস্টারদা ও অপূর্ব সেন নীচে নেমে এলেন। প্রীতিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা পেছনের জঙ্গলাপথে অজ্ঞাত ভাগ্যের ইসারায় রওনা হলেন। পথ চলতে শুকনো পাতা তাঁদের পায়ের চাপে নৈঃশব্দ্য ভেঙে দিল। পুলিশবাহিনী সহসা সতর্ক হয়ে অন্ধকারে ইতস্তত

ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী চালাতে লাগল। অপূর্ব সেনের বুকে একটি গুলী বিঁধে গেল। সোনার কিশোর অম্লান সৌন্দর্যে ধূলিশয্যায় ঘুমিয়ে পড়লেন। যে বালক কিছুক্ষণ পূর্বেও দেহে জ্বর নিয়েই হাস্যেকৌতুকে পলাতকদের আবাসস্থল মুখর করে রেখেছিলেন—তাঁর অস্ত্র 'গোপন ছিল কোন্ তূণে'? 'তাঁর তরুণ হাসির আড়ালে' ঢাকা ছিল 'কোন আগুন'?…

মাস্টারদা প্রীতিলতার হাত ধরে কি করে যে শত্রুবেষ্টিত ঐ গৃহ ত্যাগ করে ঐ দুর্গম জলে-ডোবা পিচ্ছিল পথের অন্ধকারে পালিয়ে যেতে পারলেন সে এক বিস্ময়!…

পরদিন সূর্যোদয়ের সাথে পুলিশবাহিনী ও নবাগত জিলাকর্তারা দেখলেন যে দু'টি বিপ্লবী চিরনিদ্রা গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের পাশে মৃত্যুনিদ্রালুণ্ঠিত ক্যাপ্টেন ক্যামারন। বীরের মৃত্যু তিনজনের ভাগ্যেই জুটেছে। কাজেই একই ভূমিতলে তিনজনেরই শয্যা। এখানে জাতিবর্ণ ও ধর্মের ব্যবধান নেই। শাসক ও শাসিতের রক্তধারা একই পথে প্রবাহিত, সে রক্তের রঙ্ অভিন্ন।…পুলিশ নির্মল সেনকে চিনতে পারল। স্বনামধন্য নেতা নির্মল সেনের খোঁজ তারা নিয়ত করছে। আজ ধরা পড়লেও তাঁকে ধরে বাখা গেল না!·কিন্তু সূর্য সেন কোথায়? বিপ্লবীদের 'জাদুকর' এই ক্ষীণদেহী মানুষটিকে হাতের মুঠোয় এনে-ও আনা যায় না! বারে বারে ফস্কে যায়।…

ক্যামারনের মৃত্যু সরকারকে নতুন করে ক্ষিপ্ত করে তুলল। তার জের সামলাতে চট্টগ্রামবাসী হিমসিম খেয়ে গেল। কিন্তু দেশবাসীর মন তাতে টলল না। দুরন্ত সন্তানদের তাই চট্টলার বুকে আশ্রয়হারা হতে হয় নি। গত দু' বৎসর ধরে লোকে তাঁদের আশ্রয় দিয়েছে, অর্থ দিয়েছে, স্নেহ ও শ্রদ্ধাসিক্ত অপূর্ব সাহায্য দিয়েছে। কোথাও কার্পণ্য দেখি নি।…

## বাঙলার বিদ্রোহিণী

"ঘরছাড়া দিক্‌হারা
অলক্ষ্মী তোমার বরদাত্রী!"

এতকাল লক্ষ্মীছাড়ার পথ খোলা ছিল বাঙলার তরুণদের সম্মুখে। কিন্তু ১৯৩০ সাল থেকে ভাইদের পাশে সমারাঙ্গনে এসে দাঁড়ালেন বাঙলার বোনেরাও বিদ্রোহিণীর ভূমিকায় 'অলক্ষ্মী'-র বরাভয় নিয়ে।….তাঁরা সংকল্পে স্থির। তাঁরা

সরাসরি স্বাধীনতাযুদ্ধে নামবেন। তাঁরা আর পূর্বসূরী দু'কড়িবালা দেবী বা ননীবালা দেবীর মত পরোক্ষ সাহায্য দান করেই তুষ্ট থাকবেন না। দেশ তাঁদের-ও। তাঁরা-ও পুরুষদের সমান শরিক হবেন না কেন সশস্ত্র যুদ্ধে? তাঁদের কণ্ঠে:

"কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্গাপাশে?'...

মহাত্মা গান্ধী তার অহিংস-আন্দোলনে নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে সঙ্গী হবার আহ্বান জানিয়েছেন। সে আহ্বানে ১৯২১ সন থেকে এই ভারত-বর্ষের নারী পর্দা ছিঁড়ে, আগল ভেঙে কাতারে কাতারে এসে যোগ দিয়েছেন আইন-অমান্য যুদ্ধে। তাঁরা কারাবরণ করেছেন, লাঠিপেটা হয়েছেন, ভাগাভাগি করে পুরুষের সঙ্গে সমান দুঃখ বরণ করেছেন। বহু ক্ষেত্রে নিষ্ঠায় তাঁরা পুরুষকেও হার মানিয়েছেন। তাই বিপ্লবের পথে তাঁরা শুধু অন্তরাল থেকে সাহায্য করেই ক্ষান্ত হবেন কেন? 'দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে' তাঁরা ব্রতী হবেন না কেন? তাঁরা সংকল্প করেছেন:

"রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব,
চাই না শান্তি সান্ত্বনা নাহি চাব।"...

* * * *

১৯২৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশন ভুলবার নয়। সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' বা কংগ্রেস স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী বাংলার নারীকে যে-আহ্বান জানিয়েছিল তা' তাঁদের মর্মে প্রবেশ করেছিল। পর্দামুক্ত-নারী সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ করার ছন্দে সহসা নিজের সংগ্রামীসত্তাকে আবিষ্কার করে ফেললেন। তারপর এল বিপ্লবের ডাক। মাসিক 'বেণু' ও সাপ্তাহিক 'স্বাধীনতা' কাগজ দু'টি বিপ্লবীদের মুখপত্র। সেইসব পত্রের অগ্নি-অক্ষরে বারে বারে তাঁরা নির্দেশ পেয়েছেন বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ার। 'চলার পথে' নামক বাজেয়াপ্ত পুস্তকখানা ছেলেমেয়েরা লুকিয়ে লুকিয়ে বারেবারে পড়তো। তার ছোট গল্পগুলো নারীকে স্বহস্তে সশস্ত্র-বিদ্রোহে নেতৃত্ব নেবার ও বৈপ্লবিককর্মে আত্মদান করার প্রেরণা দিত, সন্ধান জোগাত। 'বেণু', 'স্বাধীনতা' এবং বিশেষ করে 'চলার পথে' সেই যুগে বাঙলার তরুণতরুণীর রক্তে ধরিয়েছিল 'সর্বনাশের নেশা'। তাঁদের স্বপ্নে ছিল বন্ধন-মোচনের কামনা। তাঁরা বুঝেছিলেন:

"পুরানো সঞ্চয় নিয়ে
ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবে না।"...

আইন অমান্য করতে শিখে গেছেন মেয়েরা। এবার হাতে অস্ত্র তুলে নেবার সময় এসেছে। তাই দেখি পুরুষের মতোই সর্বসামর্থ্যে কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেনসকে হত্যা করলেন দু'টি বালিকা—শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী! অদ্ভুত সাহসে ও নৈপুণ্যে সৃষ্টিবিনাশিনীর ভয়ঙ্করতায় কাজ হাসিল করে তাঁরা প্রমাণ করলেন—'আপন ভাগ্য জয় করিবার' অধিকার তাঁদের অনস্বীকার্য।...এর পর দেখলাম বৃটিশসাম্রাজ্যের প্রতীক বাংলার লাট স্টান্‌লি জ্যাকসন্‌কে উড়িয়ে দেবার সংকল্পে এক বিপ্লবিনীর মূর্তি! বীণা দাসের হস্তে সেদিন শৌর্যশালিনী প্রমীলার আয়ুধ যেন ঝল্‌মল করে উঠেছিল।···তার পর ক্রমে দেখা গেল এই বাঙলারই মেয়েরা পর পর এগিয়ে যাচ্ছেন সশস্ত্র সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে। 'চলার পথে'-র স্বপ্ন তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে রূপায়িত করে গেলেন ১৯৩০-১৯৩৪ সালের বাঙলায়। তাঁদের নয়নভোলানো রুদ্র রূপশিখা সেদিন বাঙালীকে প্রাণ দিয়েছিল, ভারতবাসীকে ভরসা দিয়েছিল।···

* * * *

১৯৩১ সালের মাঝামাঝি কালে এক আঁধারঘন গভীর রাত। কাননগোপাড়ার দূরে মাঠ। মাঠের দূরে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি কুটির। ধানের ক্ষেত পাহারা দেবার জন্যে ইতস্তত-ছড়ানো এই ঘরগুলো চাষীরা তুলেছিল। মাঠ এখন ধানশূন্য, কুটিরগুলো জীর্ণশীর্ণ। একটি কুটিরের অভ্যন্তরে এক প্রলয়ঙ্করী কালীমূর্তি। মূর্তির সম্মুখে অনলস দীপশিখা কেঁপে কেঁপে জ্বলছে। মাস্টারদা পার্শ্বে উপবিষ্ট। তাঁর কাছে ধীরে ধীরে নতুন বিপ্লবীরা সংগোপনে আসছেন রক্ত দিয়ে শপথ গ্রহণ করতে। এঁরা প্রত্যেকে আসছেন একান্ত গোপনে। কাজ শেষ হতেই অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছেন একে অন্যকে না জেনে। যাঁরা অতি দক্ষতায় এই কার্যটি পরিচালনা করছেন মাস্টারদার হুকুমে, তাঁরা দলের বিশ্বস্ততম কর্মী।···

কিছুক্ষণের মধ্যে একটি মেয়ে এলেন একটি তরুণের সঙ্গে। মেয়েটিকে তরুণ বললেন—'প্রণাম করো। ইনিই আমাদের মাস্টারদা'।...

মেয়েটি গভীর করে তাকিয়ে দেখলেন—এক মধ্যবয়সী কৃষ্ণকায় পুরুষ বসে

আছেন নৃমুণ্ডমালিনীর পদমূলে। মাস্টারদার চোখ দু'টোয় কী দীপ্তি, দৃষ্টি কী দূরমনস্ক!···কুন্দপ্রভা সেন চিনে ফেললেন ঐ মানুষকে। ঐ তো তিনি—যাঁকে এক ঝড়বাদলের রাতে মায়ের তাড়নায় তাঁদেরই গৃহের আশ্রয় থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি চোখের জলে, পথের দুর্যোগে! সেই পলাতক, সেই নিরভিমান বিপ্লব-তাপস, শরৎচন্দ্রের কল্পনাতনুজ সেই 'সব্যসাচী' আজ তাঁর নয়নগোচরে সমাসীন!...চোখে আবার জল এলো।...গভীর নিষ্ঠায় শ্রীপুর গাঁয়ের কুন্দপ্রভা গলবস্ত্রে মাস্টারদাকে প্রণাম করলেন।···

তারপর যথারীতি রক্ত দিয়ে মূর্তির পায়ে বিহ্বল আবেগে সবার মত কুন্দপ্রভা সেনও স্বাধীনতাকামী-সৈনিকের শপথ নিলেন।···

এমনি করে এই দলে আরো বহু মহিলাকর্মী প্রবেশপথ পেয়েছিলেন পূর্বাপর নানা সময়ে। তাঁদের মধ্যে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, নির্মলা চক্রবর্তী, সুহাসিনী রক্ষিত, নিরুপমা বড়ুয়া, বকুল দত্ত প্রমুখা বিদ্রোহিনীর চট্টগ্রাম-সশস্ত্র-বিদ্রোহে শরিক হবার কথাই আমরা জানি। আরো যাঁরা অর্থ, আশ্রয়, সেবা ও কর্ম দিয়ে সাহায্য দান করে এই বিপ্লববাহিনীকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাঁদের সংখ্যার হিসেব কই? নামী-অনামী সেসব মহিয়সী নারীদেব উদ্দেশে আমরা শুধু অবিচলতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যাই।...

* * * *

আশ্রয় দিতে গিয়ে ধলঘাটের 'সাবিত্রী দেবী' কী দুর্জয় সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন তা আমরা জেনেছি। কিন্তু কী দুঃখ ও ত্যাগববণের মধ্য দিয়ে যে তাঁর পথচলা শুরু হলো তা জানান হয় নি।

ধলঘাটের যুদ্ধেব পরদিন প্রাতে পুলিশ ঐ গৃহ থেকে কন্যা ও পুত্রসহ সাবিত্রী দেবীকে গ্রেপ্তার কবেই ক্ষান্ত হয় নি। তাঁর মাটির গৃহটি ভেঙে চুরমার করে দিয়ে তারা গায়ের ঝাল মিটিয়েছিল। জিনিসপত্র যা কিছু ছিল তার চিহ্নমাত্র না থাকার ব্যবস্থা হল।···তারপর সর্বস্বান্ত ঐ বিধবা ছেলেমেয়ের হাত ধরে এসে কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। বিচারে তাঁর দীর্ঘকালীন সশ্রম কারাদণ্ড হলো। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীরূপে তিনি মেদিনীপুর জেলে আনীত হলেন। জেলে একদিন ছেলে রামকৃষ্ণের কঠিন যক্ষ্মারোগ ধরা পড়ল। মা তা' জানলেন না। মা ও ছেলে থাকেন বিভিন্ন ওয়ার্ডে—জেলের মধ্যে এরূপ অজস্র খণ্ড-জেল রয়েছে কয়েদী

থেকে কয়েদীকে পৃথক রাখার উদ্দেশে।...রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর মা সাবিত্রী দেবী নিষ্ঠাবতী বিধবা। জেলের অনাচার তাঁর সহ্য করা কঠিন। কিন্তু মেনে নিয়েছেন তিনি এ অদৃষ্টকে। কারণ, তিনি তো চোখের উপর দেখেছেন বাঙলার তরুণের বুক ফুলিয়ে মৃত্যুবরণ! তিনি তো দেখেছেন সূর্য সেনকে, দেখেছেন অপূর্ব ও নির্মল সেনকে দিনের পর দিন তাঁর আশ্রয়ে হাস্য-মুখে সকল দুঃখকে উড়িয়ে দিতে!...কিন্তু হায় রে ভাগ্য—এখানেই তো দুঃখের শেষ নয়! একদিন জেলওয়ার্ডার তাঁকে জেল্‌গেটে ডেকে নিয়ে গেল। কেন? কে জানে? পাশের বন্দিনীরা উৎসুকচিত্তে তাঁর প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করছেন। 'জেলের মাসীমা' জেলবাসিনীদের পরমাত্মীয়া।...কিন্তু হঠাৎ শোনা গেল বুকফাটা ক্রন্দন! শোনা গেল যে, বিধবার একমাত্র পুত্র বন্দী রামকৃষ্ণ নাকি যক্ষ্মারোগে তিলতিল করে ক্ষয় পেয়ে এই মাত্র দেহত্যাগ করেছেন—এবং মাকে শেষ পুত্র-দর্শন করানোর জন্যে কর্তাদের তাই এহেন সৌজন্য প্রকাশ!...সাবিত্রীমায়ের বেদনা তাঁর বন্দী-জীবনকে কঠিন কারাগারে কত দুঃসহ করেছিল তা জেলের বাইরে বসে সেদিনকার বাঙলাদেশের মানুষও কল্পনা করতে পারে নি।...

এইভাবে যাঁরা পলাতকদের লালন করেছেন, তাঁদের মধ্যে রজতের মা বিনোদিনী দেবী, দুলধা-গ্রামের মুসলমান চাষীর ঘরণী বা 'কুটির-আশ্রয়ে'র ডাক্তারগৃহিণীর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ডাক্তারগৃহিণীর আশ্রয়দান ও সেবা-যত্নদানের মধ্যে যে নিবিড় মমত্ববোধ, রসসৌন্দর্য ও অনন্যসাধারণ আত্মত্যাগস্পৃহা, প্রতি মুহূর্তে উপচে যেতো তা' বলা হয় নি।·· পলাতক বিপ্লবীর দুর্গম পথচলাকে রমণীয় করে তোলার মন্ত্র জানা ছিল এসব আশ্রয়দাত্রীর। পৃথিবীর অমুক্ত সৌন্দর্য তাঁদের মধ্যে মুক্তি পেয়ে দুরন্ত বিদ্রোহীকে এগিয়ে দিতো বৃহতের পানে সুদূরের দিকে। বিদ্রোহী শুনতেন প্রমত্ত-কণ্ঠের বাণী। শুনতেন ঃ

"সম্মুখের বাণী
নিক্ তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হ'তে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।"...

## পাহাড়তলী অভিযান

মহিলা-নেতৃত্বে একটি খণ্ডযুদ্ধ পরিচালনার কল্পনা ক'দিন যাবৎ-ই সূর্য সেনকে তন্ময় করে রেখেছে। বাঙলার মাটিতে অহল্যাবাঈ, লক্ষ্মীবাঈ বা রিজিয়ার জন্ম দিতে হবে। নইলে মরণ-যজ্ঞে আহুতিদানের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। বাঙালী তার ধ্যানে রিপুসংহারিণী মহাকালীর দর্শন পেয়েছে, আজ তাকে কর্মে শৌর্যশালিনী নারী-যোদ্ধার দেখা পেতে হবে। দেখা পেতে হবে এই বাঙলাদেশেরই নরম মাটির বুকে।...

নির্মল সেন মাস্টারদাকে বলছেন: "দাদা, মেয়েদের নেতৃত্বে যে কঠিন কাজ করবার স্বপ্ন আপনি দেখছেন তা প্রীতিলতার নেতৃত্বে সম্ভব হবে মনে হয়।"

('চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন')

মাস্টারদা স্মিতহাস্যে উত্তর দেন: "তাকে আরো সক্রিয়, আরো চতুর, আরো বিচক্ষণ ও দুর্দমনীয় করে তুলুন।"

(চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন)

বিপ্লবী-চট্টগ্রামের নেতৃদ্বয়ের গোপন সাধ চরিতার্থ করার পথে সংগোপনে যে প্রস্তুতি চলেছিল তা' গোপন-ই থাক। আমরা তার অভিনব রূপায়ণ শুধু অবলোকন করবো এক সংকেতময়ী রাত্রির গোপন অন্ধকারে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে।...

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

* * *

১৯৩২ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর। কাটুনীর আশ্রয়কেন্দ্রে মাস্টারদা প্রীতিলতাকেই নেতৃত্ব দান করে, এক দুর্জয় বিদ্রোহীদলের পুরোভাগে তাঁকে পাঠাচ্ছেন পাহাড়তলী 'ইউরোপীয়ান্ ক্লাব' আক্রমণের জন্যে। ...প্রীতিলতা মহান্ নেতাকে বিদায়কালে প্রণাম করে বললেন—"আমায় আশীর্বাদ করুন কাজ উদ্ধার করে আমি যেন শহিদলোকে চলে যেতে পারি।"

আবেগ গম্ভীর কণ্ঠে মাস্টারদা উত্তর দিলেন: "তুমি কর্মে সার্থক হবে; ইংরেজ জানবে, বিশ্ববাসী জানবে যে—বাঙলার মেয়ে আজ কারো পশ্চাতে নেই। সমস্ত শহিদের আশীর্বাদ তোমার যাত্রাপথকে ঘিরে থাকবে।"

(চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন)

মাস্টারদাকে শেষ প্রণাম জানিয়ে প্রীতিদেবী শেষ বিদায় নিলেন।

*　　*　　*　　*

রাত প্রায় দশটা। নৃত্যগীতমুখর 'পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান্ ক্লাব'। সাহেব-মেমেরা ছোট ছোট দলে নানা আনন্দে মত্ত। কোন দল 'হুইস্টড্রাইভ' খেলছে, কেউ নাচগানে উচ্ছল, কেউ বা পানাহারে মশগুল। ইউরোপীয়দের সংখ্যা কম নয়। প্রায় ৪০ জন পুরুষ-মহিলা।···দূরে সদর দরজায় পাহারারত সার্জেণ্ট, হাবিলদার ও মিলিটারি পুলিশ। তাদেরই সম্মুখের পথ দিয়ে গাড়োয়ানের পোষাকে মহেন্দ্র চৌধুরী ও সুশীল দে ক্লাবঘরের বারান্দায় ঢুকে গেলেন। যেন সাহেবদের গাড়ির কোচোয়ানই সাহেবমেমের নাচ দেখার লোভ সম্বরণ করতে পারছে না! কেউ সন্দেহ কবল না—কারণ সবার চোখেই লেগে আছে রঙিন নেশা!···

পূর্ব ব্যবস্থা মত ক্লাবেব পশ্চাতের ক্ষুদ্রপরিসর পথে প্রীতিলতার নেতৃত্বে অন্যান্য সঙ্গীরা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছেন। যথাস্থানে 'টাইম বম্ব' রাখা হয়েছে।···

মহেন্দ্র চৌধুবী ও সুশীল দে ঐ টাইম বম্ব ফাটবাব সংকেতে পূর্বনির্দেশ মত বোমা নিক্ষেপ করলেন। প্রলয়ঙ্কর শব্দে এঁদের বোমা-ও ফেটে পড়ে। হল্‌ঘর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। প্রীতিদেবীর আদেশে বিদ্রোহীরা রিভল্‌ভার চালাতে লাগলেন। মুহুর্মুহু বুলেট্-এর শব্দ দিগদিগন্তে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলল। তৎসঙ্গে শোনা যেতে লাগল ভীতত্রস্ত শ্বেতাঙ্গ নরনারীব হাহাকাব ও ইতস্তত ছুটাছুটির শব্দ। ফটকের মিলিটারি পাহারার দল বুঝল যে সুয সেনের লোকেরা ক্লাব আক্রমণ করেছে। তারা ছুটে চলল হেড্ কোয়ার্টারের দিকে। এ ছুটে-চলার পশ্চাতে আত্মরক্ষার প্রবণতাই ছিল বেশি।

*　　*　　*　　*

কার্য সম্পন্ন হয়েছে। অধিনায়িকার নির্দেশে বিদ্রোহীবাহিনী অস্ত্র সম্বরণ করে ক্লাবঘর ত্যাগ করলেন। বাহিনী খানিকটা এগিয়ে যেতেই বিপ্লবীদের খেয়াল হলো যে 'প্রীতিদি' তো আসেন নি। একজন ছুটে পেছনের পথে চলে এলেন।

তখন দূরে সন্ধানী-আলো ফেলে মিলিটারি-গাড়ি তড়িৎগতিতে আসছে! প্রীতি দেবীর কাছে এসেই সেই তরুণ বললেন: শীগ্‌গির চলে আসুন।...পুলিশ এসে যাচ্ছে! আসুন, দিদি, আসুন।...

প্রীতি দেবী সুদূরমনস্কতায় উর্ধ্বে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন: ঐ আমার গন্তব্যস্থান। শহিদকুল আমায় ডাকছেন।...

তরুণ বিপ্লবী কিছুই বুঝলেন না। বললেন: ব্যাপার কি? পুলিশ এলে সর্বনাশ হবে যে, দিদি!

—সবাই চলে যাও। একটুও দেরি কোরো না।....বারে বারে আঘাত হেনে শত্রুকে পরাজিত করার চেষ্টা কোরো, এই আমার শেষ অনুরোধ।...যাও ভাই, শুভেচ্ছা সবার জন্যে। প্রণাম মাস্টারদাকে—

এই ক'টি কথা বলেই প্রীতিলতা 'সায়ানাইড' খেয়ে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন সোনার প্রতিমা!...

প্রীতিলতা পূর্বেই তাঁর রিভল্‌ভারটি ঐ তরুণের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কারণ, অমন মূল্যবান জিনিসের অপচয় ঘটানো যায় না।...অধিনেত্রীর কাছ থেকে পাওয়া শ্রেষ্ঠদানটি নিয়ে গভীর বেদনায় বিপ্লবী অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।...ততক্ষণে মিলিটারি-বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছে।...

মিলিটারি প্রথমেই ক্লাবঘরে ঢুকে গেল। সাহেবদের মৃত ও অর্দ্ধমৃত দেহগুলো যথাযথ স্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা হল। ক্লাব প্রাঙ্গণের কিছুদূরেই তারা পেল সামরিক-পোষাকে সজ্জিত প্রীতিলতার প্রাণশূন্য দেহ। এই দেহখানি ঘিরে পুলিশের কী ব্যস্ততা! কল্পনার বাইরে এ এক আবিষ্কার। কোন মহিলা যে বিপ্লবী-নেতার ভূমিকায় সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করবেন, পুলিশ এ-কথা ভাববে কী করে?

প্রীতিলতার দেহ তল্লাস করে পাওয়া গেল শ্রীকৃষ্ণের ছবি, শহিদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফটো, পাহাড়তলী ক্লাবের প্ল্যান্, চামড়ার বেল্ট একটি, ইণ্ডিয়ান্ রিপাব্লিকান্ আর্মির নোটিশ, তিনটি কার্তুজ (রিভলভারের), একটি শিস-বাঁশী, প্রীতিলতার স্বহস্তে লিখিত একটি স্টেট্‌মেণ্ট। এ স্টেট্‌মেণ্টে আছে: "চট্টগ্রাম বিপ্লবীরা স্মরণীয় ১৮ই এপ্রিল এবং তৎপরে জালালাবাদে, ফেণী ও কালারপুলে, চন্দননগরে, চাঁদপুর-ঢাকা-কুমিল্লা ও ধলঘাটে যে অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে তাহাতে কেবল বাংলায় নহে সমগ্র ভারতের যুবকযুবতীদের চিন্তা ও কল্পনা আকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছি, আজিকার অভিযানও

তাহারই একটি অংশ। আমাদের মহান নেতা মাস্টারদা যখন আমাকে আহ্বান করেন তখন আমি পূর্ণ দায়িত্ববোধের সহিত আজিকার দিনের সংগ্রাম পরিচালনার কর্তব্যভার গ্রহণ করি।" ( চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন )

সূর্য সেন ও নির্মল সেনের 'মাস্টার প্ল্যান্' সার্থক করে তাঁদেরই বিপ্লবী-মনের মানস-কন্যা প্রীতিলতা অক্ষয় গৌরবে শহিদলোকে চলে গেলেন। পশ্চাতে পড়ে রইল জাতীয় ইতিহাসের একটি অধ্যায়, যেখানে বাংলার 'ঝাঁসীর রাণী'র মৃত্যুহীন আলেখ্য সোনার বর্ণে অঙ্কিত আছে। —ওদিকে ইংরেজের মধ্যে যাঁরা বীর ও দেশপ্রেমী তাঁরা বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন এই অধিনায়িকার পানে। তাঁরা কি আবিষ্কার করেছিলেন এই নারীর মধ্যে তাঁদেরই "রাজ্ঞী বোডিসিয়া"-র এক তেজোদীপ্ত মূর্তি ও আত্মবিলয়নের ছবি ?···

## অবিস্মরণীয় দান

পূর্বেই বলেছি, মাস্টারদা চট্টগ্রাম রাইজিং-এর প্রস্তুতিকালে দলের লোকদের নির্দেশ দিলেন যার যার ঘর থেকে অর্থসংগ্রহ করে একটি অর্থ-ভাণ্ডার গড়ার জন্যে। কারণ যে-অর্থ দিয়ে প্রস্তুতি শুরু হবে সে-অর্থ অন্য স্থান থেকে যোগাড় করা চলবে না।····ছেলেরা ঘর থেকে অর্থ ও গহনা যোগাড়ের কাজে লেগে গেলেন। পার্টির অর্থ-ভাণ্ডারে প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হল।

এই অর্থসংগ্রহের ইতিহাসও চমকপ্রদ।...**শ্রীপতি চৌধুরী** একজন ছাত্রকর্মী। জমিদারের ছেলে। ১৮,০০০৲ টাকা তিনি পিতার সেরেস্তা থেকে নিয়ে এলেন।···**জীবন ঘোষাল** ধনী ব্যবসায়ীর ছেলে। পিতার নামে চেক্ জাল করে নিয়ে এলেন তিনি ১,৬০০৲ টাকা।···এভাবে যথাসম্ভব অনেকেই অর্থ সংগ্রহে মেতে উঠলেন। পিতামাতা বিরক্ত হলেও কেহই পুলিশে খবর দিলেন না। কারণ কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবার ভয় সবারই তৎকালে ছিল।...

এই দানযজ্ঞে একটি বালকের কীর্তি অতুলনীয়। তাঁর নাম **ধীরেন দে**। ধীরেন চট্টগ্রাম সহরের জে-এম্-সেন বিদ্যালয়ের ছাত্র। বড় দুঃখে তাঁদের সংসার চলে। পিতা সামান্য ঘরামীর কাজ করে যা আয় করেন তাতে পুত্রের শিক্ষাভার বহন করাও কঠিন। কিন্তু এত দারিদ্র্যের চাপেও ধীরেনের স্বপ্ন-ছোঁয়া মন বৃহতের স্পর্শকামনায় ব্যাকুল। মাস্টারদার কণ্ঠস্বর তাঁর পথচলার আহ্বান। মাস্টারদার মূর্তি তাঁর গন্তব্যস্থানের পথ-প্রদর্শক। ভারতবর্ষের মুক্তিলাভের চেষ্টায়

তাঁর তনুপ্রাণ সমর্পিত। ধীরেনও কান পেতে শুনেছেন মাস্টারদার উক্তি। 'ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ না করলে পর-স্বার্থে আঘাত হানবার অধিকার জন্মে না'— একথা ধীরেনও বুঝেছেন। কাজেই ধনিকের অথবা সরকারের ধনভাণ্ডার দেশের কাজের জন্যে দলায়ত্ত করতে যাঁরা বদ্ধপরিকর তাঁদের সর্বপ্রথমে স্বগৃহ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। দরিদ্র ধীরেন দে তো 'দরিদ্র' বলে পেছনে পড়ে থাকতে পারেন না! কারণ তাঁর চিত্তের ঐশ্বর্য তো সামান্য নয়! ধীরেনের সংসারে সঞ্চয় বলে কোন বস্তু নেই। তবু এই ধনদানের যজ্ঞে যথাসম্ভব আহুতি না দিয়ে তিনি থাকেন কি করে?

সহসা ধীরেনের মনে পড়ে গেল যে, তাঁর জননীর একমাত্র সম্পত্তি যে দু'চার গাছা রূপোর অলঙ্কার সেদিনও ঋণের দায়ে বন্ধক দেওয়া ছিল তা' সদ্যোমাত্র মুক্ত করে আনা হয়েছে।...আর বিলম্ব সইল না। নিশীথের অন্ধকারে নিদ্রিত পিতামাতার অজ্ঞাতে মায়ের ভাঙা ট্রাঙ্কের গহ্বর থেকে তাঁর একমাত্র সঞ্চয় ঐ ক'গাছা রূপোর অলঙ্কার সংগ্রহ করে ধীরেন দে ত্বরিতপদে গৃহ থেকে বেরিয়ে এলেন।...মাস্টারদার হাতে নিঃস্বের সঞ্চয় তুলে দিয়ে ধীরেন পরম আনন্দে ও গর্বে দাঁড়িয়ে রইলেন। মাস্টারদা অভূতপূর্ব তৃপ্তির সহিত অলঙ্কারগুলো গ্রহণ করে বললেন: "এ সামান্য অলঙ্কার তোমার 'নিঃশেষে দানে'র গৌরবে অমূল্য হয়ে উঠেছে। আমি এ-দানকে প্রণাম করি। এ আমাদের সম্পত্তি। গচ্ছিত থাকবে আমাদেরই জননী, তোমার গর্ভধারিণীর ভাণ্ডারে।...দুঃখ পেয়ো না, ভাই। মায়ের কাছে এ-বস্তু তুলে রাখো। এ স্পর্শ করবার অধিকার কেবল তাঁরই। ...তুমি সার্থক। তুমি সুন্দর। তোমার ক্ষয় নেই।" অনাথপিণ্ড ভিখারিণীর 'শ্রেষ্ঠদান' মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। মাস্টারদা ধীরেনের 'শ্রেষ্ঠদান' মাথায় তুলে নিয়ে বিপ্লবীদের জননীর উদ্দেশে ফিরিয়ে দিলেন।...

* * * *

চট্টগ্রামের এই বিদ্রোহের বিপুল সমারোহে যাঁরা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন, যাঁরা নিহত হয়েছেন বা ফাঁসি গিয়েছেন তাঁদের খোঁজ আমরা পাই। কিন্তু আরো বন্ধু আছেন যাঁরা দৈব-বিপর্যয়ে প্রাণ দিয়েছেন, আত্মগোপনের বন্ধুর পথে আত্মনাশ করেছেন—অথচ তাঁদের দান ব্যতীত এ-বিদ্রোহের সাফল্য ম্লান হয়ে যেত। আমরা এখানে তাঁদের দু'-একটি চরিত্রের উল্লেখ করবো।

**শৈলেশ্বর চক্রবর্তী**। কলেজের বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রতিভাবান এই তরুণ কর্মী মাস্টারদার প্রিয়পাত্র। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও জালালাবাদ-যুদ্ধে তাঁর বীর্যের পরিচয় বিপ্লবীদের শ্লাঘার বস্তু। পলাতক-জীবনে সঙ্ঘকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার কাজে, বিপ্লবীর 'আস্তানা' খুঁজেপেতে তৈরি করার কাজে এবং বোমা তৈরি করার কাজে তাঁর কৃতিত্ব নেতাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতো।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে পাহাড়তলী-অভিযান অনুষ্ঠিত হবার বহু পূর্বে শৈলেশ্বরের উপর ভার পড়েছিল 'ইউরোপীয়ান ক্লাবটি' আক্রমণ করার। শৈলেশ্বর নিজের ত্রুটিতে কাজটি হাসিল করতে পারেন নি।··· ব্যর্থমনোরথ শৈলেশ্বর কাট্টলীর আস্তানায় ফিরে এলেন। ভাবপ্রবণ তরুণ। কেউ তাঁকে সামান্য অনুযোগ-ও দেয় নি। কিন্তু তার মন ভারাক্রান্ত। ব্যর্থতার এই জ্বালা তাঁর সকল সত্তাকে পুড়িয়ে দিচ্ছিল। সবার অজ্ঞাতে পকেট থেকে 'সায়ানাইড' বের করে খেয়ে ফেলে মৃত্যুর কোলে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর পকেটে পাওয়া গেল মাস্টারদাকে লিখিত ছোট্ট চিঠি: "মাস্টারদা, আপনার অযোগ্য ও অক্ষম শিষ্য জন্মের তরে বিদায় লইতেছে। যে-কাজের দায়িত্ব তাকে দিয়েছিলেন সে তা সমাপন করিতে পারে নাই। ব্যর্থতার গ্লানি ও পরাজয়ের কলঙ্ক মাখিয়া আপনাকে এই মুখ কি করিয়া দেখাইব? আপনার কৃতী সহকর্মীদের পাশে অকৃতী এই অক্ষমের অবস্থান মানায় না। তাই আজ জন্মের মত যাই। ইতি—

আপনার অযোগ্য শিষ্য,

শৈলেশ্বর।"

সমুদ্র-সৈকতে শৈলেশ্বরকে সমাহিত করা হল। মাস্টারদার কাছে পত্রখানা সত্বর পৌঁছে দিলেন একটি কর্মী। পত্র পড়ে ব্যাথাতুর কণ্ঠে মাস্টারদা নির্দেশ দিলেন: "এ দুঃসংবাদ সংগোপনে রেখো। এর প্রতিক্রিয়া ভীষণ হতে পারে।"...

বন্ধুরা নেতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করায় দলের লোক এবং শৈলেশ্বরের বাড়ির লোক ঘটনাটি সেদিন পর্যন্ত জানতে পারেন নি। আজ যথাসময়ে ইতিহাস এ-সংবাদের আবরণ মোচন করে দিয়েছে।···

(চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন)

দুঃসাহসী কর্মী **বীরেন্দ্র দে**। অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন ও জালালাবাদ-যুদ্ধের শরিক এবং মাস্টারদার নিত্য সহচর ছিলেন এই বিপ্লবী। পলাতক জীবনে দলের

নানা কাজের সহায়তা করে এই তরুণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। 'বরমা'-র পথে দারোগা শশাঙ্ক ভট্টাচার্যকে যাঁরা রিভলভারের গুলীতে ঘায়েল করেছিলেন তাঁদেরই অন্যতম এই বীরেন দে।

একদিন দলের নতুন কর্মীদের রিভলভার চালনা শিক্ষা দেবার ভার পড়ে বীরেন দের উপর। রিভলভার বা পিস্তলের একটা মোহিনী শক্তি আছে। নতুন এ জিনিস হাতে পেলে অনেকেই বেহুঁশ হয়ে যায়। তরুণ এক কর্মীর হাতে একটি রিভলভার তুলে দিয়ে তাতে বীরেন্দ্র নিজের হাতেই বুলেট ভরে দিচ্ছিলেন। বালকটি রিভলভারের ট্রিগারে আঙুল রেখে অপেক্ষা করছিল। নির্দেশ মাত্রই একটি গুলী ছুঁড়ে বহুদিনের বাসনা পূর্ণ করবে! হঠাৎ নিজের অজ্ঞাতেই ট্রিগারে টান পড়ে গেছে! দ্রাম্ করে শব্দ হল।...বীরেন বসে পড়লেন! স্বদেশের মুক্তি-যুদ্ধে অর্পিত তাঁর প্রাণ বন্ধুর অশিক্ষিত হাতের ( রিভলভার থেকে বেরিয়ে আসা ) গুলীতে বাহির হবার পথে! রক্তের বন্যায় ধরাতল ভেসে যাচ্ছিল।...

পাহাড়ের নিভৃত স্থানের এক শিক্ষাকেন্দ্র গুটি কয়েক শিক্ষার্থী সহসা শিক্ষাদাতার এই মর্মান্তিক পরিণতি দেখে বিভ্রান্ত হয়ে গেল। বীরেন দে বারে বারে ডেকে বলছিলেন: "আমায় গুলি করে মেরে ফেলে এইখানেই কবর দিয়ে যাও। নইলে আমাকে নিয়ে তোমাদের বিপদ হবে।" অবিশ্রান্ত রক্তক্ষরণে তিনি চৈতন্য হারালেন।...

বন্ধুরা ঘটনাস্থল থেকে মূর্চ্ছিত বিপ্লবীকে কাছাকাছি এক গ্রামে একজনের বাড়ি নিয়ে এলেন। মাস্টারদাও অন্যতম নায়ক তারকেশ্বর দস্তিদার সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছেন। যে গৃহে তাঁকে আনা হয়েছিল সে-গৃহ পুলিশের নজরে থাকায় বীরেনকে অন্যত্র নিতে হবে। গৃহের তরুণ বাসিন্দাটি পুলিশের সন্দেহভাজন। চট্টগ্রামে কোন তরুণই সন্দেহের বাইরে তখন নয়। জেলার একুশ হাজার ছাত্র ও যুবককে নানা রঙের 'পরিচয়-পত্র' দেখিয়ে ঘোরাফেরা করতে হয়!...

মাস্টারদা পাশে এসে বসতেই বীরেনের জ্ঞান ফিরে এসেছে। মাস্টারদাকে চোখ মেলে দেখতেই তাঁর সকল যন্ত্রণা দূর হয়ে গেছে। হাতখানা বাড়িয়ে তাঁর পায়ের ধুলো চাইছেন বীরেন। মাস্টারদা সস্নেহে সেই হাতখানি নিজের বুকে টেনে নিলেন। কাতরকণ্ঠে বীরেন বললেন: "আমাকে নিয়ে বৃথা দুর্ভোগ ডেকে আনবেন না। আমায় একটু সায়ানাইড দিন।"...

মাস্টারদা কঠিন বিপ্লবী, কিন্তু তৎসঙ্গে তাঁর হৃদয়টি কুসুমকোমল। এই

বীরেনকে ঘিরে তাঁর বিপ্লবী-জীবনের কত স্মৃতি বিজড়িত। বীরেনের জীবন-রক্ষার শেষ চেষ্টা তাঁদের করতেই হবে। আসুক বিপদ। বিপদে তাঁদের কি বা ভয়? কিন্তু কী করে বীরেনকে বাঁচান যায়? কোথায় আশ্রয়, কোথায় ডাক্তার, কোথায় চিকিৎসা? অথচ বীরেন তো সময় দেবেন না? মুমূর্ষু বীরেন?…

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে গ্রামের বুকে। বীরেন্দ্রের জীবনেও হয়তো সন্ধ্যা নেমে আসার সময় হয়েছে! অসহ্য যন্ত্রণা বীরেনের সর্বাঙ্গে, অসহ্য যন্ত্রণা বুলেটের দুষ্ট ক্ষতে। কিন্তু অতুলনীয় সহ্যশক্তিতে সেই যন্ত্রণা বীরেন ভুলে আছেন নিঃশব্দে। শব্দ করলে পাছে বন্ধুরা বিপদগ্রস্ত হন, আশ্রয়স্থলটি অবাঞ্ছিত লোকের নজরে আসে!…

এমন সময় দলের বিশ্বস্ত কর্মী নীরেনের সঙ্গে একটি অপরিচিত লোক এলেন। সবাই উৎকণ্ঠিত। নীরেন সকলের কৌতুহল দূর করে বললেনঃ "ইনি এই 'চক্রশালা' গ্রামেরই **গগন ঘোষ**। আমাদের এ বিপন্ন অবস্থায় রোগীকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর জীবনরক্ষার দায়িত্ব ইনি নিতে ইচ্ছুক।"…

গগন ঘোষের নাম শুনে কেউ কেউ স্তম্ভিত হয়ে গেল। এ ব্যক্তি একজন দাগী চোর। বহুবার জেল খেটেছে চুরির অপরাধে। পুলিশের পীড়নের ভয় বা পুরস্কারের লোভ তার কাছে উপেক্ষণীয় নয়। তাকে বিশ্বাস করা চলে কি করে?

এ বিষয়ে তাড়াতাড়ি যা' হয় স্থির করতে হবে। বিপদে সত্বর সিদ্ধান্ত গ্রহণে মাস্টারদা অতুলনীয়। তিনি বললেনঃ "সায়ানাইড্ দেওয়ার চাইতে গগন ঘোষের হাতে তুলে দেওয়া-ই ভাল।"

গগন ঘোষ বলল: "বিরাট পরিবার পালন করবার পথ না পেয়ে বহুবার চুরি করেছি এবং সেজন্য পুলিশের মার খেয়েছি, জেলের দুঃখ পেয়েছি বিস্তর। ও দু'টি বস্তুই আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। এবার না হয় একজনের জীবন বাঁচাবার চেষ্টায় ও স্বদেশীবাবুদের আশ্রয় দেবার অপরাধে জেল খাটবো। ও-জন্যে আমি ভাবছি না।"…দাগী চোর গগন ঘোষের কণ্ঠে এ কী অভয়বাণী! অন্তরে এ কী উচ্ছল প্রেম! এর কোথাও ফাঁকি মনে হচ্ছে না তো!…

মাস্টারদা তার হাতখানা ধরে বললেনঃ "এ গরীব দেশে তোমার মত বিপন্ন মানুষই চোর হয়, খুনী হয়, ডাকাত হয়। দেশ স্বাধীন হলে এদেশে এসব অপরাধ থাকবে না, ভাই। আমরা দেশকে স্বাধীন করার জন্যেই বেরিয়েছি। ভগবান

মুখ তুলে চাইলে আমাদের সবার দুঃখ একই সঙ্গে ঘুচে যাবে। তোমার দারিদ্র্য তোমাকে তথাকথিত 'অমানুষে'র পথে টেনে নিয়েছিল, কিন্তু অম্লান মনুষ্যত্ব তোমার মধ্যে আমি দেখেছি। তুমি অসাধারণ কাজ করে ধন্য হবে, এ আমি নিশ্চয় করে বলে যাচ্ছি।"

বিপ্লবের নেতা, সর্বজনপূজ্য সূর্য সেন এক দাগী চোরকে বললেন 'ভাই', স্থান দিলেন তাকে 'বন্ধু' রূপে, স্বীকৃতি পেল সে মানুষের মর্যাদায়!...গগন ঘোষ সত্যি অসম্ভবকে সম্ভব করে দিল।

এই দাগী চোরের গৃহেই বীরেনের স্থান হল। গগন ঘোষের পরিবারস্থ সকলে আহত বীরেন দের জীবনের শেষ একটি সপ্তাহ তাঁকে অপূর্ব স্নেহে ও যত্নে সেবা দান করে গেলেন। মাস্টারদা থেকে আরম্ভ করে দলের বহু নামী পলাতক বিপ্লবীরা এই গৃহে কত যাতায়াত করে গেলেন সাতটি দিনের পরিসরে। দূর থেকে বিশ্বস্ত ডাক্তারদের বহুবার আনাগোনা হয়েছে। গগন ঘোষের পরিবার মুমূর্ষু রোগীর শুশ্রূষা ও আগন্তুকদের পরিচর্যায় কোথাও ত্রুটি হতে দেন নি।... পাড়ার লোকে কিছুই টের পেল না। পুলিশের লোক ভুলেও এই দাগী চোরকে বিপ্লবীর সঙ্গে যুক্ত করতে পারে নি।...

* * * *

চিকিৎসা হল নামমাত্র। হাসপাতালে পাঠান অসম্ভব। অগত্যা ধীরে ধীরে বীরেন্দ্র মৃত্যুর পানে পা বাড়াতে থাকলেন। ঘা বিষাক্ত হয়ে গেছে। সাত দিনের দিন তিনি হৃদয়বান গগন ঘোষের গৃহেই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে তখন মাস্টারদা, তারকেশ্বর দস্তিদার, বিনোদ দত্ত এবং আরো কতিপয় বিশ্বস্ত কর্মী।...মৃত্যুর পূর্বে বীরেন দে বলে গেলেন: "যার অসাবধানতায় আমি তোমাদের ছেড়ে যেতে বাধ্য হলাম তার অপরাধ তোমরা নিয়ো না। তাকে গভীর করে কাছে টেনে নিয়ো। তার ব্যথা কিন্তু আরো বেশি!"...

* * * *

রাত্রির অন্ধকারে সকলে মিলে শব বহন করে নিয়ে এলেন রেললাইনের পার্শ্বেই এক নির্জন স্থানে। শব সমাহিত হল বিনা আড়ম্বরে, প্রভূত নিষ্ঠায়। সকলে মিলে প্রার্থনা করলেন বিদেহী-আত্মার কল্যাণে। নিবিড় নিশীথের নিরালায় মাস্টারদার বেদনা তাঁর দু'টি চোখে অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ল। তাঁর সঙ্গে নীরবে

আর একটি মানুষ-ও কেঁদেছিল। তার নাম গগন ঘোষ। কিন্তু সভ্যসমাজের বিচারে সে 'দাগী চোর' ছাড়া আর কিছু নয় !!··· ( চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন )

## সিংহ—পিঞ্জরাবদ্ধ

"পোহাইল বিভাবরী পলাশী প্রাঙ্গণে,
পোহাইল ভারতের সুখের রজনী।"

( নবীন সেন )

ধলঘাটের সংঘর্ষের পর ধলঘাটের চতুষ্পার্শ্বস্থ বিস্তৃত এলাকায় সৈন্যদের কতকগুলো ঘাঁটি বসানো হয়েছে। সুতরাং পুলিশের ধারণা যে, ওসব স্থানে বিপ্লবীরা আর আসবে না। কিন্তু বিপ্লবীরা পুলিশের মনস্তত্ত্ব ভালই বোঝেন। তাই ধলঘাট থেকে মাইল তিনেক দূরে 'গৈরলা' গ্রামেই সূর্য সেন তাঁর আস্তানা গড়েছেন। বিশ্বাসদের বাড়িতে তাঁদের এই আশ্রয়কেন্দ্র। বিশ্বাসরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হৃদয়বান পল্লীবাসী। তাঁদের কাছাকাছি হল গ্রাম্য-জমিদার নেত্র সেনের বাড়ি। নেত্র সেনের ছোট ভাই ব্রজেন দলেরই কর্মী। নেত্র সেনের স্ত্রী পলাতকদের খাওয়াতে ভালবাসেন। ব্রজেন ও তাঁর বৌদি নেত্র সেনকে বিপ্লবে সহানুভূতিশীল করে তোলার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন। নেত্র সেন মাতাল, স্বার্থপর এবং দেশ বা দেশকর্মী সম্পর্কে নির্লিপ্ত। তাঁর জমিদারি ঋণের বোঝায় টলমল করছে। কি করে অর্থ যোগাড় করা যায় সে-চিন্তা ছাড়া আর কিছুতে তাঁর মন বসে না।

নেত্র সেন চালাক লোক। তিনি টের পেয়েছেন যে, বিশ্বাসদের গৃহে ক'জন পলাতক এসেছেন এবং তাঁর স্ত্রী ও ভাই গোপনে তাঁদের নিয়ে মেতে উঠেছেন। সেই লোকগুলোকে তাঁর স্ত্রী প্রায়ই এটাসেটা রান্না করে যে পাঠান তা-ও তাঁর চোখে পড়েছে।···

এদিকে দেশসুদ্ধ লোক জানে যে, সূর্য সেনের নামে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। নেত্র সেন-ও তা' জানেন। এ টাকা, সূর্যবাবুকে যে লোক ধরিয়ে দেবে তারই প্রাপ্য। মাতাল নেত্র সেনের মগজে দুর্বুদ্ধি কিলবিল করে ওঠে। এই তো সুযোগ! বিনা পরিশ্রমে এতগুলো টাকা উপায় করা যায়! ঋণ শোধ হবে, ঠাট বজায় থাকবে, মদের বোতল-ও আর দুর্লভ হবে না।···

সবুর সইল না। আদর করে গৃহিণীকে কাছে ডাকলেন। স্ত্রীকে খোশামোদ করে জেনে নিলেন আড্ডায় কারা আছেন। প্রস্তাব করলেন যে, একদিন

পলাতকদের 'চর্ব্যচোষ্য-লেহ্যপেয়' জাতীয় আহার পাঠাতেই হবে; সূর্য সেন যখন আছেন, এ না করলে তাঁর আত্মা তৃপ্ত হবে না।...সেনগিন্নী তো এক পা বাড়িয়েই ছিলেন। আজ স্বামীর সহযোগিতা অপ্রত্যাশিতভাবে লাভ করে তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। আহা, কী ভাগ্য তাঁর, দেবদুর্লভ এই মানুষগুলোকে তিনি প্রাণভরে একটু খাওয়াতে পারবেন।...স্ত্রী পরক্ষণেই বিষণ্ণ বদনে জানালেন যে, মাস্টারদারা সে-রাত্রেই আস্তানা বদলাবেন বলে স্থির আছে। উত্তরে নেত্র সেন বললেন যে সন্ধ্যায় তাঁদের খাইয়ে দিতে হবে। সৎ কার্যে গাফিলতি ভগবান সহ্য করবেন না। কথা শেষ করেই তিনি বাজার করার ছলে বেরিয়ে গেলেন। বাজারের পথেই পুলিশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হল। টাকা গ্রহণের এবং সূর্য সেনকে ধরিয়ে দেবার সকল প্ল্যানই ঠিক হয়ে রইল।

সেদিন ছিল ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ সাল।...

* * * *

এদিকে পূর্ব থেকেই সূর্যবাবুরা স্থির করেছিলেন যে, ২রা ফেব্রুয়ারি রাত্রির অন্ধকারে তাঁরা 'গৈরলা'-র আশ্রয়কেন্দ্র ত্যাগ করবেন। কেন্দ্রে সেদিন পলাতকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাস্টারদা, তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, সুশীল দাসগুপ্ত, মনি দত্ত ও নেত্রবাবুর ভাই ব্রজেন সেন।...

বিশ্বাসদের গৃহে সূর্যবাবুরা বেশ যত্নে ছিলেন। তাঁদের কাজকর্ম এ কেন্দ্র থেকে ভাল চলছিল। মাস্টারদা সে-সময় গভীরমনস্কতায় নিযুক্ত ছিলেন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করার কাজে। ত'ছাড়া মনের নানা চিন্তাও এখানে বসে তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন।...নির্মল সে- আজ তাঁর পাশে নেই। নির্মলবাবুর অভাব পূরণ করার মত লোক তাঁর দলে আর একটিও ছিলেন না। তাঁর মৃত্যু তাঁকে ভারি বেকায়দায় ফেলেছে। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সেদিন বিহ্বল বেদনায় মাস্টারদা স্বগতোক্তি করেছিলেন—"আজ আমার বড় দুর্দিন। আজ আমার ডান হাতখানাই ভেঙে গেল।".. তারপর চলে গেলেন প্রীতিলতা। চলে গেলেন বীরেন দে এবং আরো কত কিশোর বীর—ঢলঢলে মুখগুলো তাঁদের মনে পড়ে।... যাক্, 'যেতে দাও গেল যারা।'...

মাস্টারদার চিন্তাধারার একটু আভাস তুলে দিচ্ছি এখানে 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' পুস্তক থেকে :—

"বিজয়া শীর্ষক একটি প্রবন্ধে মাস্টারদা লিখিয়াছেন : ছয় মাসের সযত্ন

আয়োজনের পর ১৮ই এপ্রিল রাত্রে চট্টগ্রামে বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করিল প্রত্যেক নেতা তাহাতে যোগদান করিয়াছেন।...আমিই বহু জীবনের বিজয়ার হেতু, আমার ১৮ জন সঙ্গীকে মাতৃচরণে উৎসর্গ করিয়া অবশিষ্ট আমরা লুকাইয়া আছি।

"প্রীতির সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া এই প্রবন্ধের অন্য অংশে তিনি লিখিতেছেন—পনের দিন পূর্বে আমি তাঁহাকে স্বহস্তে যোদ্ধবেশে সজ্জিত করিয়া মৃত্যুর কবলে পাঠাইয়াছি। প্রীতি স্বহস্তে অমৃত পান করিয়া অমর হইয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহার অভাব ও বিসর্জন ভুলিতে পারিতেছি না।"...

বজ্রের মত নির্মম এই পুরুষের বুকখানা যথার্থই কুসুমের মত কোমল ছিল। এ সত্য তাঁরাই গভীব করে বুঝেছেন যাঁরা তাঁর চোখের ইসারায় প্রাণ দিয়েছেন, দুঃখ বরণ করে ধন্য হয়েছেন।

ক্রমে সন্ধ্যা নেমে এল গৈবলা-গাঁয়ের বুকে।...পরম পরিতোষে নেত্র সেনের স্ত্রী মাস্টারদা ও অন্যান্য পলাতকদের ভূরিভোজন করিয়েছেন নিজে, বিশ্বাসদের গৃহে গিয়ে।...কিন্তু কী হল? মাস্টারদা খাওয়াদাওয়ার একটু পরই সব বমি করে দিলেন। পেটে কিচ্ছু রইল না। ব্রজেন ছুটে গেলেন দাদা নেত্র সেনের কাছে খবরটা দিতে, ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু নেত্র সেন নির্বিকার।... ব্রজেন আশ্চর্য হয়ে দেখেন যে, তাঁর দাদা একটি লণ্ঠন দিয়ে যেন 'সিগ্‌ন্যালিং' করছেন।...ব্রজেন ছুটে চলে এলেন মাস্টারদার কাছে তাঁর সন্দেহ জানাতে। ...ঠিক সেই মুহূর্তে গৃহের প্রবেশপথে 'রকেট'-বোমা ফেটে পড়ল। 'কারফু'-র দৌরাত্ম্যে নিঝুম গাঁয়ের অতল আঁধারে আলোকের তরঙ্গ চমকে গেল।...মিলিটারি এসে গেছে সদর্পে। ঘেরাও হয়ে গেছেন বিপ্লবীরা। আর বাঁচবার পথ নেই। অভিশপ্ত ২রা ফেব্রুয়ারির রাত্রি।...চট্টগ্রামের মিরজাফরের দৌলতে আবার—

"সিরাজের ছিন্ন মুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল
পড়িল, ছুটিল রক্ত স্রোতের মতন।"...

(নবীন সেন)

আশ্রয়স্থলের পেছনে ঝোপজঙ্গল। তারপর ময়লা ও নোংরা জলে ভরা একটি গড়। গৃহপ্রাঙ্গণের বেড়া ডিঙোতে হবে। সুশীল দাসগুপ্ত প্রথমে কল্পনা দত্ত ও অপর দু'জনকে পাঁজাকোলা করে বেড়া পার করে দিলেন। পরে মাস্টারদাকে তুলে ধরতেই আড়াল থেকে পুলিশের গুলি এসে তাঁর হাত বিদ্ধ করে দিল। মাস্টারদাকে সাহায্য করার ক্ষমতা তাঁর রইল না। মাস্টারদা প্রচুর

গুলিবর্ষণ থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে অল্প দূরে একটি বড় গাছের গুঁড়ি ধরে বেড়া টপ্‌কানোর চেষ্টা করতেই সেখানে লুকিয়ে থাকা একটা গুর্খা সেপাই তাঁকে ধরে ফেলল। তারকেশ্বর ও কল্পনা দত্ত এবং আহত অবস্থায় শান্তি চক্রবর্তী ও অপর ক'জন গড়ের নোংরা জল পার হয়ে, ওপারের ঘনান্ধকার ভেদ করে, প্রাণপণে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কেবল মাস্টারদা ও ব্রজেন সেন বন্দী। সারা রাত উভয়ের উপর অমানুষিক নির্যাতন চলল। পরদিন দুঃখের প্রভাত দেখা দিল। পিঞ্জরাবদ্ধ মাস্টারদা ও ব্রজেনকে নিয়ে উল্লসিত পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী পুটিয়া থানার পথে রওনা হল।..

"স্বাধীনতা-শেষ-আশা হইল আঁধার।"...

(নবীন সেন)

## তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত

সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন গ্রেপ্তার হবার পর তারকেশ্বর দস্তিদারের উপর কর্ম-নেতৃত্ব এসে গেছে। 'গহিরা'-র গুপ্তনিবাসে তারকেশ্বর ও কল্পনা আছেন প্রায় তিন মাস ধরে। এঁদের প্রধান কাজ ছিল জেল থেকে মাস্টারদা ও অপর বন্দীদের ছিনিয়ে আনার চেষ্টা করা। কিন্তু গত বিশে মার্চ (১৯৩৩) সে-ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেছে। কাজেই এখন নতুন করে কিছু করার কথা এঁরা ভাবছেন।...

অথচ বিধাতার প্ল্যান অন্য রূপ!...

হঠাৎ ১৮ই মে (১৯৩৩) 'গহিরা'-র আশ্রয়কেন্দ্রটি পুলিশ ও মিলিটারি বাহিনী ঘেরাও করল। তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত ছাড়া আরো লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সংঘর্ষ শুরু হলো। কিন্তু রাইফেলধারী বিরাট বাহিনীর সঙ্গে মুষ্টিমেয় বিদ্রোহী রিভলভার দিয়ে কতক্ষণ যুদ্ধ চালাবেন? আশ্রয়দাতা গৃহবাসী দু'জন ব্যক্তি ইতিমধ্যে নিহত হয়েছেন। তাঁদের নাম পূর্ণ তালুকদার ও তাঁর ছোট ভাই নিশি

তারকেশ্বর দস্তিদার

তালুকদার। এ ছাড়া নিহত হয়েছেন দলের কর্মী মনোরঞ্জন দাস। নিরপরাধ গৃহস্থদের অনর্থক মৃত্যু প্রতিরোধ করার তাগিদে তারকেশ্বর আত্মসমর্পণ করলেন। কল্পনা দত্ত, তারকেশ্বর দস্তিদার ও গৃহবাসী আরো চার-পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। পুলিশের জয়োল্লাস 'গহিরা' গ্রামের সে-রাতের আকাশেবাতাসে প্রেতধ্বনি ছড়িয়ে দিল।…

কথিত আছে তারকেশ্বর দস্তিদার ধৃত হবার পরে মাস্টারদার পূর্ব-নির্দেশ মত বিনোদ দত্তের উপর দলের নেতৃত্ব এসে যায়। 'চক্রশালা'-র এক বৈঠকে নাকি বিপ্লবীরা বিনোদ দত্তকে 'ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান্ আর্মি'-র অধিনায়করূপে গ্রহণ করেন।…

বিনোদ দত্ত চট্টগ্রাম-বিপ্লবের কর্মকাণ্ড শেষ হয়ে যাবার পর-ও পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে দীর্ঘকাল পলাতক ছিলেন। এটা তাঁর মস্ত কৃতিত্ব। ১১ বৎসর পর তিনি ধরা পড়েন। ইতিমধ্যে বহু সাক্ষীসাবুদ বাতিল হয়ে যেতে বাধ্য। কাজেই তাঁর মাত্র তিন বছরের কারাদণ্ড হয়।…

## বিভীষণ নিধন

"হে মোর সুন্দর, আজ তুমি হও দণ্ডধর,
করহ বিচার!"…

মহানায়ক সূর্য সেন একটা কলঙ্কময় পরিবেশে গ্রেপ্তার হলেন। চট্টলার পশ্চিম দিগন্তে ভারতের স্বাধীনতাকামী-সূর্য ঢলে পড়লেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে অবশ্য এ কিছু অভিনব ঘটনা নয়। রামায়ণের যুগ থেকে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান যুগে যা ঘটে এসেছে তাই ঘটেছে চট্টগ্রামের বুকে। কিন্তু বিপ্লবীর ক্ষমাহীন বিচারে বিশ্বাসহন্তাকে শাস্তি পেতেই হবে। সর্বশক্তিমান বৃটিশের-ও সাধ্য নেই তা' প্রতিরোধ করার।…

হোলো-ও তাই। বিদ্রোহীর গোপন বিচারালয়ে বিচার হয়ে গেল নেত্র সেনের। কিন্তু স্থির হলো যে এ ক্ষেত্রে একটি বুলেটের অপব্যয়-ও অবান্তর।…

সূর্যবাবু গ্রেপ্তার হবার কিছুদিন পরেই বিচারদণ্ড নেমে এলো বিশ্বাসঘাতকের ওপর। নেত্র সেন আহারে বসেছেন। নানাবিধ সুখাদ্যের সুগন্ধে রসনা লোভাতুর। তাঁর স্ত্রী গেছেন রান্নাঘরে নতুন একটা ব্যঞ্জন আনার জন্যে। ফিরে এসেই আতঙ্কিত বিস্ময়ে দেখেন তাঁর স্বামীর মাথাটি পড়ে আছে সুমুখের থালার ওপরে;

দেহ এলিয়ে পড়েছে বসবার আসনে, মাটিতে! কোন্ মৃত্যুদূতের অসির আঘাতে মুণ্ডবিচ্যুত-দেহ থেকে অজস্র ধারায় রক্ত গড়িয়ে যাচ্ছে তা' অবশ্য কেউ জানলো না!...

নেত্র সেনের মৃত্যুদণ্ডে সেদিন পরিতৃপ্ত হয়েছিল দেশের মানুষ। দেশজননী তাঁর অন্তহীন দুঃখের মাঝেও হয়তো কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছিলেন বিংশশতাব্দীর এই মিরজাফরের চরম শাস্তিলাভের দৃশ্য দেখে।...

## মাস্টারদার মৃত্যুদণ্ডের সশস্ত্র প্রতিবাদ

'ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি'-র সর্বোত্তম নেতা, বিপ্লবের মহানায়ক, চট্টলার প্রিয়তম বন্ধু সূর্য সেনের ফাঁসির হুকুম হয়েছে। বৃটিশের এ ঔদ্ধত্য তরুণ-রক্ত সহ্য করবে কী করে? আজ অবশ্য বিপ্লবের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের কেহ মৃত্যুকে বরণ করেছেন, কেহ বন্দী। সাধারণ কর্মীদের বিপুল সংখ্যা কারারুদ্ধ। কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীদের উপরও চলেছে সমান নির্যাতন।

গত আট বছরের পরিসরে সূর্য সেনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশকে চট্টগ্রামে যে দুঃসহ বিরোধিতা নিরস্ত্র ও সশস্ত্র সংগ্রামে পেতে হয়েছে তা এবার শিথিল হয়ে এসেছে। আজ কারাগৃহের অভ্যন্তরে সেই বিদ্রোহ-শক্তি অবরুদ্ধ। আজ বিপ্লব-সংস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার মত শক্তি বাইরে নেই।

ইংরেজ ও তার তাবেদারগোষ্ঠী এখন সুখনিদ্রার স্বপ্নে খুশি।...

কিন্তু তরুণ রক্ত টগ্‌বগ করছে।...

"লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল!"...

*　*　*

চট্টগ্রাম কী করে মেনে নেবে তার অধিনায়ক সূর্য সেনের মৃত্যুদণ্ড? বিদেশী শাসকের এই নির্লজ্জ ব্যাভিচার প্রত্যুত্তরহীন যেতে দেবে চট্টগ্রামের মানুষ? অসম্ভব।...

৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ সাল। নিউমার্কেট পল্টনের মাঠে সাহেবদের ক্রিকেট খেলা চলছে। আকাশ তখন অস্তসূর্যের শেষ আলোয় রঙিন। চট্টলার জীবন-সূর্যও অস্তমিত হবার কাল গুণছেন কারাগারের অন্তরালে!...কিন্তু 'তরুণ হাসির আড়ালে' লুক্কায়িত আগুন আবার চমকে উঠলো মাঠের বুকে। গর্জে উঠল বিদ্রোহীর রিভলভার। সাহেবদের আনন্দকলরব মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। মৃত্যুদণ্ডের

সাগ্নিক প্রতিবাদ জানিয়ে সেদিন সন্ধ্যায় সশস্ত্র রক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ দিলেন বিপ্লবী **নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য** ও **হিমাংশু ভট্টাচার্য**; আহত হয়ে ধৃত হলেন কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন্দ্র চক্রবর্তী। **কৃষ্ণ চৌধুরী** ও **হরেন্দ্র চক্রবর্তী** ফাঁসির মঞ্চে জীবন দিয়ে 'জীবন'কে প্রতিষ্ঠিত করেন।...

## স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের বিচার

'চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন ষড়যন্ত্রে'-র বিচারপর্বের স্তরে স্তরে বিদ্রোহের রোমাঞ্চকর ইতিহাস উদ্ঘাটিত হতে থাকায় সমস্ত ভারতবর্ষ উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতিদিন অপেক্ষা কোরতো কোর্টের রিপোর্ট পাবার জন্যে।

এই মামলাকে জীবন্ত করে রেখেছিলেন দেশনেতা এবং ভারত বিখ্যাত ব্যারিস্টার শরৎচন্দ্র বসু তাঁর অপূর্ব সাহস ও আইনজ্ঞতার প্রাচুর্যে। তা' ছাড়া নিঃশঙ্ক বন্দীবীরদের কাঠগড়ায় প্রতিদিবসের উপস্থিতির মধ্যে যে অভিনবত্ব বিচ্ছুরিত হতে থাকতো তা মামলার সর্বাঙ্গে একটি বিভা দান করেছিল।

এ মামলায় কংগ্রেস-নেতা ও য়্যাড্‌ভোকেট সন্তোষ বসুর অবদানও যথেষ্ট।

বিচারকালে বিপ্লবীদের শৌর্য, কর্মকুশলতা, দেশপ্রেম, সংকল্পে দৃঢ়তা ও ত্যাগ-বরণের বার্তা প্রকাশিত হতে থাকে। সকল সংবাদপত্রই এসব সংবাদ ছাপিয়ে সাংবাদিকতার মর্য্যাদা রক্ষা করলেও এ-বিষয়ে চট্টগ্রামের 'দৈনিক পাঞ্চজন্যে'-র অবদান অতুলনীয়। যে নির্ভীকতা ও দেশপ্রীতির তাগিদে 'পাঞ্চজন্য' প্রতিদিন তার কাজ করে যাচ্ছিল তার প্রতিদানে তার ভাগ্যে জোটে অসীম অত্যাচার। রুষ্ট পুলিশের দৌলতে পাঞ্চজন্যের প্রেসটি তালাসীর ওজুহাতে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়। প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় নির্যাতন ভোগ করেন অশেষ; জামিন বাজেয়াপ্ত হয় কতোবার।...পাঞ্চজন্যের প্রাণকেন্দ্র মহিমচন্দ্র দাস এবং তার সম্পাদক অম্বিকাচরণ দাসের কীর্তি অভ্রংলিহ হয়ে আছে।

* * *

'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' মামলা পর পর তিনটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল দ্বারা প্রায় দু'বছরে সমাপ্ত হয়।...

(ক) **প্রথম স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল**-এর সভাপতি ছিলেন চট্টগ্রামের জেলা জজ মিঃ ইয়ুনি।

বিচারে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত, ফণীন্দ্র নন্দী,

সুবোধ চৌধুরী, সহায়রাম দাস, ফকির সেন, লালমোহন সেন, সুবোধ রায়, সুখেন্দু দস্তিদার ও রণধীর দাসগুপ্ত দোষী সাব্যস্ত হলেন। তাঁদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হলো। তবে অপ্রাপ্তবয়স্ক বলে ফকির, সুবোধ, সুখেন্দু ও রণধীরের প্রতি সরকার ইচ্ছা করলে দয়া প্রদর্শন করতে পারেন এ সুপারিশ-ও ট্রাইব্যুনাল করে দিলেন।

১৯৩২ সালের ১লা মার্চ রায় বের হলে দেশবাসী বড়ই সোয়াস্তি বোধ করেছিল। কারণ তাদের ভয় ছিল যে, অধিকাংশেরই হয়তো ফাঁসির দণ্ড হয়ে যাবে!...

(খ) **দ্বিতীয় স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল**-এর সভাপতি হলেন চট্টগ্রামের তদানিন্তন জেলা জজ মিঃ উইলিয়াম্‌স। আসামী হলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, হেমেন্দু দস্তিদার ও সরোজ গুহ। ১৯৩৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি অম্বিকাবাবুর ফাঁসির হুকুম হলো, সরোজ গুহর হলো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং হেমেন্দু পেলেন মুক্তি।

হাইকোর্টে অম্বিকাবাবুর সাজা কমে গিয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

(গ) **তৃতীয় স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল**-এব বিচার জেলের অভ্যন্তরে তুকতাক মন্ত্রে সমাপিত হলো। কা-- বিদ্রোহী-সিংহ সূর্য সেনকে খাঁচা থেকে বের করে কোর্টে নিত্য নিয়ে-আসা ও নিয়ে-যাওয়ার ব্যবস্থা করতে ভরসা পেল না জাঁদরেল বৃটিশ-শক্তি। লোকচক্ষুর অন্তরালে কো.র্ট বসিয়ে অতি সাবধানে বিচারের প্রহসন শেষ করা হয়। এই মামলার আসামী ছিলেন সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা, তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত।

ট্রাইব্যুনালের রায় অনুসারে ১৯৩৭ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদার ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত হন। কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। কল্পনা দত্ত অবশ্য দীর্ঘ ছয় বৎসর তাঁর মেয়াদ ভোগ করার পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় রাজনৈতিক-বন্দীদের সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন।...

## মাষ্টারদার ফাঁসি

"আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগোরে সকল দেশ।"

ইংরেজের বীরত্বের পরিচয় ইতিহাসে প্রচুর! বীরের সম্মানদানেও তার কার্পণ্য দেখি নি জালালাবাদের বধ্যভূমিতে মৃত্যুস্পর্শে শায়িত বিদ্রোহী বীরদের প্রতি। হোক না শত্রু—তবু তাঁদেব উদ্দেশে বীরের সম্মান দিয়েছিলেন বৃটিশ-ফৌজ।…কিন্তু দুঃখের বিষয় ইংরেজের নীচতা ও কাপুরুষতার পরিচয়-ও পরাধীন ভারতের ইতিহাসে রয়েছে যথেষ্ট। এই নীচ কাপুরুষতার ফাটল ধরেই আজ তার সাম্রাজ্য খানখান হয়ে গেছে।…

বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেনকে গ্রেপ্তার করে ইংবেজ খুশি হবে, আনন্দোৎসব করবে—এ আমরা বুঝি। কিন্তু আমরা বুঝি না—বিপুল শক্তির প্রয়োগে এই বিদ্রোহী পুরুষকে শৃঙ্খলিত কবার পর তাঁর ওপরে অমানুষিক নির্যাতন কবার রুচি! এত বড বীব, জাতির কল্পনান্তরে যাঁর আসন মহান মানবের—তাঁকে কিনা বর্বরের মত অর্ধনগ্ন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় পায়ে হাঁটিয়ে গৈরলার আশ্রয়-কেন্দ্র থেকে 'পটিয়া' ক্যাম্প পর্যন্ত প্রহারে প্রহারে জর্জবিত করে নিয়ে এসেছিল বৃটিশেব পুলিশ ও জেলাকর্তাব দল! রক্তাক্ত অবসন্ন দেহে গায়ে-মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় মাস্টারদাকে যখন থানা থেকে টেনে বের করে ট্রেনযোগে চট্টগ্রাম শহরে এনে জেলে ঢোকান হল, তখন দেশ জেনে ফেলেছে যে তার শালগ্রামশিলা দস্যুর পদাঘাতে চূর্ণিত।‥

*　　*　　*　　*

১৯৩৪ সালেব ১২ই জানুয়ারি। রাত ১২টা বেজে গেছে। স্তূপীকৃত-অন্ধকার কারাগৃহের সর্বাঙ্গে বিজড়িত।…বিদ্রোহীব রাজা সূর্য সেন তাঁর নির্জন সেলে নিদ্রাচ্ছন্ন। ফাঁসির হুকুম প্রেয়সীর চুম্বনের মত তাঁর দুটি চোখে আচ্ছন্নতা এনেছে। মৃত্যুঞ্জয়ীর বিবস শ্রবণে সেই সঙ্গীত:

"হিয় হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন,
অতুলন তোঁহার লেহ॥…"

সহসা বিদ্রোহীর ঘুম ভেঙে গেল। অসময়ে সেল্-এর দ্বার খোলার শব্দ কেন? ভারী বুটের শব্দ-ও শোনা যাচ্ছে? অনেকগুলো মানুষের অস্তিত্বে নৈশ-স্তব্ধতা

যেন লাঞ্ছিত!...পূর্বাহ্নে তো কিছুই জানান হয় নি?...সান্ত্রী ঘরে ঢুকে জানাল সংবাদ। ডাক পড়েছে সূর্য সেনের ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলে পড়বার! ...এ কি সেই 'মরণ' যাকে বলা চলে ঃ

"তুমি চুরি করে কেন এস চোর,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ?"...

কারাগৃহ তখনো নিঝুম। পাষাণপুরীর স্তব্ধ রাতে হাজার কয়েদী নিদ্রাতুর। সশস্ত্র সান্ত্রীদল মাস্টারদাকে সেলের বাইরে নিয়ে এল। নিয়ে এলো সেলের বাইরে তারকেশ্বর দস্তিদারকেও। উভয়ের কণ্ঠ থেকে উদাত্তস্বরে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উৎক্ষিপ্ত হয়ে তীরের মত ছুটে গিয়ে হাজার বন্দীর কানে পৌঁছল। হাজার কণ্ঠে বারে বারে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল মহামন্ত্র 'বন্দেমাতরম্'। রাজনৈতিক বন্দী, সাধারণ কয়েদী, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃস্টান সকল অবরুদ্ধ মানুষ সেই মন্ত্রোচ্চারে সে-নিশীথে উন্মাদ হয়ে উঠল। জেলের আকাশ-বাতাস দীর্ণ করে ধ্বনি-বলাকা চট্টগ্রামের পাহাড়-নদী-বনের শীর্ষে গগন জুড়ে ভেসে চলল। নিদ্রিত শহরের ঘুম গেল ভেঙে। সবার কণ্ঠে নীরবে ও সরবে বেজে উঠেছে ঐ মন্ত্র। চোখে নেমেছে জল। তাঁদের প্রিয়তম বন্ধু ও নেতাকে বর্বর ইংরেজ গলা টিপে মেরে ফেলছে। ঐ ভেসে আসে তাঁর শেষ নিশ্বাস পরিমল।...

পূর্বেই বলেছি ইংরেজের কাপুরুষতার অন্ত নেই। তার পশুর মত ব্যবহার তাকে বারেবারে হেয় করেছে. আজও অন্যথা ঘটল না। শৃঙ্খলিত দু'টি বীর, ক্ষীণদেহী সূর্য সেন ও তরুণ তারকেশ্বর বধ্যভূমিতে নীত হচ্ছেন।...গল্‌গথার বুকে ক্রুশ কাঁধে চলমান যীশুর কথা মনে পড়ে বর্বর রাজশক্তি যে-ক্রুশে মহামানবকে বিদ্ধ করা হবে সেই মস্ত ভারী ক্রুশই তাঁর কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিল জানি। আরো জানি যে পথে পথে তাঁকে অসহ্য অপমান সইতে হয়েছিল। কিন্তু তথাপি তাঁর 'ভগবান'কে তাঁর কণ্ঠ থেকে ছিনিয়ে নেবার অপচেষ্টা করে নি রোমান 'পিলেট্'-এর দলবল। অথচ এই বিংশশতাব্দীর বুকে বসে সভ্যতাবিলাসী-বৃটিশ কারাগৃহের পথযাত্রায় বিদ্রোহীদ্বয়ের কণ্ঠ থেকে 'বন্দেমাতরম্'-মন্ত্রটুকু কেড়ে নেবার জন্যে কী পাশবিকতার পরিচয়ই না দিল! সেল্ থেকে ফাঁসি-মঞ্চের পথ, কতটুকু তার দূরত্ব? কিন্তু এই পথকে বিষাক্ত ও বিলম্বিত করে দিল মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে মারপিট করার দানববুদ্ধি।...এই কাপুরুষের দল ভুলে

গিয়েছিল যে মাস্টাবদাদেব মত লৌহমানব তো দূবেব কথা, বিপ্লবীশিশু সুশীল সেনেব মত একটি বালককে-ও "দুর্ধর্ষ" বাজশক্তি ১৯ ৭ সালে বেত মেবে "মা" ভোলাতে পাবে নি। সেসব বালকবীবদের বন্দনায়ই কাব্যবিশাবদ গেয়ে উঠেছিলেন, "বেত মবে কি মা ভুলাবে, আমি কি মাযেব তেমন ছেলে ? "

সুশীল সেন

*   *   *

ফাঁসিব মঞ্চে আবোহণ কবলেন তাবা। কণ্ঠে তখনো 'বন্দেমাতবম্'। তাব প্রতিধ্বনি বেজে যাচ্ছে দিকে দিকে।...তাবপব সহসা থেমে গেল ফাঁসিমঞ্চ থেকে-আসা সকল শব্দ। ঝুলে পড়েছে বীবেব তনু অতনুব স্পর্শকামনায।

মৃত্যু হলো মাস্টাবদাব।

মৃত্যু হলো তাবকেশ্বব দস্তিদাবেব।

তন্মুহূর্তে বেঁচে উঠলেন তাবা দেশকালপবিসবে বিশ্বেব নির্যাতিত মনুষ্যেব অন্তবে, পৃথিবীব বীবহৃলো ভীব হৃদয়ে।

যীশুব "ইন সাবেকশান" বিপ্লবীব চবণচ্ছন্দে, শহিদদেব পদযাত্রায় এভাবেই সবযুগে দেশেদেশে সংঘটিত হযে আসছে।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## প্রচণ্ড শৌর্যে সুন্দর বিপ্লবকাল

১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সাল। বাংলার বিপ্লব-ইতিহাসে এই পাঁচ বৎসর এক গৌরবময় কাল। বাঙালীর ছেলে ও মেয়েরা সাহসে, নিয়মানুবর্তিতায়, আত্মবিলয়নে ও দুঃখবরণে দুর্জয় হয়ে এই কালে যে ব্যাপকতর রণসজ্জা রচনা করেছিলেন তা অপরূপ। পূর্বে আমরা এমনটি দেখি নি। বিদ্রোহের আগুন প্রথম জ্বলে ওঠে চট্টগ্রামে। সে-আগুন ছড়িয়ে যায় সারা বাংলায়। তার দাহ বিহার-উত্তরপ্রদেশ-মহারাষ্ট্র-পাঞ্জাবকে স্পর্শ করে। বাংলার সমগ্র যুবসমাজ প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষে এতে জড়িয়ে যায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এমন একটি পরিবারও ছিল না যারা কোনভাবে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে না-এসেছে। পুলিশের অত্যাচার প্রতিদিন তীব্রতর হয়ে প্রতিটি পরিবারের উপর বর্ষিত হয়েছে। সে যুগে বাংলা দেশ কাযত একটি বিরাট মিলিটারি ক্যাম্পে পরিণত হয়। সামরিক আইন-ই প্রকৃতপক্ষে শাসনভার গ্রহণ করেছিল।

মহাত্মা গান্ধীর আইন-অমান্য-আন্দোলন সারা ভারতবর্ষকে দিয়েছিল চৈতন্য, স্বাজাত্যবোধ এবং দেশসেবার আদর্শ। ভারতবাসী 'একটি জাতিতে' পরিণত হয়ে ইংরেজকে অবাঞ্ছিত পরস্বাপহারী রূপে ভাবতে শিখেছিল, ইংরেজের শাসনকে অমান্য করে যে-কোন দুঃখবরণে প্রস্তুত হয়েছিল।...

বাংলার কংগ্রেস বিপ্লবীদেরও কংগ্রেস। এখানে তাই অহিংস ও সহিংস মতবাদের মধ্যে তেমন ব্যবধান খুঁজে পাওয়া যেত না। বাঙালী উভয় পথকে সাদরে গ্রহণ করেছিল—কারণ, তাদের একমাত্র কাম্য ছিল স্বাধীনতা লাভ।

কাজেই এই পাঁচ বৎসর ধরে অন্তত বাংলা দেশের জমিতে কংগ্রেসের অহিংস-সংগ্রাম ও বিপ্লববাদীদের সহিংস-সংগ্রাম পরস্পরের পরিপূরক রূপে কাজ করেছে। 'কংগ্রেস' লোকের ঘরে-ঘরে যেয়ে ইংরেজ-বিতাড়নের পথ জানিয়ে দিয়েছে দুর্বলতম মানুষকেও, আইন-অমান্যের মাধ্যমে। গণ-আন্দোলন যখন পুলিশের মারের চোটে স্তব্ধ ও হতাশালাঞ্ছিত, তখন বিপ্লবীর প্রচণ্ড আঘাতে ইংরেজের শক্তিকেন্দ্রগুলো ধ্বংসে যাচ্ছে। শক্তিধর ইংরেজ-রাজপুরুষেরা হয় গুলীবিদ্ধ-অবস্থায়

পথের ধুলোয় গড়িয়ে পড়ছে, নয়তো ভ্রমে পালিয়ে যাচ্ছে বিলেতে, নিজেদের দেশে! ফলে সমগ্র দেশবাসী বৃটিশবিদ্বেষী হয়ে সহিংস-অহিংস যেকোন বৃটিশদ্রোহী-আন্দোলনকেই বরণ করে নিয়েছে। তাতে চরম দুর্ভোগ দেশবাসীরই হয়েছে। চরম ত্যাগস্বীকার দেশবাসীই করেছে। বাংলার বিপ্লব ও বিপ্লবীরা জনসমর্থন পেয়েছেন প্রচুর। সেই সমর্থনের জন্য জনগণ পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর পাশবিক-অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছেও প্রচুর।

'তিরিশ-চৌত্রিশের' বিপ্লবকালের সুরু হলো আইরিশ 'ঈস্টার-বিদ্রোহে'র পুণ্য তারিখে—অর্থাৎ ১৮ই এপ্রিল রাত দশটায়। ১৯৩০ সালের ঐ রোমাঞ্চকর নিশীথে চট্টগ্রামের বুকে বাংলার বিদ্রোহীদের দুর্জয় অভিযানের কথা আমরা বলেছি। এই অভিযানে মুগ্ধ 'বেণু'-পত্রিকা লিখলেন—"ভাঙ, ভাঙ শৃঙ্খল।" 'স্বাধীনতা' সাপ্তাহিক লিখলেন—"ধন্য চট্টগ্রাম"। ··উভয় কাগজেই বিপ্লবী-বাংলা তথা বাংলার আপামর তরুণ-তরুণীর কাছে দৃপ্ত আবেদন বেরুতে লাগল বিদ্রোহের পথে বেরিয়ে পড়বার।···

১৮ই এপ্রিলের পরই বাংলার সর্বদলের তরুণ-বিপ্লবীদের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। প্রবীণ বিপ্লবীরাও আর সাবধানী-পথিকের মত পা বাড়াতে পারছিলেন না। কাজেই বনেদী বিপ্লবীদল 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর পার্টি' বেকায়দায় পড়ে গেল। এদিকে তরুণেরা ক্ষিপ্ত, অথচ প্রবীণেরা 'প্রস্তুতি' নেই বলে তাঁদের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছেন না।···

* * * *

'অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনে'র অব্যবহিত পরেই দলনির্বিশেষে প্রবীণ বিপ্লবীনেতাদের অধিকাংশকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। বাকি যাঁরা দু'চারজন বাইরে আছেন তাঁদেরও দিন ঘনিয়ে আসছে। তাঁরা ভাবছেন—কিছু না করেই আবার জেলে ঢোকার চেয়ে যে-বিদ্রোহ শুরু হয়েছে তাতে শরিক হওয়াই তো ভাল।···

কাজেই দেখা গেল, সকল দলই নিজের নিজের প্রস্তুতি মত বিরাট এই কর্মকাণ্ডে ক্রমশ যোগ দিলেন। বিদ্রোহ-বহ্নি ব্যাপকতর হয়ে সারা বাংলায় জ্বলে উঠল। প্রবীণ আর তরুণের মধ্যে কোন মতের পার্থক্য রইল না। কাজেরও না।...

'চট্টগ্রাম-বিদ্রোহে'র কর্মতালিকা ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ হয়েছে। পরে আমরা 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' নামক বিপ্লবীদলের কর্ম-ইতিহাসও প্রকাশিত করব। এ

ছাড়া অপবাপব দলগুলোব উল্লিখিত পাঁচটি বৎসবেব কর্মতালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

[ এ প্রসঙ্গে আমবা 'বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রন্থখানাব সাহায্য গ্রহণ কবেছি। ] আমবা দেখি :—

(১) **১৯৩০ সালের** ৮ই ফেব্রুযাবী কিশোবগঞ্জ ( ময়মনসিংহ ) বামানন্দ ইউনিয়ান স্কুলেব শিক্ষককে পুলিশেব লোক বলে হত্যা কবা হয়।

(২) ১৩ই মে হাওড়া শিবপুব থানাব এক দাবোগাব গৃহে বিপ্লবীবা একটি বোমা ফেলেন।

(৩) ১৯শে জুলাই বংপুব জিলাব গাইবান্ধা শহবে গাইবান্ধা বোড অতিক্রম কবাব কালে পুলিশকর্মচাবীদেব উপব বোমা নিক্ষেপ কবা হয।

(৪) ২বা আগস্ট ময়মনসিংহ সবকাবী-গুদাম-লুণ্ঠন মামলাব একজন আসামীকে গ্রেপ্তাবকালে একজন কনেস্টবল গুলীতে আহত হয়।

(৫) ২৫শে আগস্ট ডালহৌসি স্কোযাবে কলকাতাব পুলিশ কমিশনাব চার্লস টেগার্টকে লক্ষ্য কবে বোমা নিক্ষেপ কবা হয। টেগার্ট আহত হন নি। বোমা ফেলতে গিয়ে বিপ্লবী **অনুজা সেন** নিজেব হাতেব বোমা ফেটে গুরুতব আঘাতে মৃত্যুববণ কবেন। তাঁব সাথী **দীনেশ মজুমদার** ঘটনাস্থলে গ্রেপ্তাব হন।

দীনেশ মজুমদাব

দীনেশচন্দ্র দীর্ঘ মেয়াদ নিয়ে মেদিনীপুব জেলে অবস্থানকালে জেল থেকে পালিয়ে যান, এবং নানা বিপ্লবকর্মেব মধ্যে জড়িত থাকাব সময় পুনবায় ধবা পড়েন। বিচাবে তাঁব ফাঁসিব হুকুম হয়। বিদ্রোহী বীব ১৯৩৪

সালের ৯ই জুন ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেন। বীরের এ রক্তদান কোন 'শোধ' চায় না। এ যে—

"শুধু দাবিহীন দান
আগামী দিনের মুখে রক্তিমা ফোটাতে।"
(প্রেমেন মিত্র)

ডালহৌসি-বোমা-নিক্ষেপেব ব্যাপারে ডাঃ নারায়ণ রায়, ডাঃ ভূপাল বসু, রসিক দাস, অদ্বৈত দত্ত, রোহিনী অধিকারী প্রমুখ বিপ্লবীরা পরে গ্রেপ্তার হন। তাঁদেরকে বোমা-তৈরি ও টেগার্ট-হত্যার ষড়যন্ত্র মামলায় সোপর্দ করা হয়। পুলিশ হাজতে দিনের পর দিন তাঁদের ওপর অকথ্য পুলিশী-নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে যায়। বিচারে সকলেরই কঠিন দণ্ড হয়। কেবল, চেষ্টা করেও রসিক দাসকে আটকাতে না পেরে পুলিশ তাকে রাজবন্দী করে। তাকে 'স্টেট্ প্রিজনার' করে পেশোয়ার সেণ্ট্রাল জেলে পাঠান হয়।

(৬) ২৬শে আগস্ট কলকাতা জোড়াবাগান পুলিশ কোর্টের প্রাঙ্গণে একটি বোমা ফেলা হয়।

(৭) ২৭শে আগস্ট কলকাতা ইডেন গার্ডেনের পুলিশ-ফাঁড়িতে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

(৮) ২৯শে আগস্ট দেশবন্ধু পার্কে (কলকাতা) রতনভূষণ হাজরা নিহত হয়।

(৯) ৩০শে আগস্ট ময়মনসিংহ শহরে ময়মনসিংহের গোয়েন্দা বিভাগীয় ইন্‌সপেক্টর পবিত্র বসুর গৃহে বোমা ফেলা হয়।

(১০) ২৩শে সেপ্টেম্বর খুলনার থানা প্রাঙ্গণে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

(১১) ১৩ই অক্টোবর ময়মনসিংহ জেলার গোয়েন্দা-বিভাগীয় সাব-ইনস্‌পেক্টর ও তার দেহরক্ষী ওয়্যারহাউস-লুণ্ঠন মামলার দু'জন পলাতক বিপ্লবী আসামীকে গ্রেপ্তার করার কালে গুলীবিদ্ধ হয়।

(১২) **১৯৩১ সালের** ২৩শে ফেব্রুয়ারী বরিশাল জেলার গোয়েন্দা বিভাগীয় সাব-ইনস্‌পেক্টরের গৃহে একটি বোমা পড়ে।

(১৩) ১৭ই মার্চ নদীয়া জেলার গোয়েন্দা-বিভাগীয় ইনস্‌পেক্টরের গৃহেও একটি বোমা ফেলা হয়।

(১৪) ১৭ই মার্চ পর পর বোমা পড়ে নদীয়া কোতয়ালি থানায় এবং পুলিশ সুপারের বাংলোয়।

(১৫) ২৪শে এপ্রিল 'রয়েল ক্যালকাটা গল্‌ফ্ ক্লাবে' একটি বোমা ফেলা হয়।

(১৬) ২৭শে জুলাই আলিপুর জেলা ও সেসন জজ্ মিঃ গার্লিক নিহত হন। তিনি দীনেশ গুপ্তের বিচারার্থ ট্রাইব্যুনালের সভাপতি ছিলেন। [ বিশদ বিবরণ পরে দেওয়া হয়েছে। ]

(১৭) ২১শে আগস্ট টাঙ্গাইলে ( ময়মনসিংহ ) ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার মিঃ ক্যাসেলস-এর প্রাণনাশের চেষ্টা হয়।

(১৮) ৯ই সেপ্টেম্বার বর্ধমান কালনা থানায় একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

(১৯) ১০ই সেপ্টেম্বর বর্ধমান মেমারি থানায় কমাণ্ডিং-অফিসারের গৃহে একটি বোমা পড়ে।

(২০) ১১ই নভেম্বর ময়মনসিংহ সেরপুর মহকুমার ইন্সপেক্টর ...োরঞ্জন চৌধুরীকে গুলী করে হত্যার চেষ্টা হয়।

(২১) ৩০শে ডিসেম্বর মানিকতলা ডাকাতি-মামলার প্রধান সাক্ষী গৌরীবাড়ি লেনে আক্রান্ত হয়।

(২২) **১৯৩২ সালের** ১৯শে জানুয়ারী ঢাকার সার্জেন্ট বোর্নকে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে জখম করে তার পিস্তলটি বিপ্লবীরা কেড়ে নেন।

(২৩) ২২শে জানুয়ারী হাওড়া-আমতা রেলওয়ের পাতিহাল-স্টেশনে হাওড়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের রেলগাড়ির কামরায় বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

(২৪) ৬ই ফেব্রুয়ারী সেনেট হাউসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে গভর্নর স্টানলি জ্যাকসনের ওপর গুলীবর্ষণ হয়। [ ইহার বিশদ বিবরণ পরে দেওয়া হয়েছে। ]

(২৫) ১১ই মার্চ মুর্শিদাবাদে কান্দি মহকুমা-অফিসঘরে একটি বোমা ফেলা হয়।

(২৬) ২৮শে মার্চ রংপুর লালমণিরহাট সেটেলমেণ্ট অফিসারদের পিস্তলগুলি লুঠ করার উদ্দেশে তাঁদের ক... আগুন দেওয়া হয়।

(২৭) ২১শে এপ্রিল মার্টিন কোম্পানীর 'মিশন রো আপিসবাড়ি'র গুদামে একটি বোমা বিস্ফোরণ হয়।

(২৮) ২৬শে মে ঢাকা লাটপ্রাসাদের সম্মুখে কনেস্টবল গার্ডের ওপর হামলা করে তার পিস্তলটি বিপ্লবীরা ছিনিয়ে নেন। কনেস্টবল নিহত হয়।

(২৯) ১২ই জুন ই-বি রেলওয়ের রাজবাড়ি স্টেশানে একটি ট্রেনে বোমা

নিক্ষিপ্ত হয়। সেই ট্রেনে ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ-সুপার ভ্রমণ করছিলেন।

(৩০) ২৭শে জুন ঢাকা শহরে সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কুখ্যাত কামাখ্যা সেনকে উয়াড়ীতে তাঁর বন্ধুগৃহে গুলীবিদ্ধ করে নিহত করা হয়। আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটরূপে এই ব্যক্তি বিক্রমপুরেব কংগ্রেস-কর্মীদের ওপর অসম্ভব অত্যাচার করেন বলেই বিপ্লবীদের বিধানে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা হয়। এ সম্পর্কে পরে **কালীপদ মুখার্জি** নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে ফাঁসির হুকুম হয়। বীরের মাধুর্যে তরুণ-বিপ্লবী ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুকে স্পর্শ করেন ১৯৩৩ সনের ২২শে জানুয়ারী।

(৩১) ৫ই আগস্ট চৌরঙ্গীতে 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ওয়াটসন্‌কে গুলী করার প্রথম চেষ্টা হয়। গুলী নিক্ষেপ করেই কাজ হাসিল হয়ে গেছে ভেবে বিপ্লবী **অতুল সেন** 'সায়ানাইড' খেয়ে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করলেন। কিন্তু ওয়াট্‌সন বেঁচে গেলেন।

(৩২) ২৮শে সেপ্টেম্বর কলকাতা ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে আবার স্টেটস্‌ম্যান-সম্পাদক মিঃ ওয়াটসনের ওপর গুলী চলে। এবারকার আক্রমণের চেষ্টা কিছু অভিনব ছিল।...রাস্তা দিয়ে ওয়াট্‌সনের মোটর ছুটেছে, তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে আর একখানা মোটর। পাশাপাশি আসতেই চলন্ত অবস্থায় দ্বিতীয় গাড়ি থেকে গুলী ছুটে এলো। ওয়াট্‌সনের গাড়ির জানলা দিয়ে। কানের পাশ দিয়ে বোঁ-ও কোরে বেরিয়ে গেল বিপ্লবীর বুলেট। ওয়াট্‌সন বেঁচে গেলেন, কিন্তু বৃটিশের মান বাঁচলো না। বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ ও বৃটিশ-বণিককুলেব মুখপত্র-সম্পাদককে ভারতবর্ষে রেখে প্রাণে বাঁচানোর ক্ষমতা নেই বলেই ইংরেজ তাঁকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিল বিলেতে।

(৩৩) ১৮ই নভেম্বর রাজসাহী শহরে জেল-সুপার্‌ মিঃ লিউককে গুলী করে আহত করার অপরাধে ভোলানাথ কর্মকারের সাজা হয়।

(৩৪) **১৯৩৩ সালের** ৯ই জানুয়ারী এক নং ডসেট-বাহিনীর মিঃ ফ্ল্যাভেলের পিস্তল কেড়ে নেবার জন্যে তাকে আক্রমণ করা হয়।

(৩৫) ২২শে মে ১৩৬ বি, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটের পলাতকদের আস্তানা পুলিশ ও সৈন্যদল ঘিরে ফেললে পলাতক বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার, নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখার্জির রিভলভার গর্জে ওঠে। স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইনস্‌পেক্টর এম, ভট্টাচার্যের

বিশেষ আঘাত লাগে। কিছুক্ষণ সংঘর্ষের পর বিপ্লবীরা ধরা পড়েন। তাঁদের মধ্যে দীনেশ মজুমদার ও নলিনী দাস জেল-পলাতক ছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দীনেশ মজুমদারের ফাঁসি হয় ১৯৩৪ সালের ৯ই জুন।

(৩৬) ২৮শে অক্টোবর পনের জন সশস্ত্র যুবক দিনাজপুরের হিলি-রেলওয়ে-স্টেশান আক্রমণ করে মেলব্যাগ ও নগদ টাকা সবলে সংগ্রহ করেন। ডাকপিয়নটি নিহত হয় এবং চারজন কুলি ও একটি মেকানিকের দেহে আঘাত লাগে। সেদিনই পথে সাতজন বিপ্লবী ধরা পড়েন। বিচারে প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী ও হৃষীকেশ ভট্টাচার্যে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। আরো অনেকে দীর্ঘ কারাদণ্ড লাভ করেন।

(৩৭) **১৯৩৪ সালের** ৬ই মে শিবপুর (হাওড়া) থানায় বোমা ফেলা হয়।

* * * *

১৯৩৪ সালের পর বাংলা তথা ভারতবর্ষে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ স্তিমিত হয়ে আসে। ১৯৩৫ '৩৬ সালে 'আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা' ও 'টিটাগড-ষড়যন্ত্র-মামলা'র মধ্যেই বাংলা ও ভারতের বিপ্লবচেষ্টা থেমে যায়। অবশ্য আন্তঃপ্রাদেশিক ও টিটাগড়-ষড়যন্ত্র মামলা বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। এ দুটো মামলায় দীর্ঘকালীন কারাদণ্ড লাভ করেন পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত (পূর্ণানন্দবাবু আলিপুর জেল থেকে পলায়ন করে পলাতক ছিলেন), প্রফুল্ল সেন, ধনেশ ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন ঘোষাল প্রমুখ 'অনুশীলন সমিতি'র কর্মিবৃন্দ। এ ষড়যন্ত্রে শ্রীমতী পারুল মুখার্জিও সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতা হন। তিনি পলাতক অবস্থায় ধরা পড়েছিলেন।...যা হোক, ইতিমধ্যে সমস্ত সংগ্রাম স্তব্ধ হয়ে গেছে। বাংলার যৌবন কারারুদ্ধ। দেশ সামরিক-শাসনে জর্জরিত। শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভাষায়—"বাংলার লোকেরা বাহিরের বৃহত্তর কারাগারে আজ বাস করছে!"...ইংরেজ তখন কঠোর হস্তে দেশ জুড়ে শ্মশানের শান্তি স্থাপন করেছে।...কিন্তু প্রখ্যাত বৃটিশ-রাজনীতিকরা বুঝে ফেলেছিলেন যে, বৃটিশের বিরুদ্ধে এতো বেশি ঘৃণা ইতিপূর্বে ভারতবাসীর অন্তরে দানা বেঁধে ওঠে নি।...বৃহত্তর বিপ্লবের মেঘ দূর গগনে সঞ্চারিত হচ্ছে বলেও বিজ্ঞজন অভিমত প্রকাশ করেছেন।...

* * * *

বাংলা দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বিপ্লব-আন্দোলন তীব্রতায় কম হলেও ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে যুক্তপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব বা

মহারাষ্ট্র একেবারে চুপ করে বসে থাকে নি। এসব প্রদেশের বিপ্লবীদের কার্যকলাপ থেকে কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করব।

**মহারাষ্ট্র** ঃ—১৯৩১ সালের ২২শে জুলাই। পুনার ফারগুসন কলেজের ছাত্র **গোটে** তৈরি হয়ে আছেন বিপ্লবীর দুর্জয় সংকল্প নিয়ে। তিনি জানেন যে, গভর্নর স্যার আরনেস্ট হটসনের কাছাকাছি তিনি যেতে পারবেনই সভার প্রারম্ভে বা শেষে।...পেয়ে গেলেন সুযোগ। বিপ্লবী গোটের বিলম্ব হলো না। গুলী এসে লাগলো গভর্নরের বুকে-পরানো মোটা ফাউণ্টেন পেনের বাঁটে। ঠিকরে বেরিয়ে গেল বুলেট। বেঁচে গেলেন লাট। কিন্তু অসহ্য নির্যাতন ও দীর্ঘকালীন কারাদণ্ড লাভ করলেন বীর মারাঠী বিপ্লবী 'গোটে'।

**যুক্তপ্রদেশ** ঃ—১৯৩১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী। আলফ্রেড পার্কে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে **চন্দ্রশেখর আজাদের** মৃত্যুবরণ এবং ১৯৩২ সালের ২৩শে জানুয়ারী আইরিশ মহিলা-বিপ্লবিনী **সাবিত্রীদেবীর** গৃহে পলাতক বিপ্লবী **যশপালের** সঙ্গে পুলিশের যুদ্ধ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দু'টি সংঘটনা।...

**বিহার** ঃ—১৯৩০ সালের ১৩ই অক্টোবর জামালপুরে ছোট্ট একটি পুলিশ দলের সঙ্গে তিনজন বিপ্লবীর সংঘর্ষে উভয় পক্ষে গুলীবর্ষণ হয়। কিন্তু বিপ্লবীরা পালিয়ে যান।....

১৯৩১ সালের ২৮শে জুন পাটনায় দু'জন বিপ্লবী বোমা নিক্ষেপ করে একজন সাব্-ইন্সপেক্টর ও একজন হাবিলদারকে মারাত্মকভাবে ঘায়েল করেন।...

**পাঞ্জাব** ঃ—১৯৩০ সালে অমৃতসর, লায়ালপুর, ঝঙ্গ, লুধিয়ানা, রাওয়ালপিণ্ডি, লাহোর, গুজরানওয়ালা, শেখুপুরা প্রভৃতি স্থানে পুলিশের নানা আস্তানায়, ইউরোপীয় অফিসারদের ক্লাবে বা গৃহে, রেলপথের ওপর অথবা ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করে বিপ্লবীরা অনেকবার শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করেন। কিন্তু এ বৎসর তাঁদের অনুষ্ঠিত বিপ্লবাত্মক কাজগুলোর মধ্যে একটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তার উল্লেখ করছি।...

সেদিন ২৩শে ডিসেম্বর। লাহোরে, সমাবর্তন-উৎসব সমাপ্ত করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হচ্ছেন পাঞ্জাবের গভর্নর মিঃ মণ্ট্ মোরেন্সি।...ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে এলেন একটি তরুণ।...চকিতে গবর্নর আহত হলেন বিপ্লবীর রিভল্ভারের গুলীতে। হুলুস্থুল পড়ে গেল। বিপ্লবীর বুলেটে একটি পুলিশ ইন্সপেক্টর, একটি সাব্-ইন্স্পেক্টর ও দু'জন মহিলার দেহে আঘাত লাগে। বিপ্লবী ঘটনাস্থলেই ধৃত

হন। তাঁর নাম **হরিকিষণ**। বিচারে হরিকিষণের ফাঁসির হুকুম হয়। বিদ্রোহী তাতে নিস্পৃহ। কারণ তাঁর কানে পৌঁছেছে বাণী:

"সুমুখে যা পাবে দলে চলে যাবে
অকারণ উল্লাসে!..."
(নজরুল)

১৯৩১ সালের ৭ই **জম্মুপ্রদেশ** থেকে দু'জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ সুচেতগড়ে নিয়ে আসছিল। তাঁদের সঙ্গে আরো দুটি ব্যক্তি আসেন, 'জামিন' হয়ে বন্দীদের মুক্তি নেবার অনুমতি সংগ্রহ করে। পথে সহসা তাঁরা প্রহরীদের রিভল্‌ভার খুলে আক্রমণ করেন। বিপ্লবীদের গুলীতে একজন কনেস্টবল নিহত হয়, একজন হাবিলদার ও একজন সাব-ইন্‌স্পেক্টরের আঘাত লাগে।....

১৯৩২ সালে সামান্য কিছু বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটলেও ১৯৩৩ থেকে পাঞ্জাব স্তব্ধ হয়ে যায়। ১৯৩২ সালে অবশ্য পেশোয়ার ক্যান্টনমেন্টে বিপ্লবীদের একটি বোমা ফেটে সাহেবমহলে কিছু আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। তবে কারো ক্ষতি হয় নি।...

**লণ্ডন**:—১৯৪০ সালে লণ্ডনে বীর **উধম সিং** সুদীর্ঘকাল পর জালিন-ওয়ালাবাগ হত্যালীলার নায়ক কুখ্যাত মাইকেল ওডায়ারকে নিধন করে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেন। উধম সিং-এর মধ্যে জাতি তার আত্মমর্যাদাবোধ, সংকল্প ও বীর্যবত্তার পরিচয় নতুন করে উপলব্ধি করে। [ বিশদ বিবরণ পরে দেওয়া হয়েছে। ]...

* * * *

বাংলা দেশে অনুষ্ঠিত দু-একটি সাহসে সুন্দর কাজের উল্লেখ করা হয় নি। তাদের মধ্যে **১৯৩০ সালে ৩রা জুন** মেদিনীপুরের দাসপুর থানা আক্রমণের ঘটনাটি অন্যতম। থানার দারোগা ভোলানাথ সেন নিহত হয়। এ আক্রমণের মূলে লবণ-সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশের অকথ্য জুলুমের ইতিহাস। চিচুয়াহাটেও এই সময় পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের সংঘর্ষ হয়। দাসপুর-মামলায় **পুষ্প চাটার্জি, নরেন দিন্দা** প্রমুখ বিপ্লবী-কর্মীদের দীর্ঘকালীন মেয়াদ হয়েছিল।...

**১৯৩২ সালে ২৩শে আগস্ট** চরমুগরিয়া ডাকাতি মামলায় **ফরিদপুরের মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের** ফাঁসির হুকুম হয়। এ ডাকাতির সময় পুলিশের সহিত

সংঘর্ষে **জ্যোতির্ময় সেন** প্রাণ দেন। নেতা সুরেন কর ও যজ্ঞেশ্বর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড লাভ করেন।

**১৯৩১ সালে ২রা অক্টোবর** একটি ঘটনা প্রকাশিত হয়ে বাংলার বিচিত্র বিপ্লবী-ইতিহাসের বৈচিত্র্য বাড়িয়ে দেয়। পূর্বদিন রাতে মাণিকতলায় একটি ডাকাতি হয়ে গেছে এক মহিলা বিপ্লবিনীর নেতৃত্বে! অবশ্য সবাই ধরা পড়ে গেছেন। এই বিপ্লবিনীব নাম **বিমলপ্রতিভা দেবী।** তাঁর সঙ্গে ছিলেন ধীবেন চৌধুবী, কালীপদ বায় ও নবহবি সেন। ডাকাতি বস্তুটি বড় কথা নয়। কিন্তু মেয়েদের সবাসরি এ-কাজেও নেতৃত্ব গ্রহণেব চেষ্টা-ই বড কথা। এই বিমলপ্রতিভা দেবী বাংলাদেশেব বাজনৈতিক কর্মীদেবও অন্যতমা। তাঁর কর্ম-নিষ্ঠা, ত্যাগস্বীকাব, দুঃসাহসিকতা ও নেতৃত্ব অনন্যসাধাবণ। যেকোন দুঃসাহসী বিপ্লবাত্মক কর্মেই প্রাক্-স্বাধীনতাযুগে তিনি থাকতেন পুবোভাগে। দীর্ঘকাল কারাগৃহে বাস কবেও তাঁব কোনদিন পথ চলায় ক্লান্তি আসে নি।...

**১৯৩২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারীর** ঘটনাটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে এখানে উল্লেখ করব।...'লোথিয়ান্ কমিটি' এসেছে এদেশে ভারতের উপকাব করতে। 'বৃটিশেব উপকার ভাবতবর্ষ চায় না'—একথাটি ভাল কবে বুঝিয়ে দেবাব উদ্দেশে বিপ্লবীবা দিল্লীব হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নীচে টাইম্-বোমা বেখে দিলেন। লোথিয়ান্-কমিটির সদস্য বোঝাই ট্রেনখানা ঐ পথে এলেই ধ্বংস হয়ে যাবে যাত্রীসহ। বোমা ফাটল। কিন্তু কাজ হল না কিছু। আপাত দৃষ্টিতে ব্যর্থ হলো চেষ্টা। তবে ব্যর্থ হয় নি উদ্দেশ্য। ইংরেজ ভাল কবেই বুঝলো যে তাদের মুখোশ খুলে গেছে। তাদের স্বরূপ ভারতীয়েবা ধবে ফেলেছে!...

## বাংলার নারী

বাঙালীর সাধনা কোন কালেই নারীকে অপাংক্তেয় করে রাখে নি। নারীর অবদান তাই বাংলাব জীবনযুদ্ধে সামান্য নয়। নতুন বাংলা সৃষ্টির পথে আমরা দেখি, কর্মেব আহ্বানে নারী ঘব ছেড়েছেন, দুঃসহ পথ গ্রহণ করেছেন, দুঃসাহসী কাজে নেতৃত্ব দান করেছেন। বাণী ভবানীর বীর্য, রাণী রাসমণির কামনা এই নারীদের রক্তে এতকাল সুপ্ত ছিল। কিন্তু কান পেতে তাঁরা শুনলেন ভগিনী নিবেদিতার উদাত্ত কণ্ঠ, তাঁরা শুনলেন এ্যানিবেসণ্ট ও সরোজিনী নাইডুর জ্বালাময়ী আহ্বান, তাঁরা বুঝে নিলেন সরলাদেবীর বীরপূজার মন্ত্র, নবজাগরণের

দুন্দুভি বেজে গেল তাঁদের কানে। বিপ্লব-বহ্নি আলোকিত ক'রেছিল তাঁদের চতুষ্পার্শ্বের ঘনান্ধকার। তাঁরা লুফে নিলেন রাণী ঝান্সির বাণী—'মেরী ঝান্সী নেহি দুঙ্গী'!...

আমরা পূর্বে বলেছি যে গত বিপ্লব-যুগে বাংলার নারী মা-বোনের মমতা নিয়ে বিপ্লবীদের সাহায্য করেছেন প্রচুর। সে সাহায্য-দানের বিনিময়ে দুকড়িবালা দেবী বা ননীবালা দেবী জেল খেটেছেন, বহু মা বোন বহু দুঃখও বরণ করেছেন ঠিকই। কিন্তু হাজার হলেও সেসব ছিল তাঁদের প্যাসিভ্‌ রোল। অথচ যে যুগের কথা আমরা বলছি সে-যুগে নারীর অগ্রগতি অসীম। বিপ্লবের পথযাত্রায় তাঁরা য়্যাক্‌টিভ রোল নিয়ে নেমে গেলেন। শুনেছেন তাঁরা বিদ্রোহীর কণ্ঠ :

"জাগো দুর্মদ যৌবন!
এসো, তুফান যেমন আসে।"

( নজরুল )...

হেমপ্রভা মজুমদার, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, লীলা নাগ ( রায় ), বিমলপ্রতিভা দেবী, সন্তোষকুমারী গুপ্তা, নেলী সেনগুপ্তা প্রমুখা নেতৃস্থানীয়া মহিলাদের সংগঠন-শক্তি সারা বাংলার নারীমহলে ১৯২১ সাল থেকে এক অপূর্ব সাড়া এনেছিল। মহাত্মা গান্ধীর অবদান এ প্রসঙ্গে অনস্বীকার্য। নারীর বন্ধন ভাঙার গান রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম শুনিয়ে আসছেন প্রথম থেকেই, কিন্তু জীবনক্ষেত্রে মুহূর্তে এই বন্ধন খানখান হয়ে গেল আইন-অমান্য-আন্দোলনের যাদুস্পর্শে। তারপর ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-এর নারীবাহিনী **লতিকা বসুর** নেতৃত্বে মেয়েদেরকে একেবারে রাস্তায় এনে দাঁড় করাল সেনানীর বেশে।

লীলা নাগ ও বিমলপ্রতিভা দেবী ছিলেন বিপ্লবী গোপন-সংস্থার সক্রিয় সভ্যা। লীলা নাগের 'দীপালী সঙ্ঘ' তৎকালে প্রকাশ্যে ছাত্রী ও প্রবীণামহলে জাগরণের বাণী শোনালেও সংগোপনে সশস্ত্র-বিপ্লবের পাঠ-ই দিতো বালিকা-কিশোরী-তরুণী ও গৃহিণীদেরকে।...

পূর্বেই বলা হয়েছে যে 'বেণু', 'স্বাধীনতা', 'চলার পথে' প্রভৃতি পত্রিকায় ও পুস্তকে সবার অলক্ষ্যে পরিচালিত বিপ্লবী-সংস্থাগুলোরই সরাসরি আবেদন থাকতো নারীসমাজের কাছে বিপ্লবের পুরোভাগে অবতীর্ণ হবার জন্যে। আর

নারীকে আত্মস্থ করার সংকল্পে শরৎচন্দ্রের লেখনীর অবদান যে কী গভীর ছিল তা আজকের মানুষ কল্পনা করতে পারবে না।...

ফলে দেখা গেল চণ্ডিকার পদভারে বিপ্লবী-নেতার মর্যাদায় প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মৃত্যুবরণ! আরো দেখা গেল বিজয়িনীর গৌরবে ক্রমে ক্রমে ঐ পথে এগিয়ে এলেন সুনীতি চৌধুরী, শান্তি ঘোষ, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, উজ্জ্বলা মজুমদার, পারুল মুখার্জী, বিমলপ্রতিভা দেবী। ওঁরা সবাই ম্যাক্‌টিভ রোলে নেমে গেলেন। সাহসে দুর্জয়, বিশ্বাসে অকুণ্ঠ, দেশপ্রেমে তন্ময় এই বঙ্গদুহিতাদের কীর্তি বিপ্লবের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। এঁদের সবারই ফাঁসি হয়ে যেতো। কিন্তু ধূর্ত ইংরেজ সে ভুল করে নি। কারণ তারা বুঝেছিল যে ভারতীয় রমণীদের ধরে ধরে ফঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলে সমগ্র ভারতবাসী দিকবিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে ইংরেজের বিপক্ষে চলে যাবে। কারণ সে-যুগের মানুষেরা দেশাত্মবোধে সচেতন হয়ে উঠেছিল। মহাত্মার আসমুদ্রহিমাচল গণসংযোগে ফাঁকি ছিল না। তখন জাতীয়তাবোধ এক অভাবিত আবহ সৃষ্টি করেছিল সমস্ত দেশ জুড়ে। অহিংস ও সহিংস এই উভয় আন্দোলনই বৃটিশের বিরুদ্ধে। এ আন্দোলনের বিরোধিতা যারা করতো তারা সমাজে ছিল অপাংক্তেয়। ভারতবর্ষের জেলগুলো এবং বিভিন্ন কন্‌সেনট্রেশান-ক্যাম্প ভরে গিয়েছে বন্দী নর-নারীর ভিড়ে। দেশের প্রাণ-ই তখন কারারুদ্ধ। পুলিশের গুলীতে কত পুরুষ মরেছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু আসামের **কনকলতার** মত বহু নারীব যে মৃত্যু ঘটেছে পুলিশের বুলেটে তা ক্ষোভে ও ক্রোধে ভাবতবষের জনতা জেনেছে। কিন্তু তাতে অবসাদ আসে না লোকেদের। কারণ চক্ষু বিস্ফারিত করে তারা দেখে রাণী **গুইদালোর** মত দুঃসাহসিকার আবির্ভাব সুদূর পূর্ব সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চলে। তারা দেখে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সীমান্ত-গান্ধী আবদুল গফ্‌ফর খাঁর নেতৃত্বে পাঠান নারী-পুরুষের অসহ্য নির্যাতন হাসি মুখে বরণ করার ছবি। আবার দেখে বাংলার নারীব বুলেটে ম্যাজিস্ট্রেট ও গভর্নরদের পতন, পুলিশের ব্যূহ ভেদ করার দৃশ্য!...

পুরুষের সমান শরিক হয়ে বাংলাব নারী জাতীয়-জাগরণের সকল ক্ষেত্রে পদার্পণ করেছেন এই বাংলায়। ১৯৩০-'৩৪ সালের পরিসরে তাঁদের অবদান যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছে, তার প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণভাবে লিখিত রয়েছে **অরুণা আসফআলীর** নেতৃত্বে 'বিয়াল্লিশের আন্দোলনে, **কর্নেল লক্ষ্মীর** নেতৃত্বে 'রাণী, ঝাঁসী বাহিনী'র রণযাত্রায়।...

এ অধ্যায়ে ( পূর্বেই উল্লেখ করেছি ) চট্টগ্রাম ও বিভি-র য়্যাক্‌শান্‌গুলো বাদে অপরাপর দলের বিশেষ করে যুগান্তর ও অনুশীলন দলের য়্যাক্‌শান্‌গুলোর কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।…

কানাই ভট্টাচার্যের গার্লিক-হত্যার বিশেষ তাৎপর্য থাকায় দীনেশ গুপ্তর ফাঁসির কথার পর সে-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।…

এখানে বীণা দাসের কর্মকথার বিস্তৃত বিবরণ উল্লেখ করছি। কারণ, বিপ্লবের ইতিহাসে এই কাজটির মূল্য বিশিষ্টতর।…

## বীণা দাস

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট্ হল্। সমাবর্তন-সভা বসেছে। বাংলার লাট বিশ্ববিদ্যালয়ের 'চ্যান্সেলার'। চ্যান্সেলার স্ট্যানলি জ্যাক্‌সন তাঁর অভিভাষণ পাঠ করছেন। মঞ্চে ও বিরাট হল্-এ গুণীজ্ঞানী ও মানীব্যক্তিদের ভিড। স্নাতকের দল নিজেদের আসনে উপবিষ্ট। সভার সর্বত্র স্তব্ধতা। সবার দৃষ্টি ভাষণ-পাঠে রত চ্যান্সেলারের দিকে।…

* * * *

কেউ লক্ষ্য করে নি।…একটি স্নাতক আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। · তিনি গভর্নরের কাছ থেকে অল্প দূরে এসে দাঁড়িয়েছেন। সহসা নৈঃশব্দ্যের বুক চিরে দারুণ শব্দে একটি বুলেট বেরিয়ে গেল বিপ্লবিনীর রিভল্‌ভার থেকে, গভর্নরের কানের পাশ দিয়ে। চোখ-ঝলসানো বিদ্যুল্লতার মত দাঁড়িয়ে এক তরুণী—চমক্ দিয়ে যাচ্ছে বারে বারে তাঁর নির্ভীক সত্তা—গর্জে উঠ্‌ছে বুলেটের শব্দ মুহুর্মুহুঃ। মুহূর্তের ঘটনা। কিন্তু আলোড়িত হয়ে গেল সমস্ত আবহাওয়া। গভর্নর ত্রস্তে সরিয়ে ফেললেন নিজের দেহ পার্শ্বজনের আড়ালে। ভাইস্ চ্যান্সেলার কর্নেল সুরাবর্দি তীবের বেগে ছুটে এসে বীণা দাসের কণ্ঠদেশ চেপে ধরলেন। তাঁকে কাবু করতে চাইলেন। কিন্তু বীণার হাতের বিভলভার থেকে এলোপাতাড়ি গুলী ছুটছে! একটি গুলী এসে লেগেছিল ডক্টর দীনেশ সেনের গায়ে। তিনি সামান্য আঘাত পেয়েছিলেন।…বীণা দাসকে পরাস্ত করতে স্বভাবতই সময় লাগলো না।…তিনি গ্রেপ্তার হলেন।…বিচারে তাঁর ৯ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।…

ঘটনাটির পরিধি মুহূর্তকাল। যেন একঝলক বিদ্যুতের হঠাৎ ঝলসে-যাওয়া; কিন্তু এর গুরুত্ব অসীম। এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। বাংলার সীমা পেরিয়ে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই বিদ্রোহিণীর বিদ্রোহজিজ্ঞাসা তরুণরক্তে তন্মুহূর্তে এনেছিল একটিমাত্র বোধ:

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়।"....

বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতীক বিপুল শক্তি ও ঔদ্ধত্যের ধারক সুবে-বাংলার লাটকে গুলীর আঘাতে উড়িয়ে দেবার সংকল্পে এক নারীর আবির্ভাব দু'দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, এ থেকে প্রমাণ হয় যে বিপ্লবী জাতটা আপোষহীন স্বাধীনতা ব্যতীত আর কোন কিছুর কাঙাল নয়। দ্বিতীয়ত, বাংলার নারী আবার প্রমাণ করলেন যে—

"বিশ্বে যা কিছু মহান্ সৃষ্টি
চির-কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী,
অর্ধেক তার নর।'

( নজরুল )

* * * *

বীণা দাসের পিতা দেশখ্যাত শিক্ষাবিদ বেণীমাধব দাস। ঋষিতুল্য পুরুষ। তিনি শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্রের শিক্ষাগুরু। ক্ষণজন্মা দু'টি ভাইকে ছাত্ররূপে পেয়েছিলেন তিনি কটকের সরকারী বিদ্যালয়ে।...বেণীবাবুর সাংস্কৃতিক-সত্তা-বিচ্ছুরিত বিভায় পরিচ্ছন্ন পরিবারটির শ্রেষ্ঠ অবদান এই বিদ্রোহী-কন্যা বীণা দাস। বীণার মেধা, ভাবপ্রবণতা ও সংবেদনক্ষমচিত্ত তাঁকে অনন্যসাধারণ হবার সুযোগ দিয়েছিল। ছোট বয়স থেকেই যেখানে দুঃখ ও অপমান মানুষকে অসহায় করেছে সেখানে তাঁর চোখে জল এসেছে, অন্যায়কে প্রতিহত করার ইচ্ছা হৃদয়ে জেগেছে।...

১৯২৮ সালে 'সাইমন্ কমিশন'কে বয়কট্ করার আন্দোলন বাংলায় তীব্র হয়ে ওঠে। বেথুন কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে তাঁদের সতীর্থ **বীণা দাস**-ও আন্দোলনে নেমে পড়েন। বেথুনে পড়বার কালেই বীণা দাস তাঁর সহছাত্রী সুহাসিনী দত্ত

ও শান্তি দাসগুপ্তার সান্নিধ্যে এসে বিপ্লবীদলে ভিড়ে যান। মেয়েদের সেই কর্মশাখাটিব যোগাযোগ ছিল ডাঃ ভূপাল বসুব সঙ্গে। ডাঃ ভূপাল বসু পূর্বে হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়েব বিপ্লবীদলেব কর্মী ছিলেন। তখন তিনি কাবমাইকেল্ মেডিক্যাল কলেজেব ছাত্র। ১৯২৪ সালে ভূপালবাবু ঐ দল ত্যাগ কবে নিজেই দল গড়ার চেষ্টায ব্রতী হন। কিন্তু ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে 'ডালহৌসি স্কোয়াব বোমার মামলা'য় গ্রেপ্তাব হবাব পব ভূপালবাবুব দলটি খুব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মেয়েকর্মীদেব সঙ্গে তাঁব দলেব সকল যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে বীণা দাসেব মত কর্মীব চঞ্চল হযে উঠবাবই কথা। কাবণ এদিকে বাংলা দেশ জুড়ে সার্থক বিপ্লবেব অগ্নিশিখা তাণ্ডব শুরু কবে দিয়েছে।...চট্টগ্রাম-বিদ্রোহেব সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকায় লোম্যান্ হত হন, হড্‌সন্ মাবাত্মকরূপে ঘাযেল হন, বাইটার্স বিল্ডিং-এব অলিন্দযুদ্ধে সিম্পসন্ নিহত এবং আবো আই-সি-এস সাহেবসুবা আহত হন, মেদিনীপুবেব জেলাকর্তা পেডি ও আলিপুবেব জেলা-জজ গার্লিক নিহত হন, কুমিল্লাব জেলাকর্তা স্টিভেন্সকে দু'টি কিশোবী বাঘিনীব বিক্রমে হত্যা করেন। মোটেব ওপব গোটা বাঙলাব বুকেব উপব দিযে তখন বিদ্রোহেব অগ্নিবথ অমিত তেজে পবিক্রমণ কবছে। ··সুতরাং বিপ্লবিনী বীণা দাসের ব্যর্থ-অপেক্ষা সহ্য হবে কেন? কিন্তু তাকে দিয়ে কাজ কবিয়ে নেবে কে?···দল কোথায়?···

বীণা দাস

সে বছব (১৯৩২) বীণা দাস বি-এ পাশ কবেছেন। সমাবর্তন-সভায় যাবেন বি-এ ডিগ্রীপত্র আনবাব জন্যে। মাথায় 'য্যাকৃশানেব প্লান এসে গেছে। কিন্তু তাকে কার্যকবী কবাব সংস্থারূপ যন্ত্র যে বিকল! কাজেই অনন্যোপায় হয়ে ছুটে গেলেন তাঁর দিদি কল্যাণী দাসের কাছে। কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য) যুগান্তর দলের কর্মী। তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন বোনকে তাঁর বিপ্লবী-বন্ধু কমলা দাসগুপ্তার সঙ্গে। বীণা দাসের তর সয় না। প্রস্তাব করে বসলেন যে, তাঁকে একটি

কার্তুজভরা রিভলবার দেওয়া হোক, তিনি আগামী সমাবর্তন-সভায় লাটকে হত্যা করার চেষ্টা করবেন। কমলা সময় চাইলেন দু-এক দিনের। তিনি আলাপ করলেন যুগান্তরের দায়িত্বশীল কর্মীদের সঙ্গে। বীণা দাস অন্য দলের কর্মী। সে-দলের প্রধানদের অনুমতি না নিয়ে তাঁকে দিয়ে কাজ করান যে রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু উক্ত দলটি যখন কর্ণধারবিহীন হয়ে পড়েছে এবং বীণা দাসের মত একটি দুঃসাহসিকা যখন কাজ করতে চান তখন অনেক ভেবে যুগান্তর দল তাঁকে সুযোগ দেওয়া স্থির করলেন।

বীণা দাস অস্ত্র পেলেন। অস্ত্র হাতে পেয়ে মূর্তিমতী সংহারিণীর বেশে আবির্ভূতা হলেন তিনি স্বাধীনতার শত্রু-প্রতীককে ধ্বংস করার সংকল্পে।...অথচ বুদ্ধিমতী এই তরুণীর অন্তর মধুচ্ছন্দে ভরপুর, স্বভাব মধুময়। সুসাহিত্যিকা এই বিপ্লবিনীর চিত্ত সুদূরসন্ধানী। কঠোরে ও মধুরে তাই এঁর মধ্যে অপূর্ব সমাবেশ।...

* * * *

সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করার পর বীণা দাসকে নিয়ে যাওয়া হয় প্রেসিডেন্সি জেলে। সেখান থেকে তাঁকে চালান দেওয়া হয় মেদিনীপুব জেলে। মেদিনীপুর জেলে তখন শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী ছিলেন। জেলের দুর্ব্যবহারে কিছুদিন পব এঁরা অনশন ব্রত গ্রহণ করলেন। দিন সাতেকেব মধ্যে বীণা দাস ও শান্তি ঘোষকে নিয়ে যাওয়া হল হিজলি জেলে। সুনীতি চৌধুরীকে চালান দেওয়া হল রাজসাহী জেলে।

এইভাবে পুরো সাতটি বছর কেটে যাবার পব কবিগুরু ও মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় অপরাপর সাজাপ্রাপ্তা বন্দিনীদের সঙ্গে বীণা দাস-ও জেল থেকে মুক্তি পান। সেটা ছিল ১৯৩৯ সাল।...

বেরিয়ে এসে তিনি 'মন্দিরা' মাসিকপত্রের সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু 'বিয়াল্লিশের আন্দোলনে আবার তাঁকে জেলে যেত হয় বছর তিনেকের জন্যে। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস-সভ্যারূপে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যা থাকেন। কিন্তু সংগ্রামী কংগ্রেস যখন ধীরে ধীরে ক্ষমতাপুষ্টের নানা দোষে জর্জরিত হয়ে উঠল, তখন বীণা দাসও ক্রমে দূরে সরে যেতে থাকলেন প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে। অবশ্য 'সমাজসেবা' অথবা 'উদ্বাস্ত সেবা'র কাজে তাঁর উৎসাহ আজও আমরা দেখি।

তাঁর 'শৃঙ্খলঝঙ্কার' পুস্তকখানার মধ্যে তাঁর সাহিত্যনিষ্ঠ মনখানা বেঁচে আছে।...

# সপ্তম অধ্যায়

## বিপ্লবীর জীবনে রবীন্দ্রনাথ

বাঙলার বিপ্লববাদ জন্মগ্রহণ করেছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। তখনকার বিপ্লবীরা গীতার ভাষ্যে বিপ্লবের দর্শন খুঁজে নিতেন। সাহিত্যের মাধ্যমে প্রেরণা পাবার জন্যে পড়তেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ-মঠ', 'কৃষ্ণচরিত্র', রমেশচন্দ্রের 'জীবনপ্রভাত', বিবেকানন্দের রচনাবলী। তাঁরা মন্ত্রের মাধুর্যে গ্রহণ করেছিলেন 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত। তখনকার দিনে কৃচ্ছ্রসাধনের পাঠ আয়ত্ত করে ধর্মনিষ্ঠায় বিপ্লবের বাণী উপলব্ধি করার রীতি ছিল একনিষ্ঠ বিপ্লবীর। বিপ্লবের পথ তখন কতিপয়ের আরাধনার সামগ্রী ছিল। ক্রমশ বাঙালীর প্রাণ বিপ্লবকে জীবনক্ষেত্রে ব্যাপকতায় বরণ করে নিল। দুঃসাহসের রোমাঞ্চ বাঙালীর যৌবনে কেবল 'সর্বনাশের নেশা'-ই লাগায় নি, অধিকন্তু বৃহৎ সৃষ্টির আবেদন-ও তাঁর কর্মপথে রঙ্ ধরিয়ে দিল। পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে দেশমাতৃকার স্বাধীন স্বরূপ প্রকাশিত করার বাসনা বাঙলার তরুণশক্তির অনুধ্যানে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে দেখা গেল। তাই গীতার কঠিন ভাষ্য পাঠ করে, কৃচ্ছ্রতার কাঠিন্যে কঠোর হয়ে 'বিপ্লবী' হবার প্রয়োজন রইল না। সহজাত-বৃত্তি থেকেই বাঙালী অনায়াসে বিপ্লবের কর্মধারায় লিপ্ত হল। উত্তরকালের বিপ্লবীরা তাই সংস্কৃত আপ্ত-বচন পরিত্যাগ করে বঙ্গভাষায় বহমান বাণীরসে জীবনধারণ করার জন্যে উন্মুখ হলেন।

তরুণ বিপ্লবী একদিন পাঠ করলেন :

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?
… এ কি শুধু দেবতার ?"

সাগ্রহে তিনি আরো পড়লেন :

"দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়রে দেবতা।"

সমগ্র চিত্ত তাঁর সহসা যেন তড়িৎস্পৃষ্ট হয়ে গেল। এত বড় সত্য অমন সহজ করে শোনা হয় নি তো কোনদিন? এতকাল রুদ্ধ ছিল ঐ সত্যের দ্বার। রূপ রস ও গন্ধে ভরা এই পৃথিবীকে উপেক্ষা করে ধ্যানপীঠে আসীন হবার যে উপদেশ এতকাল তিনি শুনে আসছিলেন তা যেন অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেল। আজ বৃহৎ প্রাণ ও বিপুল ঔদার্যে সমৃদ্ধ এক **বাণী** তাঁর সত্তাকে নাড়া দিল। বিপ্লবী ব্যাকুল হয়ে শুনলেন:

"সমুদ্রবাহিনী সেই প্রেমধারা হতে
কলস ভরিয়া তারা লয়ে যায় তীরে
বিচার না করি' কিছু, আপন কুটীরে
আপনার তরে।"

সাধু ও পণ্ডিত ব্যক্তি এতে ত্রুটি ধরেন; তাঁরা রুষ্ট হন। তাঁদের উদ্দেশে কবি বলেন:

"...মিছে করিতেছ রোষ!
যাঁর ধন তিনি ওই অপার সন্তোষে
অসীম স্নেহের হাসি হাসিছেন ব'সে।"

বিপ্লবী আরো শোনেন:

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়॥
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ!"

তারপর শোনেন:

"ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি' যোগাসন, সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ র'বে তা'র মাঝখানে॥"

বিপ্লবীর পূর্বপাঠ ছিল ধার-করা বুদ্ধির পাঠ। তাঁর চতুষ্পার্শ্বে ছিল কৃচ্ছ্রসাধনের কারাপ্রাচীর। সে প্রাচীর সহসা বিলীন হয়ে গেল। রবীন্দ্রকাব্য তাঁর রক্তমাংসের

প্রবণতাকে স্বীকার করেই বৃহতের পানে তাঁকে গতিস্পৃহ হবার পাঠ শোনাল। ফলে কবির সঙ্গে বিপ্লবীর কণ্ঠেও বেজে উঠল :

"মোহ মোর মুক্তি রূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তি রূপে রহিবে ফলিয়া ॥"

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গান মূর্তি ধরে কঠিন কর্মের অন্তরালে অবস্থিত বিপ্লবীর শুষ্ক পথচলায় প্রাণরসের ফল্গুধারা আবিষ্কার করল। বিপ্লবদর্শনের ভাষ্য বিপ্লবী একান্তে গ্রহণ করতে লাগলেন রবীন্দ্রসাহিত্যের নানা ধারা থেকে। কারণ ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনার সকল তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে বাঙালীর কথা-বলার ভাষায়-ই লিখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রসাহিত্য উপনিষদের প্রাণধর্মী প্রবাহে অভিষিক্ত। সেখানে ক্ষুদ্রকে স্বীকার করেই তাকে উর্ধ্বগতি দিয়েছে বৃহৎ। বৃহৎ সেখানে শাসক হয়ে বসে নেই। বৃহতের ভগবান সহজ সুরে, সহজ ভাষায় প্রাণপ্রিয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। রবীন্দ্রনাথের 'দেবতা' তাই নিস্পৃহ প্রেমাস্পদ। মহাকবির ভাষায়: "তিনি যুগ যুগ রাত্রিদিন জেগে রইলেন—অপেক্ষা করে রইলেন, পাপীর পাপের মলিনতা ধৌত হয়ে কবে তার হৃদয় ফুলের মত নির্মল হয়ে ফুটে উঠবে।"...তিনি আরো বললেন : "বৎসরে বৎসরে উৎসব ব্যর্থ হয়; দিনের পর দিন আলোকদূত ফিরে ফিরে যায়; অন্ধকার নিশীথিনীর তারকারা রাত্রির পর রাত্রি একই আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে—ক্ষান্ত হয় না, ক্লান্তি আসে না—কারণ এই আশা যে জেগে রয়েচে যে, যেদিন মানুষ ডাক শুনবে সেদিন সমস্ত সার্থক হবে।"...প্রেমস্পৃহ রবীন্দ্রনাথের 'ভগবানে'র ভক্ত তাই বলতে পারলেন—"হে আমার দেবতা, আজ একটুখানি নমস্কার বাঁচিয়ে এনেচি—আজ আসবার সময় ধনমানের কাছ থেকে কুড়িয়েবাড়িয়ে একটু নমস্কার আনতে পেরেছি—সে না হতে পারে সমস্ত জীবনের নমস্কার—কিন্তু এই ক্ষণকালের নমস্কার তুমি নাও।"..."তুমি জানাও মোরে তব সুধা-পরশে।"...

রবীন্দ্রনাথ

এই সহজ তত্ত্ব বিপ্লবীর প্রাণকে স্পর্শ করল। নূতন করে ভগবৎ-কল্পনাকে

তিনি আপন হৃদয়ে গ্রহণ করলেন। সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা বিশ্বসংসারকে ছুঁয়ে থেকে বৃহতের পথে তাঁর পরিক্রমা শুরু হল।

রবীন্দ্রনাথ শেখালেন যে, আত্মদোষ গোপন করে বড় হওয়া যায় না। নিজের ভাল ও মন্দ সম্পর্কে অকপট হলেই আত্মনিবেদন সার্থক হয়:

"যাহা আছে সব আছে তোমার আঁখির কাছে
প্রসারিত অবারিত মন ॥"

এই অবারিত মন নিয়ে চলতে জানলেই ক্ষুদ্র থেকে বিশালের দিকে যাত্রা সম্ভব হয়। "পরিচয়হীন তুচ্ছ কর্মাধীন" যে মানুষ, তাকেও ঐ পথেই মহাশক্তি স্বেচ্ছায় মহীয়ান করে তোলেন। তখন তিনি আত্মসমর্পিত ভক্তকে আশ্বাস দান করেন:

"তুই মোর মালঞ্চের হবি মালাকর।"

একদিন 'কৃচ্ছ্রসাধনা' বিপ্লবীকে ঘরসংসার অস্বীকার করে বিপ্লবের পথে নেমে পড়বার আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বললেন:

"কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী,
গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে ॥"

তাহার উত্তরে দেবতা বললেন—'আমি'।...কিন্তু 'বিরাগী' কিছু শুনলেন না। ঘর ছেড়ে বেরুলেন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিজন ত্যাগ করলেন।...দেবতা আবার বললেন—'ফিরে এসো'।...কিন্তু বিরাগী তবু শুনলেন না। তখন:

"দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, হায়,
আমারে ছাড়ি ভক্ত চলিল কোথায়।"

**'রবীন্দ্রদর্শন'** বিপ্লবী বুঝলেন। বুঝলেন যে সংসারকে বাতিল করে সংসারের ভাল করা যায় না। ছোটকে পরিহার করে বৃহতের সন্ধান দুর্লভ। ছোটর মধ্যে বৃহৎকে খুঁজে পেতে হবে, তাকে উৎসাহিত করতে হবে। ব্যক্তিক-মুক্তি বিপ্লবীর কাম্য নয়। তাঁদের যাত্রা সমষ্টির কল্যাণে। সেই 'সমষ্টি' অজস্র ক্ষুদ্রকে নিয়ে

সংসারের আবর্তে বিদ্যমান। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বিপ্লবী-ও কামনা করলেন :

"প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে।"

এই আলোকের জন্যে আকুল কামনা করে গেছেন বিপ্লবী ফাঁসির কক্ষে, কারাগারের নিরন্ধ্র সেলে বসে। তাঁরা এই আলোকের তপস্যায়ই বিপ্লবীজীবনকে ধ্যানস্থ রাখার মন্ত্র নিয়েছিলেন। তাই বিস্ময়ে তাঁরা-ও দেখলেন :

"এ কি বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল
আমার ইন্দ্রিয়যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ।
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ॥"

রবীন্দ্রকাব্যে বিশ্বরূপের বন্দনা। এখানে ক্ষুদ্র-বৃহৎ, গণ্য-নগণ্য, ধনী-নির্ধনের বাইরেকার পরিচয়কে বড় করে দেখার সঙ্কেত নেই। এখানে সত্য, শিব ও সুন্দর সমাহিত। "এখানে সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

কবির সকল তত্ত্বে গতির বন্দনা। সে গতি অভ্যগ্র। সে গতি সুন্দর। সুস্থ সবল মানুষ তার সকল ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে রূপরস-গন্ধময় পৃথিবীতে বীর্যবানের পদযাত্রা গ্রহণ করবে। সেই পদযাত্রা সুন্দর। সুন্দর সেই বীর্যবান মানুষই কেবল মৃত্যুকে জয় করে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।...এই মহা বীর্যবানের আরাধনায় বিপ্লবী আনন্দিত হলেন। ভয় তাঁর অপগত হল। কান পেতে শুনলেন তিনি কবির কথা :

"তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।
'আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো' এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে॥"

ভয় দূরীভূত হতেই মৃত্যুকে বিপ্লবী 'প্রিয়' রূপে চিনতে পারলেন। গীতার ভাষ্যে তাঁর আর প্রয়োজন রইল না। 'বাসাংসি জীর্ণানি' রূপ আপ্তবচন কণ্ঠস্থ করার প্রয়োজন নেই। নিজের অন্তস্তল থেকে বিপ্লবী মৃত্যুকে বলতে পারলেন : "মরণ রে শ্যাম তোঁহারই নাম।"...

প্রেম ব্যতীত প্রেয়কে লাভ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের কাছে বিপ্লবী যে প্রেমের পাঠ পেলেন তা তাঁর কাছে "দূরকে করিল নিকট বন্ধু পরকে করিল ভাই।" কিন্তু এ বিশ্বপ্রেম নিজের গৃহজনকে উপেক্ষা করে নয়। ঘরের মা'কে ভাল না বাসতে পারলে দেশমাতৃকার স্বরূপ বাস্তবে বোঝা যায় না। দেশমাতৃকার স্বরূপ উপলব্ধি না করলে বিশ্বপ্রেমের চিন্তা অবান্তর। বিশ্বপ্রেমী কবি তাই তাঁর ঘরের দিকে তাকিয়েই বলেছিলেন পরম বেদনায় :

"বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা—
সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য,
বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।"

কিন্তু এতে হতাশ হলে চলবে না। আশাবাদী কবি তাই নিজেরই কাছে আবেদন জানালেন :

"এ দৈন্যের মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে
বিশ্বাসের ছবি॥"

কবির আশাবাদে, সুন্দর মানসরাজ্যে বিপ্লবীর পথপরিক্রমা আমরা লক্ষ্য করি। বস্তুর সম্মান ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় অশঙ্ক তাঁর পদধ্বনি। তাই সকল ব্যর্থতা উপেক্ষা করে, সকল বাধা ডিঙিয়ে বিপ্লবীর গতিপথ। বিপ্লবীর কণ্ঠে :

"যদি বিদ্যুৎফণী জ্বালাময়
তার উদ্যত ফণা বিকাশে,
আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়।"

কর্মমুগ্ধ মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীর ব্যাকুল বাসনা ব্যাপকতর পটভূমে প্রসারিত হয়ে যায়। দেশকাল-পরিসরে তাঁর কামনা :

"নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।"

বাঙলার বিপ্লবী তাই সমগ্র পৃথিবীর বিপ্লবীদের মধ্যে তাঁর নিজের রক্তস্পন্দন শুনতে পেলেন। তাঁর চিত্তে বিশ্বভ্রাতৃত্বের ছোঁয়া লাগতে বিলম্ব হল না।

পূর্বেই বলেছি যে প্রথম যুগের বিপ্লবীরা প্রাণশক্তি আহরণ করতেন 'গীতা' থেকে এবং বঙ্কিম-রমেশ-বিবেকানন্দের সাহিত্য থেকে। বহু তপশ্চর্যায় তাঁরা নিজেদেরকে তৈয়ের করতেন খাঁটি কর্মী হবার উদ্দেশ্যে। বিপ্লবীর সংখ্যা তাই তখন ছিল স্বল্প, বিপ্লব আবদ্ধ ছিল অল্প লোকের কল্পনায়। চেষ্টা ও যত্নের সাহায্যে 'বিপ্লবী' হতে হতো বলেই শুরুতে বিপ্লবধারা সহজ ও সতেজ ছিল না। ··

কিন্তু ১৯২১ সালের পর দেশের চেহারা পাল্টে গেল। গান্ধীজির আন্দোলনে গণদেবতা জাগ্রত হলেন। বিপ্লব-ও তখন সহজ গতি খুঁজে পাবার জন্যে ব্যাকুল। এ যুগে কর্মীকে প্রথম 'সাধক' এবং পরে 'বিপ্লবী' হতে হলো না। সহজাত বুদ্ধি ও প্রাণস্পন্দনে তরুণদল প্রথমেই বিপ্লবীর ভূমিকা গ্রহণ করে সাধকের তপস্যায় সেই ভূমিকাকে সম্পূর্ণ করার পথ ধরলেন। আগের যুগে কর্মীকে প্রথম হতে হতো সাধু-ব্রহ্মচারী, পরে শিখতে হতো তাঁকে রাজনীতি। কিন্তু পরের যুগে ছেলেরা রাজনীতি তথা দেশোদ্ধারের কথা শুনেই দলে ঢুকে কর্মসাধনায় সিদ্ধ হবার ব্রত গ্রহণ করতেন।

তাঁদের মানসিক তৈয়েরির পথে বন্ধুর মতো, অন্তরতমের মতো সহায়ক ছিল রবীন্দ্রসাহিত্য। যে রসে রসান্বিত করে বাঙলার যৌবনকে কবি পাত্র ভরে দেশ-প্রেম দান করেছেন, সে প্রেমরস পান করে বাঙালী অতি সহজে 'বিপ্লবী' হতে পেরেছে।···

প্রথম যুগের জড়তা দূর হয়ে গেল। ১৯২১ সালের পর থেকে জীবনের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ব্যাপকতর ভাবে বাঙালীর চিত্ত ও মন স্বাভাবিকতায় ও সহজতায় বিপ্লবের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে চলল।

তাই দেখি, বাঙলার যে-কোন 'শহিদ' তাঁর আরব্ধ কর্ম নিবিড় নিমগ্নতায় সম্পন্ন করে গেছেন হৃদয়ের তাগিদে। তাঁরা দেশকে ভালবেসেছেন, জাতিকে প্রিয় করেছেন, আপন আদর্শকে অভ্রান্ত জেনেছেন অন্তরের আবেগে, ভাবরসের গাম্ভীর্যে। ভাবরস দিল তাঁদের অমেয় শক্তি। এ শক্তি প্রতিমুহূর্তে বিপ্লবীরা সঞ্চয় করতেন রবীন্দ্রকাব্য থেকে। তাই 'রাইটার্স-যুদ্ধে' যাবার প্রাক্কালে তন্ময় বাদল ও দীনেশ আবৃত্তি করছিলেন—

"এবার ফিরাও মোরে !"···

জেল থেকে ফাঁসির-লগ্নের জন্যে অপেক্ষ্যমান দীনেশ লিখেছিলেন: "যার প্রাণ আছে, শ্রেয়কে বরণ করবার জন্য যার আছে শ্রদ্ধা, সে কি কখনো তাঁর

মহাশঙ্খের আহ্বান শুনে স্থির থাকতে পারে? তাঁর আহ্বানে কি শক্তি আছে জানি না—

'শুধু জানি—যে শুনেছে কানে
তাঁর আহ্বানগীত, ছুটেছে সে
নির্ভীক পরাণে
সংকট-আবর্ত মাঝে।...”

এ মহাসঙ্গীত মহোত্তম শহিদের শুধু নয়, এ-যুগের সকল বিপ্লবীই রবীন্দ্র-কাব্যের মাধ্যমে শুনেছিলেন তন্ময় হয়ে। রবীন্দ্রনাথের মানসেও মহা-বিপ্লবীর পদচারণা ছিল। তা ছিল বলেই তিনি লিখলেন পৃথিবীর সর্বকালের নির্যাতিত মানুষদের জন্যে :

“নীরবে লইব প্রাণে তোমার হৃদয় হতে
নীরব বেদনা।”

রবীন্দ্রনাথ নিজে উপলব্ধি করেছেন বিপ্লবের বাণী। তাই তাঁর কণ্ঠে ফুটে উঠেছে বিপ্লবের ভাষা। তাঁর বিপ্লবমুগ্ধ চিত্ত বিপ্লবকে শ্রদ্ধা করেছে, সম্মান দিয়েছে। পরস্পরের পরমাত্মীয়তা লক্ষণীয়। কবি সর্বপ্রথম অকুণ্ঠ প্রণাম জানিয়েছেন বিপ্লবের মহানায়ককে :

“অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি।”

বিপ্লবীরা কবিকে প্রণাম পাঠিয়েছেন কত ভাবে কত-না প্রসঙ্গে। বক্সা-জেলে অবরুদ্ধ বিপ্লবী বন্দীরা কবিগুরুর জন্মলগ্নে শ্রদ্ধার্ঘ্য লিখে শান্তিনিকেতনে কবিতীর্থে পাঠিয়েছিলেন। লেখাটির রচয়িতা ছিলেন সুসাহিত্যিক অমলেন্দু দাসগুপ্ত। অর্ঘপত্রে গুরুদেবের চমৎকার একটি ছবি এঁকেছিলেন অপর বন্দী সুধীর বসু। আজ কবি-ও নেই, অমলেন্দুবাবুও নেই, সুধীরবাবুও নেই! কিন্তু কালজয়ী মহাকবির বাণী অক্ষয় সৌন্দর্যে বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবেও। ঐ শ্রদ্ধার্ঘ্যের উত্তরে মমতাময় যে-বাণী ছন্দোবদ্ধ করে তিনি বক্সা জেলের বন্দীদের কাছে পাঠিয়েছিলেন তা' তুলে দিলাম :

( বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি )

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন!
ফোয়ারার রন্ধ্র হতে
উন্মুখর ঊর্ধ্বস্রোতে
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন
মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি অঙ্কুব আকাশে দিল আনি
স্বসমুত্থ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্য নরেব রাজধানী।
'অমৃতেব পুত্র মোরা'—কাহারা শুনাল বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়।

( দার্জিলিঙ—১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ )

বাঙলার বিপ্লবী ও কবিগুরুর মধ্যে পারস্পরিক আন্তরিকতার মূলে একটি সত্যই বিদ্যমান যে কবি দিয়েছেন পাথেয়, বিপ্লবী চলেছেন সে-সম্বল নিয়ে তাঁর দুর্গম পথে।

জাতির জাগ্রত-যৌবন কবির ভালবাসার বস্তু। তাই ভালবেসেছিলেন তিনি বাঙলার বিপ্লবীগোষ্ঠীকে। তাই দেখি শাসক ইংরেজ যখন হিজলীর বন্দীশালায় অবরুদ্ধ নিরস্ত্র বিপ্লবীদের পিঞ্জরাবদ্ধ-পশুর মত গুলী করে মেরে ফেলল, তখন অসুস্থ কবি ছুটে এলেন শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায়। বিরাট জনসভায় ইংরেজের দাম্ভিক বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ না জানিয়ে স্থির থাকতে পারলেন না। তৎপর অনবদ্য ছন্দে কঠিন নালিশ তিনি জানালেন তাঁর ভগবানের কাছে:

"কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সঙ্গীতহারা,
অমাবস্যার কারা

লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাইতো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?”…

জাতীয়-নেতৃত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছিল কবির মনে। তিনি লিখেছিলেন একদিন :

“তোমার আসন শূন্য আজি পূর্ণ কর,
হে বীর পূর্ণ কর।”

তারপর গভীর মানসে সন্ধান পেলেন তিনি তাঁর বাঞ্ছিত নেতার, যিনি বীরের মাধুর্যে শূন্য আসন পূর্ণ করতে পারেন। আহ্বান করলেন সেই বীরকে এক অগ্নি-গর্ভ লগ্নে। বললেন : “বহুকাল পূর্বে একদিন আর একসভায় আমি বাঙলাদেশের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশ্যে বাণীদূত পাঠিয়েছিলুম। তার বহু বৎসর পরে আজ এক অবকাশে বাঙলাদেশের **‘অধিনেতা’**কে প্রত্যক্ষ বরণ করছি।…আমি আজ তোমাকে বাঙলাদেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি, সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করি তোমার পাশেই সমগ্র দেশকে।”…

সুভাষচন্দ্র সেই পুণ্য মুহূর্তে শান্তিনিকেতনের পূতভূমিতে ঋষি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে মাথা পেতে এ আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন তাঁর চলার পথে।…

ঋষি রবীন্দ্রনাথের আহ্বানের উত্তরে শতবর্ণে প্রোজ্জ্বল হয়ে ভারতের সীমান্তে আবির্ভূত হলেন সুভাষচন্দ্র; মহাবিপ্লবী **নেতাজির** বিস্ময়কর ভূমিকায় আবির্ভূত হলেন তিনি কেবল বাঙলা সমাজে নয়, সর্বকালের সর্বদেশের পদানত জাতির নেতারূপে।

‘বিপ্লবযুগে’র জন্ম রবীন্দ্রযুগে। বিপ্লবীরা রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া ‘মানুষ’-রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেও পরম শক্তি লাভ করেছেন। তাঁদের পরম ভাগ্য যে ঐ মানুষটিকে বন্ধুরূপে, শিক্ষকরূপে, গুরুরূপে, ঋষিরূপে সমগ্র বিপ্লবকাল জুড়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে তেমন করেই পেয়েছিলেন যেমন করে বনভূমি পায় বর্ষাকে, ঝর্ণাধারা পায় সূর্যকে।…এই প্রাপ্তি বাঙলার জীবনের অব্যক্ত এক ইতিহাস।…

---

## অষ্টম অধ্যায়

# বিপ্লবীর কাছে শরৎচন্দ্র

বিপ্লবীর মানস-গগনে রবীন্দ্র ও শরৎ সাহিত্য যথাক্রমে সূর্য ও চন্দ্রের মতোই আলোকোচ্ছলতায় বিরাজিত ছিল। ধরণীর উপর এ দু'টি জ্যোতিষ্কের যে প্রভাব, বিপ্লবী-বাঙালীর জগতেও রবীন্দ্র-শরৎ সাহিত্যের সে প্রভাব।

রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য শরৎচন্দ্র। কিন্তু তিনি আ।ন বিভায় ভাস্বর। নিজের স্বকীয়তায় সুন্দর। নিজস্ব প্রতিভা-ব্যঞ্জনায় বিস্ময়কর।...চন্দ্র যেমন ধরণীর নিকটতম পড়শী, তার কিরণধারায় স্নেহ যেমন প্রশান্ত অথচ উদ্বেল হয়ে থাকে—তেমনি শরৎচন্দ্র ছিলেন বিপ্লবীদের হৃদয়ের বড় কাছাকাছি বাসিন্দা। তাঁর স্নেহধারায় তাঁরা উচ্ছল হয়েছেন, শান্তি পেয়েছেন। শরৎসাহিত্য হাত বাড়িয়েই তাঁরা পেতেন; হৃদয়ের অন্তঃপুরে লালন করে তাকে নিজেদের ধ্যানে পরিণত করতেন। বিপ্লবীদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল—যেমন ছিল তাঁর ব্যক্তিক যোগাযোগ সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে।...

শরৎচন্দ্র শিল্পী—কিন্তু তিনি বাস্তবকে না জেনে, হৃদয় দিয়ে তাকে উপলব্ধি না করে একটি অক্ষরও লিখে যান নি। মানুষের দুঃখ-বেদনার ছবি তাঁর কলমে অমন জীবন নিয়ে ফুটে উঠতো না, যদি হৃদয় দিয়ে সে বেদনাকে তিনি অনুভব না করতেন। কবির কথা তাঁরও অন্তরের কথা—"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।" এ কথা জীবনের প্রতি স্তরে তিনি মেনে নিয়েছিলেন। তাই তাঁর লেখনীর কষাঘাতে 'অত্যাচারী' যেমন জর্জরিত হয়েছে, 'অত্যাচার যারা সহ্য করে' তারাও তেমনি অব্যাহতি পায় নি। যারা দুর্বল তারা তাঁর দেওয়া আঘাতে বল পেয়েছে, যারা ভীরু তারা সাহস পেয়েছে, যারা দাস্যসুখে মূঢ় তারা আত্মসম্মানবোধ পেয়েছে। কারণ নির্যাতিতকে করেছেন তিনি কঠিন অথচ মমতায় সুন্দর আঘাত। সে আঘাত আশীর্বাদের মত ফলদায়ী। সমাজের যত গ্লানি, অনাচার ও কুসংস্কার দূর করার চেষ্টায় শরৎচন্দ্রের যেমন আলস্য ছিল না—দেশকে ইংরেজ-রাহুর কবল থেকে মুক্ত করার চেষ্টায় যাঁরা

নিযুক্ত, তাঁদের পথকে স্বপথ ভাবতেও তেমনি তাঁর শঙ্কা ছিল না। কাজেই শরৎচন্দ্রকে বিপ্লবীরা সতীর্থ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সাহিত্যে তাই তাঁরা আপন বক্তব্য খুঁজে পেতেন। মনে হতো এক বাঙ্‌ময় বিপ্লবী তাঁদের ভাষায় যেন মুখর হয়ে আছেন।

বিপ্লবের মহানায়ক রূপে শরৎচন্দ্রের "সব্যসাচী"-কল্পনা আজ আর তাঁর মনের কল্পনা হয়ে নেই। সে কল্পনা লোকচক্ষুর সম্মুখে যতীন্দ্রনাথ, সূর্যসেন, রাসবিহারীকে

শরৎচন্দ্র

ছুঁয়ে ছুঁয়ে ক্রমে নেতাজির মূর্তিতে নিঃসংশয়ে রূপ ধারণ করেছে। এ মূর্তি বাস্তব। এ মূর্তি প্রমাণ করে দেয় যে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য অলস কল্পনা নয়, ভাবপ্রবণ স্তুতিবাদ নয়, রোমান্টিক গল্পগাথা নয়। তাঁর লেখা বিপ্লবীমনের প্রতিচ্ছায়া,

পরাধীন জাতির স্বপ্ন, বিপ্লবের রসঘন ভাবী ইতিহাস। এ ইতিহাস পৃথিবীর জীবনে বারে বারে ঘটেছে ও ঘটবে। কারণ অন্যায় ও অত্যাচার থেকে ধরণীর কোন কালে মুক্তি নেই—'বিপ্লব'ও তাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে 'দীর্ঘজীবী' হয়ে থাকতেই বাধ্য। শরৎ-মানসে বিপ্লবেব ভাবী ইতিহাস একান্ত সত্যে প্রতিফলিত হবার মূলে হৃদয় দিয়ে পবাধীনতার গ্লানিকে তাঁব অনুভব করাব অসীম শক্তি। এ ক্ষেত্রে তিনি সুদূরদর্শী—যাকে বলা হয় 'সীয়ার্'। তিনি হৃদয় ও বুদ্ধিতে বিপ্লবী—কাজেই তাঁব মন রচনা করতে পেরেছিল 'পথের দাবী,' 'নারীর মূল্য', 'পল্লীসমাজ' বা 'শেষ প্রশ্ন'। সমাজে যাবাই অবহেলিত, উপদ্রুত ও নিষ্পিষ্ট, তাদের ব্যথাকে নিজের ব্যথা রূপে গ্রহণ করে সীমাহীন শক্তিতে তিনি লেখনী চালিয়েছেন। তাই শরৎচন্দ্র 'উৎপীড়িতে'র কবি। এবং যে শক্তিমান বলতে পারেন—

"যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম বণভূমে রণিবে না—
আমি বিদ্রোহী বণক্লান্ত,
সেই দিন হব শান্ত!" (নজরুল)

—সেই শক্তিমানেরও আরাধ্য কবি। শবৎচন্দ্রের লেখা স্পষ্ট ও সহজ। এর আবেদন হৃদয়ের কাছে। তাই লোকের বুঝতে কষ্ট হয় না। একটা বুঝতে গিয়ে সে আর একটা বোঝে না। তাঁর লেখা যুক্তিসহ ও রসঘন—তাই তাঁর লেখায় লোকের চোখে জল আসে, দুর্বল সাহস পেয়ে দুঃসাহসের কাজে পা বাড়ায়। 'অপূর্ব'-ও বিপ্লবের পথে এসে যায়। তারপর পালিয়ে গেলেও, তার ঐ আসাটা কিন্তু মিথ্যে প্রমাণিত হয়ে যায় না।..

বাঙলার বিড়ম্বিতা নারী শরৎচন্দ্রের মতো বন্ধু আর কোথাও খুঁজে পায় নি। অমন করে কে বলবে: "সতীত্ব ত শুধু দেহেই পর্যবসিত নয়, মনের-ও ত দরকার! কায়মনে ভালবাসতে না পারলে ত ওর উচ্চস্তরে পৌঁছানো যায় না! মন্ত্র পড়ে বিয়ে দিলেই কি যেকোনো বাঙালী মেয়ে যেকোনো বাঙালী পুরুষকে ভালবাসতে পারে? এ কি পুকুরের জল যে, যেকোনো পাত্রে ঢেলে দিলেই কাজ চলে

যাবে ?”·· নারীর-ও যে পুরুষের মত মন আছে, কর্মশক্তি আছে, সর্বকার্যে সমান অধিকার আছে এ সত্য শরৎচন্দ্র প্রাণ থেকে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে এ-সত্যকে স্বীকার করা প্রয়োজন স্বাধীনতা-যুদ্ধোদ্যমের প্রথম পর্বেই। তিনি বিবেকানন্দেব মতই বিশ্বাস করতেন যে, পবাধীনতা-ই সব চেয়ে বড অভিশাপ, পরাধীন জাতিব সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান ধর্ম হলো স্বাধীনতালাভের সর্বাত্মক প্রয়াস। এই প্রয়াসে নারী ও পুরুষ সমান কদমে এগিয়ে না চললে বিপ্লব ব্যর্থ, যুদ্ধ অচল হতে বাধ্য। কাজেই শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’-র সভাপতি হলেন এক নাবী। সব্যসাচীকে অতিক্রম করতে না পারলেও এই নারীর প্রতিদ্বন্দ্বী সর্বগুণসম্মত বিপ্লবী আব কেউ ছিলেন না চতুপার্শ্বে। তিনি বলছেন সনাতনধর্মে বিশ্বাসী অপূর্বকে: “আপনি নিজে যখন কাজে লাগবেন, তখনই এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করবেন যে, যাকে আপনি ‘নারীর বাইরে এসে ভিড করা’ বলচেন সে যদি কখনো ঘটে, তখনই দেশেব কাজ হবে, নইলে কেবল মাত্র পুরুষের ভিডে শুকনো বালির মত সমস্ত ঝবে ঝরে পডবে, কোনোদিন জমাট বাঁধবে না।”···শরৎচন্দ্রেব সব্যসাচী ভাবতীকে বলছেন: “আগুন যদি কখনো এ-দেশে জ্বলচে দেখতে পাও, যেখানে থাকো ভারতী, এই কথাটা আমার তখন স্মবণ কোবো, এ আগুন মেয়েবাই জ্বেলেছে।” আবার তিনি বলছেন ভারতীর কথার উত্তরে: “মেয়েদের পবে যে আমার কত লোভ, কত ভরসা, সে-কথা নিজে তোমাদের জানাবার সুযোগ হলো না, কিন্তু পার যদি দাদার হয়ে এই কথাটা তাদের জানিয়ে দিয়ো, বোন।”···ভারতী বললেন, “জানাব এই যে, আমাদের শুধু তুমি বলি দিতে চাও।” সব্যসাচী মুহূর্তকাল চেয়ে থেকে বললেন: “বেশ, তাই বোলো। বাঙলাদেশের একটি মেয়েও যদি তার অর্থ বোঝে, আমি তাতেই ধন্য হবো।”

এ থেকেই আমরা বুঝি যে, বিপ্লবের ‘বলি’ রূপে পুরুষ-মেয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য টানতে বাজী নন বিপ্লবীর রাজা সব্যসাচী—অর্থাৎ বিপ্লবের সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র। “মধুর মরণে পূর্ণ করিয়া সঁপিয়া যাব প্রাণ”—এই প্রাণসমর্পণের অধিকার নারীপুরুষের সমান।...

শরৎচন্দ্র ছিলেন মনের দিক থেকে বিপ্লবী। কাজেই বিপ্লবীদের কর্মে ছিল তাঁর আন্তরিক সমর্থন। এছাড়া বাঙলার বিপ্লবীদের সঙ্গে-ও ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তাঁর সঙ্গে বিপিন গাঙ্গুলীর ছিল অন্তরঙ্গতা। বিপিনবাবু ও শচীন

সান্যাল অনেক সাহায্য পেয়েছেন শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে, নানা ভাবে। ১৯২৮ সাল থেকে হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগাযোগ ঘটে। বন্ধু রূপে, প্রাজ্ঞ রূপে, অগ্রজ রূপে তিনি হেমচন্দ্র ও তাঁর বন্ধুদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সাহিত্যসংস্থা গড়ার প্রয়াসে। বিপ্লবী এই সাহিত্যসংস্থার প্রকাশ ঘটে **'বেণু'**-র মাধ্যমে। শরৎচন্দ্র পরম আত্মীয়তায় 'বেণু'-কে গ্রহণ করেন। দেশপ্রখ্যাত অতবড় সাহিত্যসম্রাট সেই কালে অখ্যাত কয়েকটি তরুণের দ্বারা পরিচালিত এই ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকাটির মধ্যে খুঁজে পেলেন তাঁদেরকে যাঁরা বাঙলার বিদ্রোহী-যৌবনের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন তাঁর বাণী। তাই 'বেণু' ছাড়া সেইকালে অন্য কোন কাগজে লেখা দেবার বড় একটা সময় হতো না তাঁর। **'বিপ্রদাস'** উপন্যাসখানা ধারাবাহিক রূপে বার হতে লাগল বেণু পত্রিকায়। সে-উপন্যাসের লিখনভঙ্গি-ই ছিল আলাদা!—বড় বড় কাগজওয়ালারা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতেন: "বেণু আপনাকে লেখার প্রত্যেকটি instalment-এ কত করে দেয়? ওদের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?"—হেসে উত্তর দিতেন শরৎচন্দ্র: "ওরা আবার দেবে কোত্থেকে? আমারই বরং ওদের কিছু দেওয়া উচিত। ওরা যে আমার বড় আপন।"

'বেণু'র পরিচালকদের তিনি বলতেন: "কাগজটা বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা কোরো। জেলে যাওয়া তোমাদের পক্ষে সহজ; কিন্তু জেলকে ফাঁকি না দিতে পারলে কিছুই গড়তে পারবে না. গড়াটা-ই কঠিন।...তোমরা একটা ভালো দেখে বাড়ি ভাড়া নাও। আমি ওখানে গিয়েই উঠবো সপ্তাহে দু'-তিন দিন। দেখো তা' হলে বাঙলা দেশের সকল সাহিত্যিক তোমাদেরও বন্ধু হয়ে উঠবেন। কাগজ অতি সহজেই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে এঁদের সহায়তায়।"

শরৎচন্দ্রের এই প্রত্যাশা সফল করতে না পারলেও শরৎচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় সে-যুগে বেণু পত্রিকা সত্যি বাঙলা দেশের জ্ঞানীগুণী ও সাহিত্যিকদের স্নেহধন্য হয়ে বাঙলার যুব-সমাজকে বিদ্রোহচঞ্চল করে তুলেছিল।...

এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রকে কম দুর্ভোগ ভুগতে হয় নি। ভারতবিখ্যাত সর্বজনমান্য অতবড় সাহিত্যিক না হলে বাঙলার পুলিশ তাঁকে কারারুদ্ধ না করে ছাড়তো না। শরৎচন্দ্র অবশ্য মনের দিক থেকে সেজন্যে তৈয়ের ছিলেন। তৈয়ের ছিলেন বলেই 'বেণু'-র বিপ্রদাসের ভাষা ও লিখনভঙ্গি যুব-রক্তে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল। 'বেণু' পুলিশের আক্রমণে বন্ধ হয়ে যায় ১৯৩২ সালে। তারপর 'বিপ্রদাস'

বেরিয়েছে মাসিক 'বিচিত্রায়'। কিন্তু 'বিচিত্রা'র বিপ্রদাসের রূপ পাল্টে গেল। কারণ কোন কাগজের পক্ষেই সেইকালে 'বেণু'র বিপ্রদাস ছাপাবার সাহস থাকা সম্ভব ছিল না।...

শরৎচন্দ্রকে বন্দী না করলেও পুলিশ ছেড়ে কথা কইল না। তাঁর পিস্তল ও রাইফেল্ বাজেয়াপ্ত হল, তাঁর গতিবিধি সঙ্গোপনে গুপ্তচরদের দৃষ্টিবন্দী হয়ে থাকলো। পুলিশ বহু চেষ্টা করেও তাঁকে দিয়ে বিপ্লবীদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কলম ধরাতে পারে নি। শরৎচন্দ্র বরং কলম ছেড়ে দিলেন কিছুদিন, তবু একটি অক্ষর-ও তাঁর বেরুল না 'পথের-দাবী'-র ধারকদের বিরুদ্ধে। অথচ আমরা জানি যে, সেই যুগে কারণে ও অকারণে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিকে দিয়েই পুলিশ বিপ্লবীদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক লেখা লিখিয়ে নিয়েছে।...

শরৎচন্দ্র বড়ই অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন বাঙলার যুবশক্তির—বাঙলার বিদ্রোহকামী নারী ও পুরুষের। তাই তাঁর 'নারীর মূল্য'-কে যথার্থ মূল্য দিয়েছেন নারী নিজে, তাঁর 'পথের দাবী'-কে 'গীতা'র মূল্যে গ্রহণ করেছেন বিপ্লবী স্ব-ইচ্ছায়।...

শরৎচন্দ্রের 'সব্যসাচী' সাধারণ লোকের কাছে আজ আর গল্পের নায়ক নয়। তাঁর 'সুমিত্রা'-ও আজ আর অবাস্তব নয়। কারণ বলেছি তো যতীন্দ্রমুখার্জি-সূর্য সেন-রাসবিহারী-নেতাজির পদভারে কম্পিত ভারতবর্ষে তারা 'সব্যসাচী'-র পদধ্বনি শোনে, প্রীতিলতা-লীলারায়-অরুণাআসফআলি বা কর্নেল লক্ষ্মীর পদছন্দে তারা 'সুমিত্রা'-র পথচলা লক্ষ্য করে। কিন্তু জনসাধারণের কাছে অপরিচিত ঐ 'হীরা সিং', 'রামদাস তলোয়ারকর' বা 'নীলকান্ত যোশী'। এঁরা সবার অলক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। এঁদের কেউ চেনে না। কিন্তু যাঁরা কোনদিন বিপ্লবী গুপ্তসমিতির সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা বলবেন যে, শরৎচন্দ্রের হীরা সিং-তলোয়ারকর বা যোশী যেমন অতি বাস্তব—'ব্রজেন্দ্র' বা 'অপূর্ব'-ও তেমনি অতি প্রত্যক্ষ চরিত্র। তাই সবগুলো চরিত্রের সমন্বয়ে 'পথের দাবী' বিপ্লবের গীতা হয়েই বাংলার নরনারীকে তাদের দুর্জয় পথে পথচলার প্রেরণা দিয়েছে। সব্যসাচীর যে প্রেম অপূর্বকে ক্ষমা করেছে, সব্যসাচীর সেই প্রেম-ই ব্রজেন্দ্রকে হত্যা করার সংকল্প নিয়েছে। ক্ষমা করেছেন তিনি ভারতীর বৃহৎ প্রেমকে অভিষিক্ত করার আনন্দে, হত্যার সংকল্প নিয়েছেন তিনি দেশপ্রেমকে সবকিছু বিসর্জন করে প্রতিষ্ঠিত করার গৌরবে। পাত্র ভেদে প্রেমের বিভিন্ন মূর্তি বাঙলার বিপ্লবীর-ও অজানা নয় বলেই তাঁরা জীবন নিতে এবং জীবন দিতে নির্ভুল পথেই আনাগোনা করেছেন কারণ বঙ্কিম

বিবেকানন্দ-দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে শুরু করে রবীন্দ্র-শরতের দেশজননীকেই বিপ্লবীরা চিনেছিলেন। সেই মাকে তাঁরা ভালবেসেছিলেন, তাঁকে উপলব্ধি করতে শিখেছিলেন পরাধীন গণসত্তার মধ্যে। সেই প্রেমময় দৃষ্টি প্রসারিত করে বিপ্লবী চেষ্টা করেছেন ভগবানকে মানুষের উপর নির্ভরশীল করার এবং মানুষকে ভগবানের হাতে সমর্পণ করার সংকেত জেনে নিতে। তাই ভগবানকে বিপ্লবীরা-ও বলতে পেরেছেন :

> "আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
> তোমার প্রেম হত যে মিছে।"

আবার পরক্ষণেই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শুনেছি :

> "চিরদিবসের হে রাজা আমার, ফিরিয়া
> যেয়ো না প্রভু ॥"...

শরৎমানসে বিপ্লবীর রূপ কোন্ অসহ্য সৌন্দর্যে ধরা দিয়েছিল তা 'পথের দাবী'র 'বিনোদে'র ( অপূর্বের দাদা ) কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই : "সকল দেশেই জনকতক লোক থাকে যাদের জাতই আলদা। দেশের মাটি এদের গায়ের মাংস, দেশের জল এদের শিরের রক্ত।...বোধহয় এদেরই কেউ কোন সত্যকালে জননী জন্মভূমি কথাটা প্রথম আবিষ্কার করেছিল।.. এদের বেঁচে থাকা আর প্রাণ দেওয়ার মধ্যে এতটুকুমাত্র প্রভেদ।"

আবার শরৎচন্দ্রের অপূর্বের কণ্ঠে-ও যে-সব্যসাচীকে সে তখনো দেখে নি তারই উদ্দেশে বলতে শুনি : "তুমি ত আমাদের মত সোজা মানুষ নও—তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ; তাইত দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়; তাই ত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড়-পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়। কোন্ বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল—সেই ত তোমার গৌরব।"

অপূর্বের কণ্ঠে-ই আরো শুনি : "তোমাকে অবহেলা করিবে কার সাধ্য! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে ত কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ ভার বহিতে পার বলিয়াই ত ভগবান এত বড় বোঝা তোমার স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন। মুক্তি পথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী! তোমাকে শতকোটি নমস্কার।"...

বিপ্লবীদের মনের কথাকে-ই অনবদ্য ভাষায় ব্যক্ত করেছেন শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী। "বিপ্লব মানেই—ভারতী, কাটাকাটি, রক্তারক্তি নয়। বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্তন। (ব্রিটিশের) সৈন্যদল, বিরাট যুদ্ধোপকরণ এ-সবই আমি জানি। কিন্তু শক্তি-পরীক্ষা ত আমাদের লক্ষ্য নয়। আজ যারা শত্রু, কাল তারা বন্ধু হতে-ও পারে। নীলকান্ত যোশী শক্তি-পরীক্ষা করতে যায় নি, তাদের (মিলিটারি ব্যারাকে—সৈন্যদের) মিত্র করতে গিয়ে-ই প্রাণ দিয়েছিল।...কি বলছিলে ভারতী, সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের মত আমাদের শক্তি? তাই হবে হয়তো। কিন্তু যে-অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জনপদ ভস্মসাৎ করে ফেলে, আয়তনে সে কতটকু জানো। শহর যখন পোড়ে সে আপনার ইন্ধন আপনি সংগ্রহ করে দগ্ধ হয়। তার ছাই হবার উপকরণ তার-ই মধ্যে সঞ্চিত থাকে; বিশ্ববিধানের এ নিয়ম কোন রাজশক্তিই কোনদিন ব্যর্থ করতে পারে না।"

সব্যসাচী বলছেন হিংসা-অহিংসার প্রশ্নে: "দূর থেকে এসে যারা আমার জন্মভূমি অধিকার করেছে—আমার মনুষ্যত্ব, আমার মর্যাদা, আমার ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জল—সমস্ত যে কেড়ে নিলে, তারই রইল আমাকে হত্যা করবার অধিকার, আর রইল না আমার?"

সব্যসাচী আরো পরিষ্কার করে বলছেন যে, সমাজ-সেবা বা রিফর্মারের রাজনীতি-সেবার সঙ্গে 'বিপ্লবের' কোন সম্পর্ক নেই। বলছেন তিনি ভারতীকে: "ভেবেছ মানুষ হবার পথ তোমার (সমাজসেবীর) অবারিত? মুক্ত? ভেবেছ দেশের দরিদ্রনারায়ণের সেবা আর ম্যালেরিয়ার কুইনিন যুগিয়ে বেড়ানোকেই মানুষ হওয়া বলে? বলে না। মানুষ হয়ে জন্মানর মর্যাদাবোধকেই মানুষ হওয়া বলে। মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্তি পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে।"

সব্যসাচী বলছেন: "পরাধীন দেশের মুক্তিযাত্রায় আবার পথের বাছবিচার কি?" শুধু মনে রাখতে হবে: "পরাধীন দেশের শাসক এবং শাসিতের নৈতিক বুদ্ধি যখন এক হইয়া দাঁড়ায় তাহার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর দেশের নাই, ভারতী!"

বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে-ও আমরা অনুরূপ উক্তি অন্য ভাষায় শুনেছি: "সকালে উঠেই স্টেট্‌সম্যান খানা পড়ি। যেদিন দেখি স্টেট্‌সম্যান কোন ব্যাপারে আমাকে সমর্থন করেছে সেদিনই আমি বুঝি যে ভুল পথে আমি পা বাড়িয়েছি।"...

শরৎচন্দ্রের "বিপ্লবীর" রূপ সব্যসাচীর উক্তি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে: "আমি

বিপ্লবী। আমার মায়া নেই, দয়া নেই, স্নেহ নেই—পাপপুণ্য আমার কাছে পরিহাস। ঐ সব ভাল কাজ আমার কাছে ছেলেখেলা। ভারতের স্বাধীনতাই আমরা একমাত্র লক্ষ্য, আমার একটি মাত্র সাধনা। এই আমার ভাল, এই আমার মন্দ—এছাড়া এ জীবনে আর আমার কোথাও কিছু নেই।”…

এরপর বিপ্লবীদের জীবনে শরৎসাহিত্য ও ‘মানুষ”-শরৎচন্দ্রের যে কি অপরিহার্য স্থান ছিল তার ব্যাখ্যা অবান্তর। তবে শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে আজ অবশ্যই বলা চলে যে বিপ্লবীর পাত্র উচ্ছলিত করে যে মাধুরী তুমি দান করেছ—

“তুমি জানো নাই, তুমি জানো নাই,
তুমি জানো নাই তার মূল্যের পরিমাণ!”…

## নবম অধ্যায়

# সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে বিপ্লবীর অবদান

ভারতবর্ষের বিংশশতাব্দীর ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে হিন্দু-মুসলমানের কলহ তথা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই কলঙ্কের ইতিহাস ভারতবর্ষে সবারই জানা শুধু নয়, সবাই অল্পবিস্তর এর বিষময় ফলভোগী।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির মূলে তিনটি কারণ। প্রথম ও প্রধান কারণ হলো ইংরেজের 'Divide and Rule' নামক নীতি। দ্বিতীয় কারণ, মুসলমানের অত্যুগ্র সাম্প্রদায়িক-গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতা। তৃতীয় কারণ, হিন্দুর 'জাত-বিচার' ও বংশগত বর্ণবিভাগ প্রথা। মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যেকার দুর্বলতার ফাটল দিয়ে ইংরেজের ভেদনীতির বিষবৃক্ষ গজিয়ে উঠে উভয় সম্প্রদায়ের শান্তির বনিয়াদ বিচূর্ণ করে দিল। তাই আজ ভাই ভায়ের দুশমন সেজে পাকিস্তান-হিন্দুস্তানের সীমান্তের দুই পারে দাঁড়িয়ে দাঁতখিঁচুনির আসর জমাচ্ছে পরম উৎসাহে।

এসব লড়াই-ঝগড়ার ইতিহাস আজও বেঁচে আছে, অদূর ভবিষ্যতেও বেঁচে থাকবে। কিন্তু যাঁরা এর বিরুদ্ধে আজীবন প্রতিবাদ করে এলেন তাঁদের কথা বড় একটা আমরা মনে করি না। আর যাঁরা ধর্মান্ধ লড়াইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মৃত্যুক বরণ করেছেন, আমরা তাঁদের ভুলেই গিয়েছি।...

উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের **আবদুল গফ্ফর খাঁ**। তাঁর কথা কি আমাদের মনে হয়? আমরা কি ভুলেও স্মরণ করি যে, অখণ্ড পরাধীন ভারতে তাঁর আসন কোথায় ছিল? তাঁকে সবাই জানতো 'ফ্রন্টিয়ার গান্ধী' রূপে। আজ গোটা ভারত-পাকিস্তানে যদি একজন-ও মহাত্মার খাঁটি শিষ্য থাকেন তবে ঐ গফ্ফর খাঁ। আদর্শের জন্যে, সত্যের জন্যে, স্বাধীনতা, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও এক জাতি গঠনের জন্যে খান্‌সাহেবের কর্মসাধনা হাজার দুঃখ ও নির্যাতনের মধ্য দিয়েও আজ পর্যন্ত অটুট রয়েছে।...

তা' ছাড়া হিন্দু-মুসলিম-ঐক্যের জন্যে জীবন দিয়ে গেছেন যাঁরা, তাঁদের ভুলে গিয়েছে দেশের লোক কবে তা' মনে করাও সম্ভব নয়।

আজ আমরা এ-প্রসঙ্গে দু-একটি বিপ্লবীর জীবনদানের কথা স্মরণ করবো। কিন্তু তাঁদের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বলব যে, বাংলা তথা ভারতের 'বিপ্লববাদ' পূর্বাপর হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতা বা মুসলিম-লীগের 'দ্বিজাতি-তত্ত্ব' ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করে এসেছে।

কাজেই একদিন আবুল্‌কালাম আজাদ, ওবেদুল্লা, বরকতুল্লা, মীর্জা আব্বাস, জাফর আলি খাঁ, ডাঃ হাফিজ, আবদুল ওয়াহেদ, ডাঃ মন্‌সুর প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে পাই 'বিপ্লবে'র উদ্গাতা রূপে। আমরা শহিদ-তীর্থে পাই মৃত্যুঞ্জয়ী বীর আসফাক্‌ উল্লাকে। আর পাই অজস্র মুসলমান সেনানী ও বিপ্লবীদেরকে 'আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজে'র সকল স্তরে। নেতাজির আহ্বান প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর কানে পৌঁছেছিল। সেখানে কই—'ধর্ম' বা 'দ্বিজাতি-তত্ত্ব' কোথাও তো জাতীয়তাবোধকে ক্ষুণ্ণ করে নি? কারণ সাম্প্রদায়িক-মন বা ধর্মান্ধতা কঠিন হস্তে সকলেই দূরে সরিয়ে রেখেছিল। কোন দুর্বল মুহূর্তেও ওসব প্রশ্রয় দেবার দুর্মতি কারো হয় নি।

বিপ্লবীরা ১৯০৫ সাল থেকে স্বাধীনতা-আন্দোলনের শেষ দিন পর্যন্ত 'দ্বিজাতি-

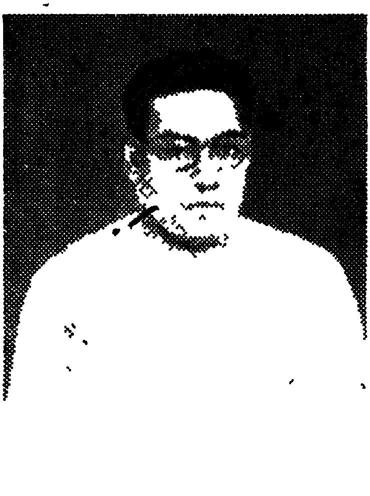

শচীন মিত্র

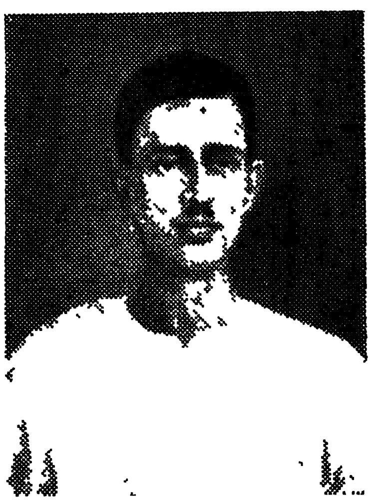

স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

তত্ত্ব' বা 'সাম্প্রদায়িকতা'র বিরোধিতা করে গেছেন। কংগ্রেসের 'খিলাফৎ

আন্দোলন' এবং কারণে-অকারণে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকবুদ্ধির কাছে নতি স্বীকারের দুর্বলতা বিপ্লবীরা জাতীয়-আত্মহত্যার সামিল বলেই মনে করে এসেছেন। ··

কিন্তু ইংরেজের কূটনীতি এবং কংগ্রেসের নীতিজ্ঞানশূন্যতার যোগাযোগে ভারতবর্ষকে দু' টুকরো করে উদ্ভব হলো পাকিস্তানের। কিন্তু তাতে-ও রেহাই নেই। ১৯৪৭ সালেই কলকাতার বুকে সাম্প্রদায়িক-দাঙ্গার সময় 'শান্তিবাণী' প্রচার করবার কালে তিনটি বিপ্লবী নিহত হলেন।

তারিখটা ছিল ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল। নাখোদা মসজিদের কাছে আততায়ীর হস্তে মৃত্যু হলো প্রাক্তন ছাত্রনেতা **শচীন মিত্রের**। ..**সুশীল দাসগুপ্ত** ও **স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়** নিহত হলেন সার্কুলার রোড ও পার্ক্ স্ট্রিট-সংযোগস্থলে।···

সুশীল দাসগুপ্ত

পাকিস্তান হবার পর আজও যাঁরা হিন্দু-জনসাধারণের মানসিক বল রক্ষা করার কর্তব্যবোধে ও নীতিজ্ঞান থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে পড়ে আছেন নানা অপমান, অনাচার ও ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে—তাঁদের কথা কি আমরা ভাবি? তাঁরা তো ইচ্ছা করলেই এদেশে চলে আসতে পারতেন বা পারেন? কিন্তু আসেন না। কারণ, খাঁটি বিপ্লবীর মত অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে তারা থাকতে চান। যাঁরা জনসাধারণের মনোবল এখনো বাঁচিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টায় নিজেদেরকে পাকিস্তানে ক্ষইয়ে দিচ্ছেন তাঁদের মধ্যে মিসেস নেলী সেনগুপ্তা, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, ভবেশ নন্দী, ফণী মজুমদার, মনোরঞ্জন ধর, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, বিনোদ চক্রবর্তী, পুলিন দে, আশু সিংহ প্রমুখ অন্যতম।...

কিন্তু পাকিস্তানের কারাগারে অবরুদ্ধ থেকে শেষটায় জীবনদান করে গেছেন যে বিপ্লবী বীর ও দুঃসাহসী নেতা—তাঁকেও আমরা ভুলে যাই নি কি?

বিপ্লবীদেব মধ্যে গণ-আন্দোলনে যেসব নেতৃস্থানীয় কর্মী সার্থক হয়েছেন তাঁদের সংখ্যা কম। এবং এই বিপ্লবী গণনেতাদেব অন্যতম ছিলেন **সতীন্দ্রনাথ সেন**। ১৯৫৫ সনেব ২৫শে মার্চ অখণ্ড ভাবতবর্ষেব বীর্যবান এই কর্মসাধক পাকিস্তানেব নাগবিক রূপেই ঢাকা জেলে অচিকিৎসায মৃত্যু ববণ কবেন। ভাবতবর্ষ বিভক্ত হবাব পব সতীন্দ্রনাথ জন্মভূমি পবিত্যাগ কবলেন না। পাকিস্তানেব অধিবাসী হয়েই তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মানুষকে 'মানব-অধিকাব' লাভেব চেষ্টায নেতৃত্ব দান কবেন। তাই বাবে বাবে তাঁব স্থান হতে থাকে পাকিস্তানেব কাবাগৃহে। তাই কাবাগৃহ হবণ কবতে পেবেছে তাঁব অমূল্য জীবনশিখা।...

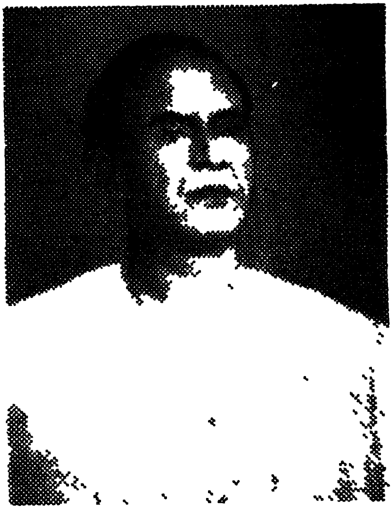

সতীন্দ্রনাথ সেন

*   *   *

পাকিস্তান-হিন্দুস্তান ভাগাভাগি না হলে বৃটিশেব ভেদনীতি সত্ত্বেও 'সাম্প্রদাযিকতা' আজকেব অবস্থায় আসতো না। অর্থাৎ ঘব ছেড়ে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টানদেব পূর্বপাকিস্তান থেকে ভাবতেব গলগ্রহ হবাব জন্যে ছুটে আসতে হোতো না। মাবামাবি, কাটাকাটি কবেও যে-যাব জন্মভূমিতে দিব্যি বসে থাকতে পাবতো। এবং একদিন ইংবেজ বিদায় হলে (বিদায় তাকে হতেই হতো—কংগ্রেস বাতাবাতি বাজ্যপাট নেবাব লোভে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাঞ্জাবেব সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কবে মাউন্টব্যাটেনেব সঙ্গে হাত না মেলালেও) এই সাম্প্রদায়িক-কলহ অতীতেব দুঃস্বপ্নেব মতই দূবে সবে যেত। ..

আমাদেব এই অভিমত যুক্তিহীন আশাবাদ নয়। বস্তুতই আমবা জানি যে, 'ক্যালকাটা কিলিং' বা 'নোযাখালি বায়ট' ইংবেজেব প্ররোচনায় ও মুসলিম-লীগেব দানব-বুদ্ধির লালনে ঘটেছে। আবার এও জানি যে, 'বিহাব বায়ট' সংঘটিত হওয়াতেই নোয়াখালিব সাম্প্রদায়িক-দানবচিত্ত সহসা গান্ধীজিব ভক্ত হয়েছিল—অন্তত মহাত্মাকে 'শান্তিব বাণী' প্রচাব করতে দিয়েছিল।

আমাদের এ-প্রসঙ্গে এইটুকুই বক্তব্য যে, মুরুব্বী ইংরেজ থাকতেই যখন দেখেছি যে শয়তানী-বুদ্ধির সঙ্গে শয়তানী-বুদ্ধির লড়াই চরমে উঠলেও তাতে যা' ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে তার চেয়ে ঢের বেশি ক্ষতি হয়েছে 'শয়তান'কে সালিশ মেনে শিশুর সারল্যে তারই কাছে 'ইন্সাফ' ভিক্ষা করায়,—তখন ইংরেজের অবর্তমানে আমরা কিছু অধিক রক্তারক্তির পর মিলেমিশে নিশ্চয়ই থাকতে পারতাম, অবশ্য দেশবিভাগের মত একটি আস্ত অপকর্ম না ঘটলে।

বিপ্লবীরা এ-বস্তু বুঝতেন বলেই তাঁদের অনেকে ১৯৪৬ সালে জেল থেকে বেরিয়ে এসে 'ফরওয়ার্ড ব্লকে'র মাধ্যমে ঢাকা, কুমিল্লা ও মৈমনসিংহে 'আজাদ হিন্দ্ ভলান্টিয়ার্স' নামে এক বিরাট স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী গড়ে তোলেন জ্যোতিশ জোয়ারদারের নেতৃত্বে। পূর্ববঙ্গের এই কয়টি জেলায় স্বেচ্ছাসৈনিক ও স্বেচ্ছা-সৈনিকার সংখ্যা হয়েছিল এগার হাজার! এক মৈমনসিংহ জেলায়ই স্বেচ্ছা-সেবকের সংখ্যা সাত হাজারের কম ছিল না। স্বেচ্ছাসেবিকাদের সংখ্যা এ জেলায় ছিল দেড়শত, এবং 'বালসেনার' সভ্যসংখ্যা ছিল চার শত। স্বেচ্ছা-সেবিকাদের অধিনায়িকা ছিলেন অনীতা বসু।...

স্বেচ্ছাসৈনিকদের কুচকাওয়াজ, শহরে-গ্রামে 'রুট্'-মার্চ এবং জনসেবার ধরন দেখে দেশের গুণ্ডা ও দুষ্কৃতীদের মধ্যে ভয় ঢুকে গিয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল যে, স্বদেশীবাবুরা বোমাপিস্তল ছাড়া শুধু হাতে 'লেফ্ট-রাইট' করে না!...সুতরাং জোর গুজব থাকা সত্ত্বেও সেই সময় ঢাকা-কুমিল্লায় কোন সাম্প্রদায়িক গোলমাল হয় নি। মৈমনসিংহ-তো সাম্প্রদায়িক কোন দুর্ঘটনারই মুখ তৎকালে দেখে নি, শুধু ঐ 'আজাদ হিন্দ্ ভলান্টিয়ার্স'এর জন্যে। শত শত আদর্শবাদী তরুণ জ্যোতিশ জোয়ারদারদের মত বিপ্লবীদের নেতৃত্বে শহরে-গ্রামে পথেঘাটে নিয়ত মার্চ করলে সাম্প্রদায়িক-দস্যু তো পথকুক্কুরের মত ভয়ে লেজ গুটিয়ে থাকবেই। এই 'আজাদ হিন্দ্ ভলান্টিয়ার্স'-এর কার্যকলাপের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হয়ে শরৎচন্দ্র বসুর কাছে মহাত্মা গান্ধী স্বস্তিবোধ প্রকাশ করেছিলেন।...

কিন্তু ইংরেজ চায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে চিরন্তন সাম্প্রদায়িক-বিভেদ। কংগ্রেস চাইল ইংরেজের ই কাছে, সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের আব্বারকে কুর্নিস ঠুকে, 'সেকুলার স্টেট্' বা অসাম্প্রদায়িক-রাজ্য গড়বার সুযোগ ভিক্ষা!....ফলে দেখা গেল—'আজাদ হিন্দ্ ভলান্টিয়ার্স'এর মৃত্যু, শুভবুদ্ধির সমাধি, এক কোটি হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টানের স্বাধীনতা বিলুপ্তি, সমগ্র পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশ থেকে

সকল অমুসলমান বিতাড়ন !···অবশ্য প্রতিদানে পাওয়া গেছে দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষে সদা কলহরত 'পাকিস্তান' ও 'ভারত' নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র।···

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যারা করে বা যাঁরা করান (অর্থাৎ গুণ্ডা বা স্বার্থান্বেষী পলিটিশিয়ান্‌রা) সেসব লোকের রুচির সঙ্গে বিপ্লবী-মনের যুদ্ধ চিরকালের। এ দুইটি শ্রেণীর মধ্যে আপোষের কথা কখনো শুনিনি। তাই সাম্প্রদায়িক-শান্তি রক্ষার্থে বিপ্লবীরা যেমন জীবন দান করেছেন, সাম্প্রদায়িক-অনাসৃষ্টিকারীদের দমন করতে গিয়েও হিন্দুমুসলমানেরই স্বার্থে তাঁরা ক্ষয়ক্ষতি সানন্দে মেনে নিয়েছেন। এঁদের সংখ্যা-ও সারা বাঙলায় কম ছিল না। আমরা দু'একটি বিপ্লবী-কর্মীর নাম এখানে উল্লেখ করবো।...১৯৩০ সালের কথা। ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হড্‌সনের (এস্‌.-পি.) প্ররোচনায় বেশ লেগে গেছে। 'বিভি'-র কর্মী সমর (গোপা) গুহ (গত ১৭.১২.৬৫ পর্যন্ত ঢাকা ছাড়েন নি) এবং যতীন চক্রবর্তী এই মানবতা-বোধ থেকেই দুষ্ট-দমনে এগিয়ে এসেছিলেন। ফলে দুষ্কৃতীদের বন্দুকের গুলির আঘাতেই সমর গুহ তাঁর বাম চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি চিরতরে হারিয়ে ফেলেন এবং যতীন চক্রবর্তীর পা গুলিবিদ্ধ হয়। কিন্তু তাতে তাঁদের নালিশ ছিল না, অথবা হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি-রক্ষায় তাঁদের বিশ্বাস কোনকালে ক্ষুণ্ণ হয় নি।···

বিপ্লবীরা গুণ্ডা ও সাম্প্রদায়িকতাপন্থীদের সঙ্গে কোনকালে আপোষ করেন নি। তাঁরা যে হিন্দুমুসলমানকে সম্মিলিত করার সংগ্রামে জীবন দিয়েছেন এবং এই চেষ্টাকে যারা বিঘ্নিত করতে চেয়েছে তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন-ও করেছেন বা করতে চেয়েছেন সেই সত্য উদ্‌ঘাটিত করাই আমাদের এখানে উদ্দেশ্য।

কিন্তু কংগ্রেসের ইতিহাস অন্যরূপ ছিল বলেই জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সংগঠন কোনকালে সেখানে যথার্থ মর্যাদা পায় নি। এমন-যে সীমান্ত গান্ধী ও তাঁর শক্তিশালী 'রেড্‌সার্ট্‌'-বাহিনী, তাঁদের সঙ্গেও কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করল। ফলে ভারতবর্ষ 'সাম্প্রদায়িকতা' রূপ 'কম্বল'কে আতঙ্কের সহিত সর্বদা বর্জন করতে চাইলেও 'কম্‌ব্লি নেহি ছোড়্‌তা হ্যায়' !···

---

# দশম অধ্যায়

# 'বি-ভি'র ইতিহাস

## দলের প্রতিষ্ঠাতা হেমচন্দ্র ঘোষ

হেমচন্দ্র ঘোষের পৈতৃক জন্মভূমি বরিশাল জিলার গাভা গ্রামে হলেও তিনি জন্মগ্রহণ করেন ঢাকা শহরে। তারিখটা হচ্ছে ১৮৮৪ সালের ২৭শে অক্টোবর। তাঁর পিতা মথুরানাথ ঘোষ মহাশয় সপরিবারে ঢাকা শহরে বাস করতেন। পিতা ছিলেন আইনব্যবসায়ী। হেমচন্দ্র তার চতুর্থ ও কনিষ্ঠ পুত্র। পড়তেন তিনি ঢাকা জুবিলি স্কুলে। ছোট বয়সেই হেমচন্দ্র ছিলেন ভিন্ন ধাতের ছেলে। স্কুলের বাইরের পুঁথিপত্র পাঠে তার বিশেষ উৎসাহ ছিল। ডনকুস্তি, লাঠিখেলা, সাঁতার প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে তার পারদর্শিতা প্রশংসা পেত। ছোট

হেমচন্দ্র ঘোষ

বয়স থেকেই ইংরেজের প্রভুত্ব ( ভাল করে না বুঝলেও ) তার ভাল লাগত না। নীল-বিদ্রোহের কথা শুনতে, রাজপুত-কাহিনী পড়তে, বারভূঁইয়াদের কীর্তি

জানতে এবং সিপাহী-বিদ্রোহের গল্প আলোচনা করতে বালক-কালেই তিনি উৎসাহ পেতেন। কিন্তু ১৮৯১ সালে 'মণিপুর-যুদ্ধে' অবরুদ্ধ মহাবীর টিকেন্দ্রজিৎ ও জেনারেল থাঙ্গাল্‌কে ফাঁসি দেবার কাহিনী হেমচন্দ্রের শিশু-চিত্তেও বৃটিশদ্রোহী-ভাব ধাক্কা দেয়। স্বাধীন মণিপুরের পতন তাঁর চোখের সম্মুখে ঘটে। স্বাধীন মণিপুরের স্বাধীন নায়কদের নৃশংস মৃত্যুদণ্ড তাই বালক হেমচন্দ্রকে গভীরভাবে বিচলিত করে।...তারপর একদিন ঘটে 'বুয়র যুদ্ধ'।...বিজয়লক্ষ্মী তথাকথিত দুর্বলের ললাটে জয়তিলক এঁকে দেন। এবার হেমচন্দ্রের কিশোর মন আশ্বস্ত হয়। তিনি ভাবেন—দুর্বলও তা হলে শক্তিমান হতে পারে!...

১৯০১ সালের ১৩ই এপ্রিল ঢাকাতেই অল্পক্ষণের জন্যে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে হেমচন্দ্র ও তাঁর এক বন্ধু সাক্ষাৎ করেন। স্বামীজির দিব্যমূর্তি হেমচন্দ্রকে বিদ্যুৎস্পর্শে এক অপূর্ব চেতনার লোকে নিয়ে যায়। বিবেকানন্দ দু-একটি কথাই বলেছিলেন তাকে। কিন্তু তার চেয়ে অনেক কথা বলেছিল স্বামীজির দু'টি প্রশান্ত চোখের গভীর দৃষ্টি। মন্ত্রের মত সেই দু-একটি কথা গেঁথে আছে হেমচন্দ্রের প্রাণে। তিনি আবৃত্তি করেন সেই বাণী: "পরাধীন জাতির ধর্ম নেই। তোদের একমাত্র ধর্ম মানুষের শক্তি লাভ করে পরস্বাপহারীকে তাড়িয়ে দেওয়া।"...

একদিন পরেই কতিপয় বন্ধুসহ হেমচন্দ্র আবার স্বামীজির সঙ্গে দেখা করেন, এবং তাঁর আশীর্বাদ-বাণী অধিকক্ষণ শুনবার অবকাশ তাঁদের হয়।* ...

**আনন্দমঠ** বেরিয়েছে ১৮৮২ সনে। আনন্দমঠ বিপ্লবীদের কাছে তুলে ধরেছিল বৈপ্লবিকসংস্থা গঠনের আদর্শ ও টেকনিক। কাজেই ঋষি-বঙ্কিমের এই গ্রন্থখানা বিপ্লবীচিত্তকে জীবনবেদের মর্যাদায় আলোড়িত করে দিল।...

১৮৯৭ সালে বালক বয়সেই উল্লাসকর দত্তের সঙ্গে হেমচন্দ্রের পরিচয় হয়। ১৯৯১ সালে বারীন ঘোষের সঙ্গে হেমবাবু যোগাযোগ করেন। তৎকালে উল্লাসকরের পিতা দ্বিজদাস দত্ত ঢাকা কলেজে বিজ্ঞান-অধ্যাপক ছিলেন, এবং বারীন ঘোষের দাদা মনোমোহন ঘোষ ছিলেন ঐ কলেজের-ই ইংরাজির অধ্যাপক। বারীনবাবু দাদার কাছে থেকে কলেজে পড়ার জন্যে ঢাকা এসেছিলেন।...

এর পর আসে ১৯০৪-১৯০৫ সালের রুশোজাপানী যুদ্ধের কাল। এই যুদ্ধে

*ডক্টর ভূপেন দত্ত প্রণীত 'Swami Vivekananda, Patriot-Prophet' গ্রন্থের পৃঃ ১৩১—১৩৫ দ্রষ্টব্য।

শ্বেত-রুশ পীত-জাপানের কাছে হেরে যায়। এশীয়-জাতিগুলোর রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। জনসাধারণের মুখেও সম্বিৎ ফিরে পাবার ছায়া।…এ সময়ই হেমচন্দ্রও তাঁর বিপ্লবী-দল গড়ে তোলবার কাজে নিযুক্ত হন।…

১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর হেমচন্দ্র প্রখ্যাত পি, মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি' স্থাপনের জন্যে মিত্রসাহেব ঢাকায় এসেছিলেন। পুলিন দাস মহাশয় 'অনুশীলন সমিতি'র সম্পাদক পদে বৃত হন।…

হেমচন্দ্র সঙ্গোপনে তাঁর গুপ্তসমিতির নাম দিলেন **'মুক্তিসংঘ'**। তৎকালীন কর্মীদের কণ্ঠে ইহা গোপন মন্ত্রের মত ছিল।…

বন্ধু রূপে তখনই তাঁর সঙ্গে এসে গেছেন শ্রীশ পাল, গুণেন ঘোষ, মাখন চক্রবর্তী, হরিদাস দত্ত, খগেন দাস, রাজেন গুহ, বিভূতি বসু, ক্ষিতিপতি মিত্র, নিকুঞ্জ সেন (বড), কৃষ্ণকান্ত অধিকারী, ডাঃ সুরেন্দ্র বর্দ্ধন, হরিদাস রায়, মুন্সী আলিমদ্দিন আহমেদ (মাস্টারসাহেব), সতীশ সাহা, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ।

ডাঃ সুরেন্দ্র বর্দ্ধন

হেমচন্দ্র নিজের দলের পৃথক সত্তা বজায় রেখেই ঢাকাতে 'অনুশীলন সমিতি'র সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ শুরু করলেন।

১৯০৫ সালের 'বঙ্গবিচ্ছেদ' এই তরুণ-কিশোরদের চরিত্র গঠনে, কর্মতৎপরতায়, সাংগঠনিক-ক্ষমতালাভে ও দেশাত্মবোধের বিকাশে বিশেষ সাহায্য করেছে। তার চেয়ে বেশি সাহায্য করেছে এদেরকে বিদ্রোহের ধারায় পরিস্নাত হবার সুযোগ দিয়ে।

তরুণ হেমচন্দ্রের নেতৃত্বে 'মুক্তিসংঘ' যথার্থ বিপ্লবী কর্মী গড়ায় তৎপর হয়ে উঠলো। ১৯০৬ সালে হেমবাবু কলকাতা এসে ভবানী দত্ত লেনে তাঁর এক বন্ধুর বাসায় রইলেন। এই সময়ই ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ঘটে। এবং, ব্রহ্ম-বান্ধবের সঙ্গে গভীর আলোচনার ফলেই তিনি স্পষ্ট করে তাঁর চলার পথ খুঁজে পান। তাঁর আশীর্বাদ হেমবাবুর বিপ্লবী-জীবনে মস্ত বড় সম্বল ছিল। সেবারই তিনি শ্রীঅরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, বিপিন পাল, সতীশ মুখার্জি (ডন্ সোসাইটি)

প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরিচিত হন এবং বিপ্লবের তত্ত্ব, দর্শন, ইতিহাস ও কর্মধারা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হবার চেষ্টা করেন।...

ঢাকায় ফিরে এসে দ্বিগুণ উৎসাহে ও যত্নে হেমচন্দ্র দল গড়ায় প্রবৃত্ত হলেন। ক্রমে কলকাতায় একটি আস্তানা করা হল। শ্রীশ পাল মুক্তিসংঘের কলকাতা শাখার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্যে গুণেন ঘোষ, হরিদাস দত্ত ও খগেন দাস কলকাতা চলে এলেন।

১৯০৯ সালে হেমচন্দ্রের পরিচয় ঘটে বিপ্লবী নেতা যতীন মুখার্জির সঙ্গে।... ১৯১৩ সালের দামোদর বন্যা এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই বন্যায় দুর্গত-ত্রাণের কাজে বিপ্লবীরা অপূর্ব সেবা-দানের ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন। প্রত্যেক বিপ্লবীদলই নিজেদের সঙ্গতি ও জনবল অনুসারে সেবার কার্যে আত্মনিয়োগ করে। হেমচন্দ্রের বন্ধুরাও পিছিয়ে রইলেন না। শ্রীশচন্দ্রের নেতৃত্বে হরিদাস দত্ত ও প্রতুল ঘোষ প্রমুখ আর্তত্রাণের কাজে খুবই যোগ্যতা দেখান।...নেতা যতীন মুখার্জি তাদের কাজে তুষ্ট হয়ে তাঁদের দলের নেতা হেমচন্দ্র ঘোষকে একটি রাইফেল ও একটি ব্রীচ-লোডার প্রতুল ঘোষের মারফৎ ঢাকায় পাঠিয়ে দেন। এ উপঢৌকন সশ্রদ্ধায় গ্রহণ করে হেমচন্দ্র খুবই গর্ববোধ করেছিলেন।...

১৯১৩ সালেই বিপ্লবনায়ক রাসবিহারী বসুর সঙ্গে হেমচন্দ্র ঘনিষ্ঠ হন।... ব্রহ্মবান্ধব, শ্রীঅরবিন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার সান্নিধ্যে এসে বিপ্লব, জাতীয়তাবাদ, বিশ্ববোধ সম্পর্কে হেমচন্দ্রের কিছু স্পষ্ট ধারণা হয়। তা ছাড়া আনন্দমঠের **বিশ্বজননীর ক্রোড়ে দেশজননীর** কল্পনা তাঁকে চিরকালই জিঙ্গোইজম্-বিরোধী করে রেখেছিল। তাঁর স্বদেশের মুক্তি যে বিশ্বকল্যাণের জন্যেই প্রয়োজন, এ সত্য তিনি বুঝেছিলেন। নিজের দল আদর্শে, নিষ্ঠায় ও আভিজাত্যে সংগঠিত হতে থাকলেও তিনি কূপমণ্ডুক হয়ে থাকার পক্ষে ছিলেন না। সুতরাং প্রয়োজনে তিনি অনুশীলন বা যুগান্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন।...

ইতিমধ্যে দলের শাখা কলকাতায় স্থাপিত হয়ে গেছে। তার ভার নিয়েছেন শ্রীশ পাল। শ্রীশ পাল তৎকালে বিপিন গাঙ্গুলি মহাশয়ের 'আত্মোন্নতি' দলের সঙ্গে হেমচন্দ্রের পক্ষ থেকে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তা'ছাড়া যতীন মুখার্জি মহাশয়ের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। কিন্তু শ্রীশবাবুর বন্ধু গুণেন ঘোষ শ্রীশবাবুরই নির্দেশে তাঁর সহকারী রূপে অবিনাশ চক্রবর্তীর (মুনসেফ) মাধ্যমে যতীন মুখার্জির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতেন। অবিনাশবাবু এবং যতীন মুখার্জি

জানতেন যে গুণেন ঘোষের সম্পূর্ণ আনুগত্য ছিল হেমচন্দ্রের দলের প্রতি। গুণেনবাবুর ডাক নাম ছিল 'হরি ঘোষ'। বাড়ি ছিল ঢাকা জিলায় 'সোল্লা' গ্রামে।...তিনি শুভাঢ্যা-অস্ত্র-মামলায় দণ্ডিত হরিদাস রায়ের আত্মীয়।...

বিপিনবাবুর 'আত্মোন্নতি' দলের সঙ্গে শ্রীশ পালের মাধ্যমে 'মুক্তিসংঘে'র মিলেমিশে **প্রথম বৈপ্লবিক-য়্যাক্‌শান্‌** হল—১৯০৮ সালের ৯ই নভেম্বর কলকাতা সার্পেণ্টাইন্‌ লেনে শ্রীশ পাল কর্তৃক-ই পুলিশের নন্দলাল ব্যানার্জিকে হত্যা ( বিশদ বিবরণ এ-গ্রন্থের রডা-অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য )। *

*　　　*　　　*　　　*

**দ্বিতীয় কাজ হল**—১৯১২ সালে জগদ্দল অঞ্চলে ( ২৪ পরগণা ) আলেকজাণ্ডার জুট মিলের বিলাতী ইঞ্জিনিয়ার রবার্ট ওব্রায়েন্‌কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র। ভারতীয়-বিদ্বেষী ওব্রায়েন ইতিপূর্বে ক্রোধের বশে সামান্য কারণেই মিলের একটি বাঙালী কেরানীকে পদাঘাতে মেরে ফেলেন। ব্যারাকপুর কোর্টে ইউরোপীয় বিচারকের কাছে বিচারে সাহেবের ৫০৲ টাকা জরিমানা হয়! ইহাতে দেশে খুব বিক্ষোভ সৃষ্টি হল। একটি স্বদেশবাসীর জীবনের মূল্য শ্বেতজাতির কাছে মাত্র ৫০৲ টাকা ধার্য হওয়ায় সংবাদপত্রগুলো আন্দোলন করে। আত্মোন্নতির নেতৃবৃন্দ শ্রীশ পালের সঙ্গে 'প্রতিশোধ' নেবার জন্য একটা কিছু করার কথা আলোচনা করেন। শ্রীশ পাল ও অনুকূলবাবু পরামর্শ করে তাই ওব্রায়েন-এর গতিবিধি লক্ষ্য করার উদ্দেশে হরিদাস দত্ত ও খগেন দাসকে জগদ্দল পাঠান। খগেনবাবু ও হরিদাসবাবু দিনের পর দিন পুরো তিনটি মাস সাধারণ কুলির বেশে ঐ চটকলে কুলির কাজই করেছিলেন। অমানুষিক ধৈর্য ও কৃচ্ছ্রসাধনের এরূপ নজির খুব বেশি আমরা খুঁজে পাব না। কিন্তু ষড়যন্ত্র ফেঁসে গেল। ওব্রায়েন রক্ষা পেল। হরিদাসবাবু পলাতক হলেন। ..."আলোচ্য সময়ে এস-এস-হাভিলদার নামে এ্যামেরিকান জাহাজের এক ডাক্তারের সঙ্গে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির বন্ধুত্ব ছিল। সেই ডাক্তারের সাহায্যে বিপিনবাবু শেষে হরিদাস দত্তকে ঐ জাহাজের 'স্টোর-কীপার করে কিছুদিন বিদেশে পাঠিয়ে দেন। সেই জাহাজ বন্দরে বন্দরে ঘুরে মাস কয়েক পর আবার কলকাতা ফিরে আসে। তখন হরিদাসবাবু পুনরায় গা-ঢাকা দেন।"...

বিপ্লব প্রচেষ্টার একটি বিস্মৃত অধ্যায়—সাঃ বসুমতী,

*এই গ্রন্থের 'পত্রসংগ্রহ' অধ্যায়ের চার নং ও পাঁচ নং পত্র দ্রষ্টব্য।

**তৃতীয় কাজ হল**—১৯১৪ সালের ২৬শে আগস্ট রডা-অস্ত্র-সংগ্রহের বিস্ময়কর অভিযান ( রড়া-অধ্যায় দ্রষ্টব্য )।...

**চতুর্থ কাজ হল**—১৯১৫ সালের ২৫শে আগস্ট স্পাই মুরারি মিত্রকে তার আগড়পাড়ার গৃহেই শ্রীশ পাল কর্তৃক গুলীর আঘাতে নিধন। এই কাজে শ্রীশবাবুর সহযোগী ছিলেন আত্মোন্নতির ( বরাহনগর ) প্রখ্যাত বিপ্লবী খগেন চট্টোপাধ্যায়।...

আজ এ কথা কারো অজানা নেই যে, ১৯০৫ সালের পূর্বে বাংলা দেশে এবং মহারাষ্ট্রে গুপ্তসমিতিগুলো দানা বেঁধে উঠেছিল। ১৯০৫ সালের পর থেকে অবশ্য এ-সব গুপ্তসমিতি ( বাংলায় অন্তত ) স্বদেশী-আন্দোলনের ধারাস্নানে সাংগঠনিক-শক্তি আয়ত্ত করে পল্লবিত হয়ে চলল। পূর্বেই ভূমিকায় বলা হয়েছে যে বাংলা দেশে প্রধানত দু'টি দল পরিচিত হয়ে উঠেছিল 'যুগান্তর দল' ও 'অনুশীলন সমিতি' নামে। 'অনুশীলন সমিতি' সারা বঙ্গে একটি 'ইউনিটারি' পার্টি ছিল। কিন্তু 'যুগান্তর' তা নয়। বঙ্গদেশে জিলায় জিলায় বহু বিপ্লবীদল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই দলগুলো যতীন মুখার্জির বিরাট নেতৃত্বে ১৯১৪ সালে 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধে'র প্রারম্ভে একটি বৃহত্তর দল-সমাবেশ রূপে বৈপ্লবিক কর্মে আত্মনিয়োগ করে। ইংরেজের সরকারী রিপোর্টে এই দলসমাবেশকে অধুনালুপ্ত বিপ্লবী 'যুগান্তর পত্রিকা'র নামানুসারে বলা হয়েছে 'যুগান্তর পার্টি'।...ক্রমে দলের কর্মীরাও পার্টির পরিচয় দিতে স্বেচ্ছায় ও স্বাভাবিকভাবে উক্ত নামই গ্রহণ করেন। এই দু'টি বিপ্লবী-প্রতিষ্ঠান ব্যতীত হেমচন্দ্রের 'মুক্তিসংঘ' এবং বিপিনবাবুর 'আত্মোন্নতি' আলাদা সত্তা নিয়ে বেড়ে উঠলেও উভয় দল কিছুকাল কলকাতায় ( ১৯০৮ থেকে ১৯১৫ ) একত্রে কাজ করেছে। তা ছাড়া হেমচন্দ্রের দল পূর্বাপর যুগান্তরের সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখে গোপনে ও প্রকাশ্যে ( কংগ্রেসে ) কাজ করেছে। যুগান্তরের নেতারা যেদিন সুভাষচন্দ্রকে ত্যাগ করে গান্ধীবাদী-কংগ্রেসের সঙ্গে কার্যত হাত মেলালেন সেদিন থেকে হেমচন্দ্রের দলের স্বভাবতই আর যুগান্তরের সঙ্গে রাজনীতিক-যোগাযোগ রইল না। অবশ্য তখন তাঁরা ( যুগান্তরের বন্ধুরা ) 'বিপ্লবী যুগান্তর পার্টি' লিকুইডেট্ করে দিয়েছেন। সেটা হল ১৯৩৮ সাল।...

১৯৩৯ সাল থেকে সুভাষচন্দ্রকে প্রকাশ্য রাজনীতিতে সংগ্রামী-কংগ্রেসের নেতা রূপে গ্রহণ করে যাঁরা কর্মে ঝাঁপ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হেমচন্দ্রের দল, পূর্ণ দাসের দল, কৃষ্ণনগরের তারক ব্যানার্জি ও উত্তরবঙ্গের দল, উত্তর কলকাতার অমর বসু ও হেমন্ত বসুদের দল এবং অনুশীলন-সমিতিই বিপ্লবী-দলগুলির মধ্যে প্রধান।...অনুশীলন ও যুগান্তরের কংগ্রেস-পলিটিক্সে নেতা-নির্বাচন ব্যাপারে উভয় দলের 'দলগত-মনান্তর' অনেকটা দায়ী। সম্ভবত দলগত 'মনান্তর'ই পরে 'মতান্তরে' রূপ নিয়েছিল। 'মতান্তর' থেকে মনান্তরে' যায় নি।...কিন্তু 'বি-ভি' এবং পূর্ণ দাসের দল সুভাষচন্দ্রের মধ্যে যথার্থ বিপ্লবীসত্তা প্রথমাবধিই আবিষ্কার করেছিল বলে তারা শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্যে সুভাষচন্দ্রকেই বিপ্লবীদের যোগ্যতম মুখপাত্র রূপে বরণ করে এসেছে।...এবার পূর্ব কথায় ফিরে যাই।...

সর্বভারতীয়-সশস্ত্র-উত্থান তথা 'ভারত-জর্মান-ষড়যন্ত্র' ব্যক্ত ও ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় পুলিশী-নির্যাতন শুরু হল। দলে দলে যুবক বিনাবিচারে বন্দী হলেন। অপরাপর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে হেমচন্দ্রও প্রথম মহাযুদ্ধের 'যুদ্ধবন্দী' হলেন 'তিন আইনে' ( Regulation III, 1818 )...। সকল দলেরই ছোট-বড় কর্মীরা কারাগৃহে বা পলাতক অবস্থার চাপে পড়ে কাল কাটাতে লাগলেন।...

জাতির যৌবন বন্দী।...জাতির জীবন স্তিমিত।...দেশের বুকে ঘনায়মান অন্ধকার।...

কিন্তু—"রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?" ..

## মুক্তিসংঘের ক্রমবিকাশ
( ১৯২০-১৯২৮ )

১৯২০ সালের শেষের দিকে প্রায় সমস্ত বিপ্লবী নেতা ও কর্মী মুক্তি পেয়ে গেলেন। 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড্ রিফর্মস্ এ্যাক্ট'-এর প্রবর্তনকালে মহামান্য ভারত সম্রাটের শুভ 'জেশ্চার্' এটা ? হেমচন্দ্রও দীর্ঘকাল পর কারামুক্ত হয়ে ফিরে এসে দেখলেন যে 'দল' বলতে তাঁর তেমন কিছু অবশিষ্ট নেই। হেমচন্দ্রের সাংগঠনিক-বুদ্ধি প্রখর থাকায় তাঁর দল গড়ার হিসেব ছিল আলাদা। তিনি কোনকালেই 'কোয়ান্টিটি'-র উপর জোর দিতেন না, তাঁর লোভ ছিল 'কোয়ালিটি'-র উপর। তাঁর হিসেবে যাঁরা পলাতক ছিলেন ( পুলিশের তাড়নায় ) অথবা যাঁরা

জেল থেকে বেরিয়ে এলেন—তাঁরা পুলিশের পরিচিত হয়ে গেছেন বলে গুপ্ত-সমিতি সংগঠনের কাজে অনুপযুক্ত। তা' ছাড়া যে সামান্য ক'টি কর্মী পুলিশের কাছে অজ্ঞাত থেকেই জেলের বাইরে সহজ জীবন যাপন করছিলেন, তাঁদেরও অনেকে অর্থকৃচ্ছ্রতায় অথবা অর্থপ্রাচুর্যে অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছেন। সুতরাং তিনি স্থির করলেন যে যথার্থ কাজের জন্যে তৈয়ের হতে হলে সম্পূর্ণ নূতন দল গড়তে হবে, সেই দলের কর্মীদের শিরায় প্রবাহিত থাকবে নূতন রক্ত। এই নূতন দল গড়ার দায়িত্ব অবশ্য বিশ্বস্ত ও পুরাতন নেতৃস্থানীয় কর্মীদের কয়েকজনের উপরই ন্যস্ত হল।…

হেমচন্দ্রের সৌভাগ্য যে তাঁরই বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহকর্মী মন্ত্রগুপ্তি-শিক্ষায় পারদর্শী **প্রমথ চৌধুরী** ঢাকায় বসে অতি সংগোপনে দলের একটি নিউক্লিয়াস্ বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর সধৈর্য নেতৃত্বে সবার অজ্ঞাতে হেমচন্দ্রের ভবিষ্যৎ কর্মীবাহিনী জন্মলাভ করছিল। এই কর্মিবৃন্দ অনলসচিত্তে অপেক্ষা করছিলেন নেতাদের ফিরে আসার দিনটির জন্যে। ১৯২০ সালের পর থেকে খগেন দাস, সুরেন বর্ধন, কৃষ্ণ অধিকারী ও মাস্টার সাহেব (আলিমদ্দিন সাহেব) অতি সংগোপনে ও ধীরে ধারে 'সেল্'-সিস্টেমে সংগঠন-কার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন প্রধানত মফস্বলে বা শহরের প্রান্তে। মাস্টার-সাহেব বেশিদিন কাজ করতে পারেন নি। দারুণ যক্ষ্মারোগে যৌবনেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সংগঠনক্ষমতা ও মন্ত্রগুপ্তি-পালনের শিক্ষা ছিল প্রশংসনীয়। তাঁরই মাধ্যমে অতি স্বাভাবিকতায় সেকালে মুসলমান কর্মিগণ দলীয় সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁরা কিন্তু তখন জাতিধর্মনির্বিশেষে দল গড়ে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক এক স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন এই দলেব কর্মীদের চোখে দেখেছিলেন। কিন্তু এ বস্তু দেখেছিলেন তাঁরা মাস্টার সাহেবের চোখ দিয়ে। তাই মাস্টার সাহেবের মৃত্যুতে তাঁদের স্বপ্ন-দেখার চোখ এবং আদর্শ বুঝবার মন অন্তর্হিত হয়ে গেল! বিপ্লবের পথ থেকে তাঁরা হারিয়ে গেলেন!…

হেমচন্দ্র ও দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ জেল থেকে ফিরে আসতেই ঢাকার কেন্দ্রকে আশ্রয় করে নূতনতর জীবনদ্যোতনায় দল-গঠন ও দল-প্রসারের কাজ শুরু হয়েছিল। দলের সর্বাধিনায়ক ও অন্যান্য নেতারা একমত হয়ে স্থির করেছিলন যে সুদৃঢ় ভিত্তিতে দেশব্যাপী বৃহত্তর দল না গড়ে কোন 'ওভার্ট্-এক্ট্'-এর প্রশ্রয় তাঁরা দেবেন না।

এমন কি প্রস্তুতি না হলে বাংলায় অপরাপর বিপ্লবীদলগুলোর আহ্বানেও তাঁরা সংকল্পচ্যুত হবেন না।...

হেমচন্দ্র জানতেন যে বিপ্লবীদলের প্রধানত শক্তি নিহিত থাকে তার সংগোপন অস্তিত্বে। সত্যিকারের গুপ্তসমিতি না গড়তে পারলে বিপুল শক্তিধর ব্রিটিশের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এই যে মন্ত্রগুপ্তি-রক্ষার নীতি, এ পালন করতে হবে অপরাপর বিপ্লবীদলগুলো সম্পর্কে-ও। তাই তিনি প্রচার করলেন যে তিনি ও তাঁর 'সবার জানিত' বন্ধুগণ রাজনীতি ত্যাগ করে আত্মিক-সাধনায় বা ঘর-গৃহস্থালিতে মন দিলেন। শুধু প্রচার নয়, তাঁদের কার্যকলাপে পুলিশ পর্যন্ত বিশ্বাস করে ফেলল যে হেমবাবু সত্যি রাজনীতি ছেড়ে ধর্মচর্চায় লিপ্ত হয়েছেন, এবং তাঁর বন্ধুরাও রুজিরোজগারের ধান্দায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে সাধারণ সংসারীর স্তরে চলে গেছেন।...

হেমবাবু ঢাকা থেকে বাস উঠিয়ে কলকাতা চলে এলেন। শ্রীশ পাল, হরিদাস দত্ত, **হরিদাস রায়** ( শুভ্যাঢ্যা-অস্ত্র-মামলায় দুই বৎসর দণ্ডপ্রাপ্ত ), খগেন দাস প্রমুখ পুলিশের সুপরিচিত কর্মিবৃন্দ দলেরই নির্দেশে সক্রিয় রাজনীতি স্থগিত রেখে সুদূর পল্লীতে বা শহরে নিজেদের লোক-দেখানো সাংসারিক-স্থান করে নিলেন। তাঁদের চলাফেরায় তাঁদের আত্মীয়স্বজনও সোয়াস্তির নিশ্বাস ছেড়ে ভাবলেন—দস্যি ছেলেরা এবার ঘরে ফিরে এলো !...

এ-পন্থায় দল-সংগঠন শুরু করে হেমচন্দ্র ও তাঁর বন্ধুবা কৃতকার্য হতে পেরেছিলেন বলেই বহু পরে একদিন অমলেন্দু দাসগুপ্ত তাঁর প্রখ্যাত পুস্তক **'বক্সা ক্যাম্প'**-এ হেমচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে অতি সংক্ষেপে, অতি সুন্দরভাবে বলতে পেরেছিলেন : "ফল দিয়া বৃক্ষের পরিচয়, এই সংকেতটুকু প্রয়োগ করিলেই হেমবাবুর প্রকৃত পরিচয় আপনারা পাইবেন।"...( পৃঃ ১৩৯ )

আরো পরে হেমচন্দ্রের সাফল্যকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে ১৯৫৭ সালের ২৪শে নভেম্বর তাঁর ত্রিসপ্ততিতম জন্মদিবসে 'হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড' পত্রিকা তাঁকে অভিহিত করেছিলেন 'Prince among Patriots' বলে। সে উৎসব-সভায়ই কলিকাতা কর্পোরেশানের তৎকালীন মেয়র ডাঃ ত্রিগুণা সেন আবেগমুগ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন : "I seek the blessings of Hemchandra personally as well as on

behalf of the Bengali race so that they may not falter from the path of duty and devotion in pursuit of their Ideal." তিনি আরো বলেছিলেন : "I am an ardent believer in the youth of Bengal as a living force and given guidance and leadership they are sure to pursue in right earnest the task and tradition bequeathed to them by Sages like Hemchandra." ( Hindusthan Standard, 24-11-57 )

পূর্বেই বলা হয়েছে যে প্রমথ চৌধুরি ( টেনুবাবু ) প্রথম মহাযুদ্ধের সামান্য পূর্ব থেকেই দলের 'ডাইরেক্ট এ্যাক্‌শ্যান্‌' ইত্যাদির স্পর্শ বাঁচিয়ে অতি সংগোপনে ঢাকা-শহরে সংগঠনের কাজটুকু বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে তাঁর সহায়কদের অন্যতম ছিলেন কিশোর প্রমথ ( বুধু ) চক্রবর্তী। এর পর ১৯১৫-'১৭ সালে অনিল রায়, নিশীথ চৌধুরি, প্রভাস ঘোষ প্রমুখের আগমনে দলের সংঘশক্তি সম্ভাবনাস্থন্দর হতে থাকে। ১৯১৭-'১৮ সালে সত্যগুপ্ত, রসময় শূর, ভবেশ নন্দী, প্রফুল্ল দত্ত, মনীন্দ্র রায়, স্থরেন দত্ত, প্রফুল্ল মুখার্জি, ধরণী ভট্টচায, স্থরেশ চক্রবর্তী, অনাথ আদিত্য, তরুণি চক্রবর্তী, স্থশীল কুশারী এবং ভূপেন রক্ষিত-রায় প্রমুখ কর্মী উক্ত সংস্থায় যুক্ত হবার পর সংঘশক্তি ক্রমশ উদ্বেল হয়ে ওঠে।

হেমচন্দ্র নিজে বিদ্যানুরাগী ও কুস্তিগীর হওয়ায় এই দলে বিদ্যাশিক্ষা এবং শারীরচর্চার ঝোঁক খুব বেশি দেখা যায়। তাঁর নূতন দলসমাবেশে স্বাস্থ্যবান ও মেধাবী ছাত্রদের অনুপ্রবেশ লক্ষ্যণীয়।

এ সংস্থার দৃষ্টি দু'টি দিকে বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ থাকতো। প্রথম, মন্ত্রগুপ্তি-শিক্ষা। দ্বিতীয়, স্বাস্থ্য ও বিদ্যাচর্চা। বাঙলার স্বাস্থ্যবান বিদ্যানুরাগী তরুণদল শক্তির চর্চায় আত্মনিয়োগ করুক, ইহাই ছিল বিপ্লবী হেমচন্দ্রের কামনা। ফলে তাঁর দলের ছেলেরা যেমন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও দুর্দান্ত হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি তাঁরা স্কুল-কলেজের ভাল ছাত্রও ছিলেন।...

পুলিশের অজ্ঞাত এই যুবকগোষ্ঠী যথাযোগ্য নেতৃত্বের আশীর্বাদে ১৯১৯ থেকে ১৯২৯ সালের পরিসরে সমবেত-কর্মপরিচালনায় অবিচলিত শক্তিতে ঢাকা, মৈমনসিংহ, কুমিল্লা, রঙপুর, কলকাতা, ২৪-পরগনা, মেদিনীপুর বা পাটনায় যে সংঘব্যাপ্তি বিস্তৃত করেন তার সঠিক পরিচয় পুলিশ তো দূরের কথা বাঙলার কোন

বিপ্লবীদলেরও জানা ছিল না। কারণ, এই নূতন যুব-সমাবেশের সভ্যদের সঙ্গে পুলিশের জানিত নেতাদের (হেমচন্দ্র, শ্রীশ পাল, হরিদাস দত্ত, হরিদাস রায় প্রমুখ) সরাসরি কোন সম্পর্ক ইচ্ছা করেই রাখা হত না। দলের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁদের থাকতো নেতৃস্থানীয় কর্মীদের মাধ্যমে অতি সংগোপনে রাত্রির অন্ধকারে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে দলের হেড্‌কোয়ার্টার কলকাতায় স্থানান্তরিত হবার অনেক পূর্বেই **সত্যরঞ্জন বক্সি** কলকাতায় চলে এসেছেন। দলের সঙ্গে একান্ত সংগোপনে তাঁকে-ও যোগাযোগ রাখতে হতো।…

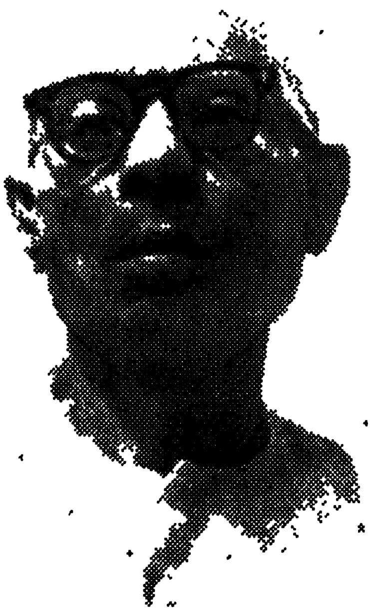

সত্যরঞ্জন বক্সি

পুলিশের চোখে ধূলি দিয়ে এই দলটি সবার অলক্ষ্যে শক্তি সঞ্চয় করে চলল। সভ্যরা বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষিত হতেন, কর্মনিরত থাকতেন সাধারণত নিশীথের গোপন পরিবেশে। কিন্তু দিনের আলোয় তাঁদের দেখাশুনা যে হতো না, তা নয়। সবার সাক্ষাতে তাঁরা মেলামেশা করতেন স্বাস্থ্যচর্চা ও সমাজসেবার কাজকর্মের মাধ্যমে। জনকল্যাণের জন্যে ও আর্তসেবায় তাঁরা কাজ করতেন বিবিধ জন-হিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে।

১৯২২-'২৩ সালের মধ্যে 'মুক্তি সংঘে'র (এই গোপন নাম গোপনেই উচ্চারিত হতে পারতো তাঁদের কণ্ঠে, যাঁদের তখন হেমচন্দ্রের বিপ্লবী-দলে inner circle-এ ঢুকবার আদেশ হয়েছে) কর্মীরা প্রথমে 'সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার লীগ' এবং পরে 'শ্রীসংঘ', 'শান্তি সংঘ' ও 'ধ্রুব সংঘ' নামে কয়েকটি সমাজসেবার প্রতিষ্ঠান গড়েন ঢাকা শহরে। এ সংঘগুলোর মাধ্যমেই এ-দলের জনহিতকর কাজ সম্পন্ন হতো। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে 'শ্রীসংঘ' ছিল প্রথম শ্রেণীর সমাজসেবা-সংস্থা।

কারণ এর সম্পাদক ছিলেন অনিল রায় স্বয়ং ; এবং সত্য গুপ্ত, মণি রায়, রসময় শূর, ভবেশ নন্দী, ভূপেন রক্ষিত প্রমুখ প্রভাবশালী সহকর্মীদের মাধ্যমে ঢাকায় সমস্ত দলটির সক্রিয় সাহায্যই এ-প্রতিষ্ঠান পেতো।...১৯২০ সনের শেষাস্তে দলের হেডকোয়ার্টার কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। ঢাকার কেন্দ্রকে ( হেমচন্দ্রের দলের ) অনিল রায়ের মাধ্যমে এবং সত্য গুপ্ত, রসময় শূর, সুরেন দত্ত,

হরিদাস দত্ত, প্রমথ চক্রবর্তী, সত্যগুপ্ত, প্রফুল্ল দত্ত, রসময় শূর ( বাম থেকে ডাইনে )

মণি রায় প্রমুখের পরিচালনায় শ্রীসংঘের নামেই লোকসমক্ষে সেবাকার্যে, স্বেচ্ছাসেবকদের কুচকাওয়াজে অথবা দুষ্ট-দলনে অধিক দেখা যেত। হেমচন্দ্রের অস্তিত্ব টের. না পাওয়াতে পুলিশ খুবই নিশ্চিন্ত ছিল। অনিলবাবু-সত্যবাবুদের দল-সমাবেশে পুলিশ পরোয়া করতো না। তাদের ধারণা—"এসব লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে নিশ্চয় সংসারে ঢুকে যাবে। লেখাপড়া জানা ছেলের দল হাজার হলেও বাঙালী তো ? বাঙালীর ছেলে ভাল চাকুরি পেলে কি আর কোন ভয়ের পথে পা বাড়াবে ?"...

স্কুল-কলেজের বেঞ্চগুলো এ-সময় বিপ্লবীদলের ছেলেরা প্রায় দখল করে বসেছে। অবশ্য বেশির ভাগই বিপ্লবের ভাবে প্রভাবান্বিত, বিপ্লবী-দলের যথার্থ সভ্য নয়। হেমবাবুর দলের লক্ষ্য ছিল শুধু স্বাস্থ্যবান ও লেখা-পড়ায় ভাল ছেলেদের দিকেই। ভাল ছাত্ররা সাধারণত ঢাকা কলিজিয়েট স্কুলের দিকে ধাওয়া করত, কারণ তৎকালে এই গবর্নমেণ্ট স্কুলটির সুনাম সারা বাঙলায় বিস্তৃত ছিল।

এই কলিজিয়েট স্কুলের উপর দিকের 'ক্লাস-কে-ক্লাস' ছাত্রই সে যুগে হেমচন্দ্রের নতুন সংস্কার আওতায় এসে যেতো। কাজেই ভবিষ্যতে সবাই লক্ষ্য করেছেন যে, হেমবাবুর দলে বিদ্বান ছেলের সংখ্যা প্রচুর। শহরের সর্বত্র উচ্চশিক্ষিত, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, দুঃসাহসী ও চরিত্রবান জনকল্যাণকামী কর্মীরূপে এই দলের ছেলেদের যথেষ্ট সুখ্যাতি হয়। শহরের পাড়ায়-পাড়ায় ব্যায়ামাগার খুলে নিয়মিতভাবে ডন-কুস্তি এবং লাঠি-ছোরা খেলার চর্চা করে এঁরা বস্তুতই সাধারণ যুবকদের জীবনেও স্বাস্থ্যরক্ষার মান উচ্চতর পর্যায়ে তুলে দিয়েছিলেন।...এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হেমচন্দ্র নিজে শুধু বিদ্যানুরাগী ছিলেন তাই নয়—স্কুলকলেজের বিদ্যা-অর্জনে তাঁর অনুরাগ না থাকলেও তিনি হলেন যথার্থ পণ্ডিত। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য বিপ্লবী-মহলে সুপরিচিত। ইতিহাস ও কারেন্ট-পলিটিক্সে (আন্তর্জাতিক) তাঁর জ্ঞান তৎকালে তাঁর কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী-ছাত্রদের টেনে আনতো 'বি-ভি'-র 'স্টাডি-সার্কেলে'র মাধ্যমে।...

এ-দলের আর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। এ-দলই সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে মেয়েদের মধ্যে বৈপ্লবিক কর্মধারা প্রবর্তন করে। লীলা নাগের (রায়) নেতৃত্বে, তাঁর 'দীপালী সংঘে'র মাধ্যমে এ-দল বহু মহিলাকে বিপ্লবকর্মের অন্তর্ভুক্ত করে বাঙলাদেশের নারী-জাগরণের ইতিহাসে এক সমুজ্জ্বল অধ্যায় জুড়ে দিয়েছে। একই কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করবে, সানন্দে মৃত্যুকে বরণ করবে—এ কল্পনা তৎকালীন বিপ্লবীদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। কারণ, বাঙলার বিপ্লবীদলগুলোর অধিকাংশ নেতাই তখনো ছিলেন রক্ষণশীল। কিন্তু হেমচন্দ্রের দলটি রক্ষণশীল ও প্রাচীনপন্থী চিন্তাধারা থেকে ক্রমশ মুক্ত হয়ে যাচ্ছিল। এই মুক্তিলাভের মূলে ছিল হেমচন্দ্রের উদারতা এবং তাঁর দায়িত্বশীল বন্ধুদের যুগোপযোগী পরিবেশকে স্বীকার করে নেবার শিক্ষা ও ক্ষমতা।...

**অনিল রায়**

এখানে অনিলবাবুর (স্বর্গগত) কথা বিশেষ করে উল্লেখ করার আছে।... রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে-কাব্যে-গানে পরিস্নাত তাঁর সত্তা দলের ছোট-বড় সকলকে রূপ, রস ও গন্ধে ভরা পৃথিবীর বড়ই কাছাকাছি নিয়ে যেত। তাঁর যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ও বলিষ্ঠ ভাবপ্রসারতা এবং সংগঠন প্রতিভা বন্ধুদেরকে নতুনতর

দৃষ্টিকোণ থেকে বৈপ্লবিক-জীবনের মূল্যায়ন কবাব প্রেবণা দিত। হেমবাবুদেব দলেব নবতর দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রগতিশীল মতবাদ এই সংস্থাব স্বরূপকে বিভা দান করেছিল। এই বিভাসিত দলের পক্ষেই তৎকালে সম্ভব হযেছিল লীলা নাগেব (রায়) মত প্রতিভাদীপ্ত মহিলাকে কর্মীরূপে লাভ করে বাঙলা তথা ভারতবর্ষের বিপ্লবতীর্থে নবীন ধাবাস্নান সংরচনা কবা।

অনিল বাষ

১৯২১ সাল থেকে ১৯২৬ সাল পযন্ত হেমচন্দ্রেব দল-সংগঠনে অনিলবাবুর অবদান অপূর্ব। অবশ্য এও বলতে হবে যে তিনি পবম ভাগ্যবান ছিলেন এই দুষ্কব কাযে সত্যগুপ্ত, বসময় সুব, ভবেশ নন্দী, মণি বায় ও প্রফুল্ল দত্তেব মত সতীর্থদেব অবিচল শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা লাভ কবে।...

অনিলবাবুব গুণ ছিল চুব। প্রথমত তিনি সুসাহিত্যিক এবং দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ। তিনি ছিলেন সুতার্কিক ও সুদূবমনস্ক বিদগ্ধ। তা' ছাড়া ছিলেন সুগায়ক শুধু নয়, সুবকাব এবং গীতবসিক। ছবি আঁকাব দিকেও তাঁব ঝোঁক ছিল। অধিকন্তু সঙ্গীত-শিক্ষক রূপে তাঁর কৃতিত্ব দেখা গেছে। কুস্তিগীব হিসেবে তাঁব স্থান মন্দ ছিল না। শরীরে শক্তি ছিল প্রচুর। সাহসেব দিকে তিান ছিলেন দুঃসাহসী। মোটেব উপব দুর্দান্ত ও শিক্ষিত ছেলেদের নেতৃত্ব গ্রহণে তরুণ বয়সেই তাঁব সামর্থ্য স্বীকৃত হয়েছিল। বন্ধুদের অনেকের বড়ই ভাল লাগতো তাঁকে, যখন তিনি একান্তে ববীন্দ্রনাথের গানে তন্ময় হতেন।...একদিনেব কথা বলি। সেটা হবে ১৯৪৬ সালের এক সন্ধ্যা। ঠিক সন্ধ্যা নয়, সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। সেণ্ট্রাল জেলের একটি সেল-এ বসে গুনগুন্ করে একা-একা সুর ভাঁজছিলেন অনিলবাবু।...বন্ধুরা

তখন বক্সা ও প্রেসিডেন্সি জেল থেকে দমদম জেলে এসে গেছেন। এখান থেকেই মুক্তি দেওয়া হবে সবাইকে ছোট ছোট দলে। সকালবেলা বন্দীরা সমবেত হয়ে গোপীনাথের ফাঁসির দিবস পালন করেছেন। কারণ, সেদিন ছিল ১লা মার্চ। সন্ধ্যায় এলেন দুটি বন্ধু অনিলবাবুর সেলে। তাঁরা ঢুকতেই গানের সুর থামিয়ে হাসিমুখে অনিলবাবু বললেন—'কি খবর?'

—'খবর কিছু নেই। গান শুনবো'।

—'শুনবে? আচ্ছা একটি মাত্র গান শোনাব, তারই সুর ভাঁজছিলাম এতক্ষণ।'

—'ঠিক আছে।'

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন।...তারপর শুরু হল গান।...একেবারে অন্য মানুষ!...একেবারে অন্য জগতের!...গাইছেন—

"রোদনভরা এ বসন্ত, সখা
কখনো আসে নি বুঝি আগে।"...

বহুক্ষণ ধরে গেয়ে-গেয়ে থেমে গেলেন এক সময়। থম্‌থম্ করছে বাইরের আকাশ ও পৃথিবী।...

গানের রেশ থিতিয়ে এলে বিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়ে এলেন বন্ধুরা। তাঁদের মনে হল, শহিদের বিরহ-ব্যথায় পৃথিবীর সমাগত বসন্তদিন সত্যি কান্নায় ভরে গেছে। সেই কান্নাকে সারাদিন স্পর্শ করা যায় নি। সন্ধ্যার ঐ রমণীয় আঁধারে একজনের কণ্ঠে তাকে ছোঁয়া গেল! 'গানের ওপারে' চলে যেতো যে অনিল রায়ের গীতক্ষরা-কণ্ঠ, তাকে ভাল না বেসে উপায় ছিল না।...

## দীপালী সংঘ

১৯২১ সালের পূর্বে বাঙলাদেশেও মেয়েদের যথাযোগ্য স্থান ছিল হেঁসেলে। লেখাপড়া বা গানবাজনা শেখানর চল কিছুটা শহরে-বন্দরে থাকলেও, ও-বস্তুর সার্থকতা ছিল শুধু মেয়েকে ভাল ঘরে সমর্পণ করার সৌভাগ্যে। মেয়েদের নিজস্ব তেমন কোন সত্তা ছিল না, নিজস্ব কোন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না, পুরুষ-বৃক্ষের পরগাছা

হয়ে যে যত শোভা বৃদ্ধি করবে তার নারী-জন্ম তত বেশি সার্থক হবে—এই ছিল ধারণা।

রামমোহন থেকে শুরু করে বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র প্রমুখ মহারথিগণ নারীকে 'আপন ভাগ্য জয় করিবার' বাণী যথেষ্ট শোনালেও তা খুব বেশি লোকের কানে ঢোকে নি। কাজেই এতকাল নারী প্রগতি খুঁড়িয়ে চলেছিল। কিন্তু সহসা মহাসমুদ্রে যেন বান ডেকে গেল। গান্ধীজির আইন-অমান্য আন্দোলন চঞ্চল করে দিল সারা ভারতবর্ষের অন্তঃপুরবাসিনীদের মন-ও। দলে দলে নারী সমাজের শাসন আলগোছে সরিয়ে রেখে জীবনের বৃহত্তর প্রাঙ্গণে এলেন বেরিয়ে। সূর্যের আলোক সর্বাঙ্গ দিয়ে পান করে তারা হলেন সূর্যমুখী। আর তাদেরকে গৃহকোণে 'অবলার' সৌন্দর্যে সুন্দরী হয়ে থাকতে উৎসাহিত করা গেল না।

কাজেই বললে ভুল হবে না যে, ১৯২১ সাল থেকেই এই দেশে ঘটেছে ব্যাপকভাবে নারী-জাগরণের সূত্রপাত। এবং এ জন্য ভারতবর্ষের নারীসমাজ মহাত্মা গান্ধীর কাছে একান্ত ঋণী।

যেকোন সফল আন্দোলন মানুষকে উচ্ছল করে, কর্মলোভী করে, বন্ধনমুক্ত করে। কিন্তু সে উচ্ছলতা, কর্মশক্তি ও স্বাধীন সত্তাকে সংগঠনের মাধ্যমে কাজে না লাগালে সবই আবার ব্যর্থ হয়ে যায়। বাঙলাদেশের সৌভাগ্য যে অপূর্ব সংগঠন-শক্তি নিয়ে দু-চারটি তরুণী উক্ত সংগঠন-কার্যে ব্রতী হলেন। তাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিভাদীপ্তা ছিলেন **লীলা নাগ** (রায়)। ১৯২১ সালে 'নিখিল বঙ্গ নারী ভোটাধিকার কমিটি'র সহ-সম্পাদিকার পদে তাঁকে গ্রহণ করা হয়। তখন তিনি মাত্র বি-এ পাশ করেছেন।... কংগ্রেসের আহ্বান তাঁকে চঞ্চল করেছে। নারী-সংগঠনে তার মন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ১৯২৩ সালে এম-এ পাশ করার পর

লীলা নাগ (রায়)

নিজেকে তিনি অনেকটা মুক্ত মনে করলেন। ভাবলেন এবারে সর্বান্তঃকরণে তিনি মেয়েদের কাজে ব্রতী হবেন। ঐ বৎসরই তিনি ঢাকা শহরে 'দীপালী সংঘ' স্থাপন করলেন। সর্বস্তরের মহিলাদের মধ্যে 'কন্‌সট্রাকটিভ'-কাজ চালাবার সংকল্পেই এ-প্রতিষ্ঠানের পত্তন হল।...

কাজে নেমে লীলা দেবী পদে পদে নানা বাধা পেতে লাগলেন। সঙ্গীসাথীদেব উৎসাহ থাকলেও সত্যিকারের কাজে হাত দিতে গেলেই সমাজের কুসংস্কার ফোঁস করে ওঠে! এগিয়ে চলা যায় না।...ক্রমশ তাঁকে বুঝতে হচ্ছে যে পথ বড়ই দুস্তর, ভাঙবার শক্তি না থাকলে গড়ার কাজ করা যায় না।...এদিকে মহাত্মার আন্দোলনের রোমাঞ্চকর দিকটা ম্লান হয়ে আসছে। এক বছরে হাতের মুঠোয় স্বরাজ তো আসেনি! কাজেই এখন শুধু 'চরকা কাটো', 'তাঁত চালাও' মন্ত্রে আব তরুণ-চিত্ত উদ্বুদ্ধ হয় না।...লীলা নাগ কাজ করে যাচ্ছেন, কিন্তু কাজের সম্যক পন্থা যেন খুঁজে পাচ্ছেন না।...

এদিকে শহরের বুকে তখন বিপ্লবীদলগুলো তলে তলে প্রচুর কর্মরত। লীলা নাগ নিজের পাড়ায় ( বক্সিবাজার ) দেখেন বাড়িব ছেলেরা যেন কিসের আহ্বানে স্বপ্নচারী হয়ে উঠেছে। তাঁর নিজের ছোট ভাইটিকে ( প্রভাত নাগ ) পর্যন্ত তিনি হাতের নাগালে পান না। কাদের ইশারায় যেন সমস্ত ছেলেরা দরমনস্ক। চলাফেরা তাদের অসাধারণ।...ক্রমে লীলা নাগ তাঁর সহপাঠী ( এম-এ ক্লাসের ) এবং প্রতিবেশী অনিল রায়ের মাধ্যমে শহরের একান্ত 'ডিনামিক' সমাজসেবী সংস্থা শ্রীসংঘের সঙ্গে কাজের যোগাযোগ ঘটালেন।...দীপালী-শিল্পপ্রদর্শনী তিনি খুললেন তাঁর 'দীপালী সংঘে'র পরিচালনায়। এই শিল্প-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা প্রসঙ্গে শ্রীসংঘের কর্মীরা তাঁর সংস্থাকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। এ-ছাড়া যাবতীয় কাজেই 'শ্রীসংঘ', 'শান্তি সংঘ' ও 'ধ্রুব সংঘের' ছেলেরা ( সবগুলোই হেমচন্দ্রের বিপ্লবীদলের সমাজসেবা-ইউনিট ) পাড়ায়-পাড়ায় দীপালী সংঘের পার্শ্বে এসে দাঁড়াতো। দীপালী সংঘ ইতিমধ্যে 'দীপালী স্কুল' ( পরে কামারুন্নেসা গার্লস হাই স্কুল ), গুটি বারো ফ্রি-প্রাইমারী স্কুল এবং পরে 'নারী শিক্ষা মন্দির', 'শিক্ষা ভবন' প্রভৃতি ইংরেজী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করে। ঢাকার স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে ও তার ব্যবস্থা করার চেষ্টায় লীলা নাগ এ-ভাবেই উদ্যোগী হন।...

শ্রীসংঘের সম্পাদক অনিল রায়ের সঙ্গে ইতিমধ্যে লীলা দেবীর প্রচুব

আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে জীবনযুদ্ধের মত ও পথ নিয়ে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মচিন্তা নিয়ে, সহিংস ও অহিংস পন্থার ভালমন্দ নিয়ে। ধীরে ধীরে লীলা নাগ ওতপ্রোতভাবে বিপ্লব-মন্ত্রে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করে তুললেন। এ ক্ষেত্রে অনিলবাবুর কৃতিত্ব অতুলনীয়।...

অভিজাত বংশের বিত্তশালী পিতার একমাত্র বিদুষী সুন্দরী কন্যার পদতলে যখন ভবিষ্যৎ সুখের সংসার গড়াগড়ি যাচ্ছিল, তখনই হঠাৎ সমাজ-সংসার ছেড়ে যোগিনীর বেশে 'বিপ্লবিনী' হবার দারুণ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে ফেললেন সে-কন্যা। তৎকালে ঢাকা শহরের আঁধার পরিবেশে একটি দীপশিখার মত তিনি সঞ্চারিত হচ্ছিলেন, কিন্তু বিপ্লবী-সংস্থার সংস্পর্শে এসে আগামীকালে সারা বাঙলার গগনে তিনি সঞ্চারিত হতে থাকলেন বিদ্যুৎশিখার মত।

১৯২৫ সাল। তখন **লীলা নাগ** সংকল্প করছেন যে, বিপ্লবের রক্তক্ষরা পথে তিনি পথ চলবেন। অনিলবাবু বিপ্লবীদলের প্রথা মত লীলাদেবীকে হেমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেই দিন থেকে লীলাদেবী বিপ্লবী-দলের একজন বিশ্বস্ত কর্মীরূপে স্বীকৃত হলেন।

অতঃপর তাঁর দীপালীসঙ্ঘের কাজ হল একটি নারী-কল্যাণকামী পাবলিক্ সংস্থারূপে গঠনমূলক কাজের নানারূপ ব্যবস্থা করা। সমাজসেবা, শিক্ষা বিস্তার, নারী ও শিশুদের কল্যাণসাধন, স্বাস্থ্যচর্চা, লাঠি ও ছোরা খেলা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে প্রচুর ছাত্রী ও মহিলার সংস্পর্শে তিনি আসতে লাগলেন। এই সংস্থা থেকেই বিপ্লবের কাজের জন্যে কর্মী বাছাই হতে থাকলো। ইতিমধ্যে লীলাদেবী কয়েকটি ভাল সহ-কর্মী পেয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে তৎকালে রেণু সেন (বসু) বীণা রায় ও শকুন্তলা চৌধুরী ছিলেন অন্যতম।...

কাজকর্ম বেশ এগিয়ে চলছে। এমন সময় সহসা (১৯২৮) হেমচন্দ্রের 'মুক্তিসংঘে'র ভাগাভাগি ঘটল। এই ভাগাভাগি (পরে বিশদ বিবরণ লিখিত হয়েছে) যাঁরা নিছক কর্মের খাতিরে (খাঁটি বিপ্লবীদের কর্মের টান অপ্রতিরোধ্য) করেছিলেন তাঁরা কাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন বলেই তাল সামলাতে বেগ পান নি। কিন্তু ভাগাভাগির ব্যাপারটা যাঁদের জন্যে 'একম্প্লিশড্ ফ্যাক্ট' রূপে এসেছিল, তাঁদের কাছে ঐ 'ফ্যাক্ট' ছিল অসহ্য। কারণ, ভাগাভাগির মূলে দলের

কোন স্তরেই দ্বেষ বা রেষারেষির চিহ্ন ছিল না। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাই ছিল অক্ষত। সুতরাং এই 'এ্যাকম্প্লিশড্ ফ্যাক্ট' ( নিশ্চিত ঘটনা ) সেদিন সর্বাধিক আঘাত যাঁদের দিয়েছিল তাঁদের মধ্যে লীলা নাগও একজন।

'ভাগাভাগি' ঘটেছিল ১৯২৮-'২৯ সালে। মূল দল থেকে বিচ্যুত হবার পর, মুক্তিসংঘ তথা মূল দলের সমাজসেবা ইউনিট 'শ্রীসংঘ' ক্রমে একটি বিপ্লবীদল রূপে পরিচিত হয়। তথাপি ইহা ধারণা করা চলে যে, লীলা নাগ 'ভাগাভাগি' ব্যাপারটি মনের দিক থেকে মেনে নিতে পারেন নি। রক্তগরম, বিদ্রোহচঞ্চল তরুণদল নিয়ে যেখানে কারবার, সেখানে ভাগাভাগি যতই মতের অমিল থেকে হোক, তা' পরিশেষে কুৎসিত মনের অমিলে পরিণত হতে বাধ্য। কাজেই দলের স্বার্থে এই মানসিক-বিরোধিতা প্রতিরোধ করতে যে হবে তৎসম্পর্কে লীলা নাগ সদা অবহিত থাকতেন। তাই ১৯৩০ থেকে ১৯৪৬ সাল অবধি প্রত্যেক সময়েই দেখা গেছে যে শ্রীসংঘের সঙ্গে যুক্ত থেকে-ও উভয় দলের যেকোন মানসিক-লেনদেন বা সংগঠনিক মিলন-চেষ্টায় লীলাদেবী থাকতেন এক পা বাড়িয়ে। তৎকালে তাঁর সহযোগিতায় অনেক জটিল গ্রন্থি সহজে খুলে ফেলা যেত।...

১৯৩০ সালে দীপালী-সংঘের মাধ্যমে কলকাতায় একটি 'ছাত্রীভবন' খুলে তিনি মহিলা-কর্মীদের একটি আস্তানা স্থাপন করলেন। এ-জিনিসটির প্রচণ্ড অভাব কলকাতায়। অতঃপর গণশিক্ষা-পরিষদ স্থাপন করে এসব কর্মীদের সাহায্যে নারী-শিক্ষার উদ্যমকে তিনি সক্রিয় করে তুললেন। রেণু সেনের উপর স্বভাবতই এসব কাজের অনেকটা দায়িত্ব এসে গেল।

রেণু সেন ( বসু )

১৯৩০ সালেই লীলা নাগের সম্পাদনায় 'জয়শ্রী' নামে মহিলাদের একটি কাগজ ঢাকা থেকেই প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় কবিগুরুর আশীর্বাণী ছিল। প্রথমটায় কাগজটি মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হতো এবং লেখকগোষ্ঠীও প্রধানত ছিলেন মহিলাবৃন্দ। লীলা নাগের অবর্তমানে অথবা তাঁর বর্তমানেও বিশেষ

কারণে যাঁরা জয়শ্রীর সম্পাদিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম হল শকুন্তলা দেবী, বীণাপাণি রায় ও উষারাণী রায়।

১৯৩১ সালের ডিসেম্বারে লীলা দেবী ও রেণু সেন গ্রেপ্তার হলেন। লীলা দেবীর আরো কর্মসাথী যাঁরা বন্দী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সুশীলা সেনগুপ্তা ও প্রমীলা দাসগুপ্তা এবং হেলেনা বল ( দত্ত ) অন্যতম।...

১৯৩৭ সালে লীলা নাগ বেরিয়ে আসেন জেল থেকে। এবার তাঁর কর্মের জগৎ বৃহত্তর হয়ে চলল। তিনি কংগ্রেস ও নানা মহিলা-সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন। ক্রমশ সুভাষচন্দ্রের সাথে তাঁর রাজনৈতিক যোগাযোগ স্বভাবতই ঘটতে লাগলো। বছরখানেকের মধ্যেই কলকাতা থেকে 'জয়শ্রী' মাসিকপত্র পুনরায় প্রকাশিত হল। এবার এই পত্রিকা শুধু মহিলাদের নয়, পুরুষ-নারী সকলেরই মুখপত্ররূপে পরিচিত হয়ে ক্রমশ রাজনীতিক ও সাহিত্যিক জগতে প্রখ্যাত হয়ে উঠল। সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন লীলা নাগ স্বয়ং।

১৯৩৯ সালে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠিত হলে অনিলবাবু ও লীলা রায় ( নাগ ) এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হলেন। এঁরা কাজের মাধ্যমে সুভাষচন্দ্রের এতই কাছাকাছি এসে গেলেন যে, ১৯৪০ সালে 'হলওয়েল-মনুমেণ্ট-অপসারণ' আন্দোলনে সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হলে তাঁরই নির্দেশে তাঁর স্থলে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সাপ্তাহিকের সম্পাদিকা নিযুক্ত হলেন লীলা রায়।...

তারপর এলো ১৯৪২ সাল। এপ্রিল মাসে লীলা দেবী কারারুদ্ধ হলেন। 'জয়শ্রী' আপিসে পুলিশ তালা লাগিয়ে গেল। তাঁর সহকর্মীদেরও ধীরে ধীরে স্থান হলো জেলখানায়। তাঁদের নাম হলো—লাবণ্য দাসগুপ্ত, হেলেনা দত্ত, শৈল সেন, গৌরী সেন, প্রভা মজুমদার, উমা গুহ, ছায়া গুহ, আশা রায়।

এর পরের কথা হল 'দীপালী সংঘে'র দ্বিবিধ পরিণতি। প্রথমত, উক্ত সংঘের বিপ্লবীসত্তা শ্রীসংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে ঐতিহাসিক পরিণতি লাভ করেছে তা যথাস্থানে লেখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, 'দীপালী সংঘে'র নারী-উন্নয়নের দিকটা লীলা দেবীরই নেতৃত্বে নানা সংস্থায় যে সুন্দর পরিণতি লাভ করেছে তার আলোচনার স্থান এখানে নয়।

## বেণু পত্রিকা ও চলারপথে গ্রন্থ

১৯২৬ সাল—বাঙলা ১৩৩৩-এর বৈশাখ মাস থেকে রেবতী বর্মণের চেষ্টায় একটি কিশোর-মাসিকপত্র বের হয় ৯৩।১।এফ নং বৈঠকখানা রোড থেকে। সতীকান্ত গুহ, মোহনলাল ও শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় নামক তিনটি কিশোর পত্রিকাটি পরিচালনাব ভার নেয়। মোহনলাল রবীন্দ্রনাথের নিকট-আত্মীয়। প্রথম সংখ্যায়ই রবীন্দ্রনাথের একটি গান প্রকাশিত হয় 'বেণু' নামে। পত্রিকাটির নামও দেওয়া হয়েছিল বেণু। কবি লিখেছিলেন তাঁর সেই প্রসিদ্ধ গান :

"মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি,
হে রাখাল, বেণু তব বাজাও একাকী ॥"...

রেবতী বর্মন হেমচন্দ্রের দলের একটি প্রতিভাবান কর্মী। তখন রেবতী কলেজের ছাত্র। মোহনলালরা দু'ভাই বিপ্লব বা বিপ্লবীদলের আওতায় এসেছে নিজেদের অজ্ঞাতে। ওরা তখন কিছুই বোঝে না। শিশুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে বড় হচ্ছে, কাজেই সাহিত্যপত্রিকা বার করার প্রস্তাবে ওরা সতীকান্তের মাধ্যমে সাগ্রহে এগিয়ে এসেছে। ওরা খুব উৎসাহিত, বালক ও কিশোরদের কাছে সাহিত্য পরিবেশনের সুযোগ পেয়ে।...রেবতী বর্মণের ইচ্ছা—এই ভাল ছেলে দু'টিকে এসব কাগজ কবার মাধ্যমে ধীরে ধীরে দলভুক্ত করা। কিন্তু হেমচন্দ্রের ওসব পছন্দ হলো না। তিনি বেণুকে জুটো বালক-ধরার কল রূপে ব্যবহার করতে রাজী নন। তিনি সবাইকে বোঝালেন যে 'বেণু' হবে বিপ্লবীদের মুখপত্র। এর মাধ্যমে বাঙলার কিশোর ও যুবকসমাজে বিপ্লবের বাণী ছড়িয়ে দিতে হবে। সবাই গ্রহণ করলেন নেতার যুক্তি। হেমচন্দ্রের নির্দেশে ঢাকা থেকে ভূপেন রক্ষিত-রায়কে আনিয়ে কাগজটিকে যথাযথ রূপ দেবার ভার দেওয়া হল। ১৩৩৩-এরই ( ১৯২৬ ) জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে 'বেণু'র কর্মকর্তা বদলে গেলেন। ভূপেনবাবুর সম্পাদনায় 'বেণু' বিপ্লবী-মন্ত্র প্রচারে ব্রতী হল।...

৯৩।১।এফ নং গৃহে বেণুর আপিস এবং বেণু-গোষ্ঠীর আস্তানা ক্রমশ জমে উঠল। হেমচন্দ্র তখন থাকতেন ভবানীপুরে। প্রত্যেকদিন তিনি আসতেন বেণু-আপিসে। এবার লোকে জানলো যে হেমবাবু স্বদেশী ছেড়ে দিলেও ঠিক সাধু হয়ে যান নি। তবে গুপ্তসমিতি না করে যা কিছু তিনি এখন করেন তা ঐ লেখাপড়ার মাধ্যমেই।

স্বভাবতই বিপ্লবীরা দরিদ্র। বিপ্লবীর কাগজে বিজ্ঞাপনও আসবে না। শুধু নিজেদের মধ্যে চাঁদা তোলার ব্যবস্থা করেও বেণুকে প্রথম শ্রেণীর কাগজ রূপে চালান অসম্ভব।

কিন্তু পার্টির সদস্য নির্মল গুহের পিতা শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র গুহ ভূপেনবাবুকে (বেণু-সম্পাদক) আশ্বাস দিলেন যে তাঁর পুত্র নির্মল গুহ বিনা দক্ষিণায় বেণুর (কাগজটি নিজের পায়ে দাঁড়ান পর্যন্ত) ছাপাবার দায়িত্ব নিলে তাঁর আপত্তি হবে না। বলাবাহুল্য যে, পুত্রের 'ডেভেন্‌হ্যাম্ প্রেসে'র মালিক ছিলেন হেমচন্দ্র গুহ স্বয়ং। হেমচন্দ্র গুহ মহাশয়ের কাছে 'বেণু'র ঋণ শুধু অর্থের হিসেবে ধার্য্য করা যায় না।

* * * *

বেণুর লেখাগুলো দেশের কিশোর-সাহিত্যে এক বিপ্লব এনে দিল। অভূতপূর্ব এক জীবনদ্যোতনায় বাঙলার কিশোর-কিশোরীর প্রাণ দুলে উঠল। সেই প্রাণ-স্পন্দনের মূর্ত প্রতীক মৃত্যুহীন শহিদকুল। অনন্যসাধারণ এই কাগজখানার স্বরূপ আজকের বাংলায় উপলব্ধি করার উপায় নেই। এককালে 'বন্দেমাতরম', 'যুগান্তর' বা 'সন্ধ্যা' কাগজ যেমন বাঙালীকে উন্মাদ করেছিল—বেণুও ঠিক তার কালে তরুণ-কিশোরকে ব্যাপক পরিব্যাপ্তিতে পাগল করেছিল। বেণুর বৈশিষ্ট্যে সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র বিস্ময় মেনেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এই কাগজ ও তার পরিচালকদের সম্পর্কের কথা 'বিপ্লবীর কাছে শরৎচন্দ্র'—এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

বেণুর বৈশিষ্ট্যে ও নির্ভীক আদর্শবাদ প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে তৎকালে কবিগুরু থেকে শুরু করে বাঙলার ছোট-বড় প্রত্যেক সাহিত্য-সেবী, শিল্পী ও চিন্তানায়কগণ বেণুকে আপন প্রতিষ্ঠান রূপেই গ্রহণ করেছিলেন।

বেণুর উপর রাজরোষ প্রকটতর হয়ে ওঠার সঙ্গে উহার (বেণুর) প্রভাব বেড়ে যেতে লাগল। ১৯২৯ সালে রাজদ্রোহ প্রচারের অপরাধে তিন মাসের জন্যে সম্পাদকের সশ্রম কারাদণ্ড হল।

তারপর ১৯৩০-এর ২৯শে আগস্ট 'লোম্যান্-হডসন্ এ্যাক্‌শ্যান্' সংঘটিত হয়। বিকেলে কলকাতা শহরে হকারদের হুলুস্থূল কলরব: "স্বদেশীর গুলিতে পুলিশ-জেনারেল লোম্যান্ নিধন ও পুলিশ-সুপার হডসন ধূল্যবলুণ্ঠিত! আততায়ী নিরুদ্দেশ।" ...কলকাতায় বসে, দম বন্ধ করে সংবাদটি পড়ছেন বিভি-র

কর্মনেতারা। কাজে ব্যবহৃত রিভলভারটির বর্ণনা বেরিয়ে গেছে কাগজে। সেই বর্ণনা থেকেই তাঁরা বুঝেছেন যে এ-কাজ তাঁদের বন্ধু বিনয় বসুই করেছেন, কারণ ঐ রিভালভারটির মতই একটি অস্ত্র কলকাতা থেকেই পাঠান হয়েছিল—নিকেল করা পাঁচঘরার ঐ বিখ্যাত রিভলভার !···

ভূপেনবাবু ও মণীন্দ্রকিশোর রায়কে পুলিশ ভাল করে জানে বলে তাঁদের গা-ঢাকা দেবার কথা নয়। তাঁরা তাই ভাবলেন যে, এই এ্যাক্‌শানের পর আর বাইরে থাকা যাবে না। তাঁরা স্থির করলেন যে তৎপূর্বে একবার শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা দরকার।···

পরের দিন—৩০শে আগস্ট। সকালে ভূপেন রক্ষিত-রায়, মনীন্দ্রকিশোর রায় এবং রসময় শূর চলে গেলেন 'সামতাবেড়ে', সাহিত্যসম্রাট শবৎচন্দ্রের গৃহে।

শরৎচন্দ্র পরম আদরে তাঁদেরকে গ্রহণ করলেন। শুনলেন সব কথা। শুনলেন যে বিনয় বসু ( বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্ত ইতিপূর্বে শরৎচন্দ্রেব সঙ্গে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন ভূপেনবাবুর মাধ্যমে ) মেডিকেল্‌-স্কুল-হাসপাতালে লোম্যান্‌কে নিধন করে এবং হডসন্‌কে মারণ-আঘাতে ধরাশায়ী করে স্বচ্ছন্দে পালিয়ে গেছেন।···

সংবাদটি শুনে শরৎচন্দ্রের কী আনন্দ ! মনে হল তিনি নিজেই যেন এই দুঃসাহসী কাজটি করে এসেছেন ! বললেন : "বীর বটে বিনয়। রসিক বটে ঢাকার ছেলে। ব্যাটা শয়তানকে ( হড্‌সন ) না মেরে ওর বিশেষ অঙ্গ ফুটো করে দিয়েছে। —তাকে জীবনভর মনে রাখতে হবে, পায়েব তলায় শুধু কাদামাটিই থাকে না, কেউটের বাচ্চাও থাকে।"···

সন্ধ্যায় বেণু-সম্পাদক, রসময় শূর এবং মনীন্দ্রেকিশোর রায় তাদের কলকাতার আস্তানায় ফিরে এলেন। ১লা সেপ্টেম্বব মনীন্দ্রকিশোর ও ভূপেনবাবু গ্রেপ্তার হলেন।···

ভূপেনবাবুর অবর্তমানে শচীন ভৌমিক, যতীশ গুহ ও অশোক সেনের ( বর্তমানে হাইকোর্টের জাস্টিস ) উপর কাগজ পরিচালনার ভাব দেওয়া হল। সুনীল সেনগুপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব নিলেন। যতীশ গুহ, অশোক সেন, শচীন ভৌমিক ও সম্পাদক মিলে কাগজ চালানর উদ্দেশ্য হলো যে—যতীশ ও অশোক পুলিশের নজরে না-থাকায় এবং দলের মতবাদ ও নীতি রক্ষা করে একটি কাগজ চালাবার বিদ্যাবুদ্ধি ও দক্ষতার অধিকারী হওয়ায় তাঁরা সম্পাদকের পর সম্পাদক জেলে গেলেও কাগজটিকে ( অগোচরে অবস্থান করে ) কিছুকাল বাঁচিয়ে

রাখতে পারবেন। হলোও তাই। সুনীলবাবুর জেল হয়ে গেল। তৎপর এলেন প্রসন্ন পাল। তাঁর পরে তাঁরও জেল হয়ে যায়। তথাপি ১৯৩২ সালের শুরু পর্যন্ত নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও বেণুকে বাঁচিয়ে রাখা গিয়েছিল। কিন্তু এর পর আর সম্ভব হয় নি বেণুর প্রকাশ অব্যাহত রাখা। যতীশ গুহ এবং অশোক সেনকেও পুলিশ বিনা বিচারে বন্দী করল; প্রেসের দরজায় তালা লাগিয়ে দিল।...

পর পর সম্পাদকদের দীর্ঘকালের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ, প্রেস ও কাগজের উপর অর্থদণ্ড এবং গ্রাহক গ্রাহিকাদের অনেকের উপর পুলিশের হুমকি সত্ত্বেও দেশবাসীর স্নেহচ্ছায়ায় বেণু প্রায় ছ' বৎসর জাতির সেবায় সার্থকতা লাভ করেছিল। শেষের দিকে নিজস্ব প্রেস সহ বেণু প্রথমে ঝামাপুকুর এবং পরে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে উঠে যায়। সর্বশেষে বেণু প্রকাশিত হয় চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ থেকে।

দলের কর্মীদের মধ্যে এই পত্রিকাটি পরিচালনা বা প্রচারের দায়িত্ব পড়েছিল যাঁদের উপর—তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ছে রেবতী বর্মণ, নির্মল গুহ, রাখাল দত্ত, মাখন দত্ত, যতীশ গুহ, নীরদ দত্তগুপ্ত, মীরা দত্তগুপ্ত, ইন্দু সরকার, শচীন ভৌমিক, সুধীব নন্দা, মণি সেন, সুধীর ঘোষ, চারু ঘোষ, কৃষ্ণ সরকার, সুনীল সেনগুপ্ত, নিরঞ্জীব রায়, বারীন রায়, প্রমোদ রায়, প্রসন্ন পাল, হরিপদ ভৌমিক, পরিমল রায়, ফণী কুণ্ডু, রবি ভট্টাচার্য, অশোক সেন ( বড ), শ্যামল ঘোষ, সুজিৎ দাসগুপ্ত ( স্বর্গগত ), মণি ভৌমিক ও সুনির্মল মল্লিকের কথা। 'বেণু' প্রকাশের শুরুতে বেবতী বর্মণের সুন্দর চেষ্টা, 'বেণু'র নিজস্ব প্রেস হবার পূর্ব পর্যন্ত নির্মলচন্দ্র গুহের 'ডেভেন হ্যাম্ প্রেস' কর্তৃক বিনা পয়সায় বেণু-সম্পর্কিত যাবতীয় ছাপার কাজ সম্পন্ন করার সার্থক প্রয়াস এবং দলের প্রত্যেকটি কর্মীর 'বেণু'কে সুপ্রতিষ্ঠিত করার তপঃক্লিষ্ট ইতিহাস আজ বর্ণঘন স্বপ্নের জাল বুনে যায়।

'বেণু' কেবল একখানা মাসিক-পত্র ছিল না। 'বেণু' ছিল একটি যুগের সাধনাপ্রোজ্জ্বল আক্ষরিক রূপ। বেণুর অবদান বিপ্লবী-বাঙলার প্রতি রক্তরেণুতে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪-এর অগ্নিযুগের যত বহ্নিজ্বালা—বেণুব ধ্বনিতরঙ্গে তার অভ্রান্ত স্বাক্ষর।...

এর পর বহু বৎসর অতীত হয়ে গেছে। দেশের অবস্থান্তর ঘটেছে প্রচুর। কিন্তু 'বেণু'র এককালের দরদী বন্ধুর দল যে বেণুকে ভুলতে পারেন নি তার প্রমাণ পেলাম প্রখ্যাত সাহিত্যিক কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বেচ্ছায় প্রেরিত একখানা পত্রে। পত্রখানা লিখেছেন তিনি ১৯৪৫ সনের ১৬ই জুলাই 'বেণু'র প্রাক্তন সম্পাদক ভূপেনবাবুকে প্রেসিডেন্সি জেলের ঠিকানায়। পত্রাংশ উদ্ধৃত হল:

"...নববর্ষ যে কেন আসেন তা জানি না—তাঁরও বোধহয় চাকরি বজায় করা। 'যা পাই তা চাই না, যা চাই তা পাই না!' —তাই তাঁর আসার কোন সার্থকতা দেখি না। ফাঁকা আওয়াজ অনেক পাই বটে, তাতে লোকের শ্রদ্ধা জাগে না।...এখন আমার প্রিয় ভায়েদের ভালবাসা জানাই। তোমাকে না জানালেও সে সঙ্গেই রইল। যেখানে থাকি 'বেণু'-রব ভুলব না ভাই।—তোমাদের শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশী।"...

তারপর ১৯৪৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বরের কথা বলি। সেদিন বম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত 'প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনে'র পঞ্চবিংশতি অধিবেশনের শিশুসাহিত্য শাখায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি)। তাঁর ভাষণে প্রসঙ্গক্রমে 'বেণু' সম্পর্কে যে কথাগুলো তিনি বলেছেন তা এখানে উল্লেখ করবো। তিনি বলেছেন:

"...বাংলা শিশুসাহিত্যের অমন উজল আঙিনা আঁধার হয়ে আসছে দেখে রামানন্দবাবু প্রবাসীতে 'পাততাড়ি' নাম দিয়ে ছোটদের একটি বিভাগ খুললেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হলো না। **তখনই বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ক্লীবত্বের অবসান ঘটাতে বেরুলো 'বেণু' নামে কিশোর ও তরুণদের এক পত্রিকা—যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেজে উঠলো দেশের রাজনৈতিক জাগরণের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে একই সঙ্গে শিশু-কিশোর যুবক-যুবতীদের জাগিয়ে তোলার মত সাহিত্যের সুর।** আমরা, তখন যাদের 'খোকাখুকু' পড়বার বয়স পার হয়েছিল, যাদের মন বিপ্লবের চেতনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল—যারা বুঝতে পারতেম তখনই যে, এখন আমাদের ডিটেকটিভ ও কাল্পনিক এ্যাডভেঞ্চারের গল্প পড়ে কল্পনাবিলাসী হওয়া উচিত নয়, যারা খুঁজছিল

**জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত ও সবল করার উপাদান—তারা তা' সর্বপ্রথম পেলো এই 'বেণু' পত্রিকাতেই।** 'বেণু' কিশোর-মনে নির্ভীকতা ও স্বৈরতন্ত্রী-শাসকের বিরুদ্ধে শক্তি সংগঠনের নূতন বীজ বপন করল। এ কাজে সহযোগিতা করলেন—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র। কিন্তু সেই কঠোর আমলাতান্ত্রিক যুগে এই পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখা শক্ত হলো। রাজরোষের প্রবল চাপে 'বেণু' নিছক শিশু-পত্রিকা না হলেও দিয়ে গেল বাংলার ছোটদের সাহিত্যের নতুন পথনির্দেশ। সেই পথ ধরে আমরা কত লেখাই লিখলাম—আর সেই সব লেখা নিয়ে সেযুগের দু'টি বিশিষ্ট শিশু-পত্রিকার সম্পাদকের দরবারে কত ছুটোছুটি করলাম, কত দরবারই না করলাম, কিন্তু তাঁরা বিশেষ কোনো কারণেই হয়তো আমাদের মত নতুন বিপ্লবীদের লেখা ছাপলেন না।"…

* * * *

এখানে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য, বাঙলা দেশেব সর্বদল নির্বিশেষে নারী-বিপ্লবিনীদের আবির্ভাব ও তাঁদের কৃত 'ডাইরেক্ট য়্যাকশানে'ব মূলে হেমচন্দ্র ঘোষের দলটির বিশিষ্ট অবদান যে রয়েছে তা অস্বীকার করবাব উপায় নেই। 'বেণু'র আহ্বান নারীপুরুষ প্রত্যেক তরুণ-প্রাণেব কাছেই অপ্রতিহত আবেগে পৌঁছলেও বাংলার মেয়েদেরকে বোমা-পিস্তল হস্তে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমে পড়বার আহ্বান বিশেষ করে জানিয়েছিল বেণু-সম্পাদক ভূপেন্দ্রকিশোর লিখিত ছোটগল্পের একখানা পুস্তক। নাম তাব **'চলার পথে'**। পুস্তকের প্রারম্ভে ছিল এক ভয়ঙ্কর সুন্দর শৃঙ্খলমুক্তা নারীর চিত্র। তার দু'হাতে তখনো টুকরো-হয়ে-যাওয়া শৃঙ্খলখণ্ড জড়িয়ে রাছে। পায়ের শৃঙ্খলও দ্বিখণ্ডিত। চিত্রের নীচে লেখা : "ভাঙনের পালা শুরু হল আজি, ভাঙ ভাঙ শৃঙ্খল!"…

চলারপথে বইখানা বেরিয়েছিল ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। বইখানার ভূমিকাপত্রে সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্র গ্রন্থকারকে লিখেছেন : "…'পথের দাবী' যখন সরকারে বাজেয়াপ্ত হয় পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ আমাকে লিখেছিলেন তোমার বক্তব্য যদি প্রবন্ধাকারে লিখতে তার মূল্য অল্পই থাকতো। কিন্তু গল্পচ্ছলে যা' দিয়েছো দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই। **'চলার পথে'**-র সম্বন্ধেও আমি এই আশীর্বাদ করি। এবং বলি, বাংলা দেশের সমস্ত ছেলেমেয়েদের এই বইখানি পড়ে দেখা উচিত।" ( ২০শে অগ্রহায়ণ, '৩৬ )…

কিন্তু 'চলারপথে' প্রকাশিত হওয়া মাত্রই সরকার পুস্তকখানা বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। ফল তাতে সরকারের পক্ষে শুভদায়ক হয় নি। জীবনযাত্রায় নূতনতর প্রাণসত্তার দ্বার এ-পুস্তকখানাই মুক্ত করে দেবার সন্ধান দিল। 'চলার পথে'র নায়িকাবৃন্দ বাঙলার যৌবন-ধর্মের আদর্শ প্রতীক হয়ে বাঙালীর কন্যাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাক দিল। সেই ডাক উপেক্ষা করা বড় সহজ নয়। তাই তারপরে, বাঙলা দেশে বিপ্লব-ইতিহাসে নারীর যে দুঃসহ পদযাত্রার স্বাক্ষর মিলেছে —তা' তো সত্যি কোন গালগল্পের কথা নয়? গল্পের সীমা পেরিয়ে বাস্তবের কঠিন সত্যে তা পৃথিবীর বিপ্লবীদেরকেও বিমুগ্ধ করেছে!...

এই পুস্তক সংগোপনে অনেক সতর্কতায় 'বীণা লাইব্রেরী'-র (ঢাকা) সুরেন সরকার তাঁর প্রেসে ছাপিয়ে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন। নিশ্চত বিপদ জেনেও তিনি এ-কাজটি গ্রহণ করেছিলেন শুধু 'বি-ভি'র আদর্শে তাঁর গভীর অনুরাগ জন্মেছিল বলে।...

## অজানিত শহিদ

প্রত্যেক বিপ্লবীদলের জীবনেই অজানিত শহিদেরও কর্মগাথা বিরচিত থাকে। তাঁদের কথা কেউ জানে না। দলের লোকেদের অনেকেও না। সবার অলক্ষ্যে তাঁদের আত্মদান ঘটে বলেই আমরা তাঁদের ভুলে যাই।...হেমচন্দ্রের দলের কথা লিখতে গিয়ে আজ এমনই অজ্ঞাতনামা দু'একটি তরুণ শহিদের স্মৃতি প্রথম মনে জাগে।...

* * * *

১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাস। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় জনৈক খুব দায়িত্বশীল বড়কর্তার (বাঙালী নয়) কাছ থেকেই বাঙলা দেশের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের কাছে ঐ সময়ে একটি আবেদন এল, দেশে অতি সামান্য কিছু গোলমাল করার প্রস্তাব সহ। গোলমাল আর কিছুই নয়—কিছু টেলিগ্রাফের তার কাটতে হবে সারা ভারতবর্ষে, এবং বাঙলায়ও উক্ত কার্যক্রম অনুসরণ করা দরকার। এ ধারার একটু 'আনরেস্ট' হলেই নাকি কংগ্রেসের কিছু রাজনীতিক-দাবী ইংরেজের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে সুবিধে হতে পারে।...

বাঙলা দেশ এ-আবেদন উপেক্ষা করে নি। উক্ত প্রোগ্রাম অনুসারে নানা স্থানে বহু টেলিগ্রাফের তার কাটা হয়। কে বা কারা এসব করল তা' পুলিশের অজ্ঞাত ছিল—অন্তত কোন বিপ্লবীদলের যে এ-কাজ নয়, তৎসম্বন্ধে তারা নিশ্চিত ছিল বলে মনে হয়।

'বি-ভি'কে-ও এ-কাজের কিছুটা দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, বিক্রমপুর অঞ্চলে ছেলেরা বেশ কিছু জায়গায় টেলিগ্রাফের তার কেটে যোগাযোগের ব্যবস্থা কিছুটা বিঘ্নিত করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-ব্যাপারে 'বি-ভি'কে মূল্য দিতে হয় বড বেশি। দুইটি তরুণ—সাহসে, নিয়মানুগত্যে ও মন্ত্রগুপ্তিপালনে তাঁরা তৎপর। নাম তাঁদের **নৃপেন দত্ত** ও **বীরেন রায়চৌধুরী**। নৃপেনের বাড়ি ঢাকায়, বীবেনের বাড়ি ফরিদপুরে। দলের নির্দেশে কলকাতা থেকে তাঁরা রওনা হয়ে গেলেন উত্তরবঙ্গের এক অঞ্চলে ঐ কাজের জন্যে। একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁরা কতগুলো জায়গায় তার-কাটার কাজ বন্ধুদের সঙ্গে সমাপ্ত করেছেন। তারপর দু'জনে ফিরে যাচ্ছেন তাঁদের আস্তানায়। রেলওয়ে-লাইন ধরে যাচ্ছিলেন তাঁরা। গভীর অন্ধকার। চোখে দেখা যায় না কিছুই। হঠাৎ কোত্থেকে একটা চলন্ত ট্রেন এসে পডল। সরে পডবার ফুরসৎ হলো না। নিশীথের অন্ধকারে বিলীয়মান যুবকদ্বয়ের শরীরী-রূপ প্রভাতসমাগমে আর লোকসমক্ষে ফিরে এল না!…

দলের দু'চারজন লোক ছাড়া বহুকাল কেউ জানে নি তাঁরা কোথায়? তাঁদের সংবাদ কি? বাপ-মা, ভাইবোন, আত্মীয়-বন্ধু হয়ত কত নিশি জাগরণে কাটিয়েছেন তাঁদের অপেক্ষায়—কিন্তু সঠিক সংবাদ কাউকে জানাবার উপায় ছিল না। বিপ্লবীদের গোপন-জীবনের নিয়মানুবর্তিতা এমনই কঠোর, এমনই নির্মম যে বেদনায় বুক ফেটে গেলেও মুখ খুলবার অধিকার নেই। আজ এই শহিদদ্বয়ের আত্মবিলয়নের কথা সবার গোচরীভূত করার মধ্যে গৌরব আছে, স্বস্তিবোধও আছে। আজ একথাও বলতে হবে যে নৃপেন দত্ত ও বীরেন রায়চৌধুরির মৃত্যু শহিদের মৃত্যু। শহিদদের মধ্যে জাতবিচার নেই, ছোট-বড় নেই। আদর্শমুখর কর্তব্যের ডাকে নিঃশেষে যিনি প্রাণ দিলেন তিনি 'শহিদ'। তিনি জাতি-স্রষ্টা। তিনি সর্বকালে সর্বদেশে সকলের প্রণম্য।

* * * *

আর একটি তরুণ। নাম তাঁর **প্রবোধ মজুমদার**। বাড়ি চট্টগ্রাম।

কর্মস্থল মৈমনসিংহ জিলায়। জ্যোতিশ জোয়ারদারের সহকর্মী। 'বি-ভি'র একনিষ্ঠ অনুগামী। মৈমনসিংহে 'বি-ভি'র কর্মকেন্দ্র-সংগঠনে প্রবোধের দান প্রচুর। প্রথম শ্রেণীর এই বিপ্লবী-কর্মীর বুদ্ধি, কর্মজিজ্ঞাসা, সংগঠন ক্ষমতা, কষ্ট-সহিষ্ণুতা এবং প্রশমিত-চিত্ত সকলের ভালবাসা টেনে নিত, শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত। ...বন্দী হয়ে এলেন প্রবোধ ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে, ১৯৪২ সালে। হঠাৎ একদিন অসহ্য পেটের ব্যথায় প্রবোধ অস্থির। কিন্তু জেলের ডাক্তার বুঝলেন না কিছুই। সাধারণ কোষ্ঠকাঠিন্যের ওষুধ দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত রইলেন। কাজেই ধরা পড়লো না যে ওটা সত্যি এপেন্‌ডিক্সের গোলমাল। তারপর খুব বাড়াবাড়ি হ'তেই সিভিলসার্জনের ডাক পড়ল। অভিজ্ঞ চিকিৎসক। রোগী দেখেই রোগ বুঝলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে তুলে দিলেন অপারেশান-টেবিলে। কিন্তু মৃত্যু হল প্রবোধের ঐ টেবিলেই। এপেন্‌ডিক্স ফেটে গেছে!—শেষ হয়ে গেল একটি প্রোজ্জ্বল দীপশিখা! রোগ-দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বিপ্লবী প্রবোধ মজুমদার উত্তীর্ণ হলেন বন্ধনহীন শহিদলোকে।

## দলের আরো কথা

এবার এক বৎসর পূর্বে ফিরে যাবো। ১৯২৮ সাল। এ বৎসর কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস-অধিবেশনের দান বাংলার রাষ্ট্রনীতিক-ইতিহাসে যে বর্ণদীপ্ত হয়ে আছে তা পূর্বে আমরা বলেছি। ...ইতিমধ্যে দ্বিতীয় দফায় কারা-জীবন ভোগ করে বিভিন্ন দলের বিপ্লবী-কর্মীবৃন্দ নূতন করে মুক্তিলাভ করেছেন। 'মুক্তিসংঘে'র কোন বিপ্লবী নেতা বা কর্মী এ-যাত্রায় জেলে যান নি। পূর্বেই বলেছি যে, সকলের অজ্ঞাতে এই দলটি সমগ্র বাংলাদেশে এবং বহির্বাংলায় সংগঠনকার্যে এগিয়ে যাচ্ছিল। ভবিষ্যতের বিপ্লব-রচনার প্রস্তুতি অব্যাহত ছন্দেই এ-দল বজায় রেখে চলেছিল।....

কিন্তু '২৮ সালের শেষাস্তে কার্যপদ্ধতি নিয়ে দলে মতান্তর ঘটায় ভাগাভাগির লক্ষণ দেখা গেল। অনিল রায় ও লীলা নাগের নেতৃত্বে কিছু কর্মী আলাদা হয়ে 'শ্রীসংঘ' নামেই ভিন্ন রাজনীতিক-দল গড়া সঙ্গত মনে করেন। তাঁরা তখন 'ডাইরেক্ট য়্যাক্‌শান' কার্যকরী হবে না স্থির করে ভবিষ্যতে আরো তৈয়ের হয়ে কিছু করার সংকল্পে (১৯২৯ সাল থেকে) জোর দিলেন। এই 'বিপ্লবী-শ্রীসংঘে'র তৎকালীন এবং কিছু পরের কর্মীদের মধ্যে প্রধানতম ছিলেন অনিল দাস, শৈলেশ রায়, ক্ষিতীশ

রায়, বারীন রায়, অনিল ঘোষ, হরিপদ চক্রবর্তী, জীবন দত্ত, কমলাকান্ত ঘোষ, রেবতী বর্মণ, রেণু সেন ( বসু ), বীরেন পোদ্দার, নরেন সরকার, ধীরেন ঘোষ, অশোকানন্দ বসু, অতীন বসু, সুবোধ ঘোষ, সুনির্মল দত্ত ( স্বর্গগত ), সুধীর নাগ, অমল রায় প্রমুখ।

**ভবেশ নন্দী** কিন্তু কোন তরফে যোগ দিলেন না। তিনি একটু আলাদা হয়েই রইলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দুটি বিভাগকে কর্মের বন্ধনে পুনর্মিলিত করার চেষ্টায় অপরাগ হলেও, অন্তত উভয় পক্ষের 'মতান্তর' যাতে 'মনান্তরে' পরিণত না হয়—সেদিক থেকে কাজ করে যাওয়া। বিপ্লবীদলগুলোর মধ্যে 'মনান্তর' ঘটলে তার পরিণতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে।...

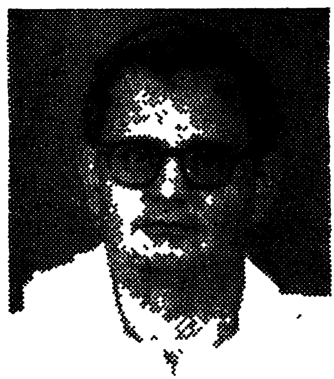

ভবেশচন্দ্র নন্দী

'মুক্তিসংঘ' যে হেমচন্দ্রের পার্টির গোপন নাম ছিল তা বলা হয়েছে। কাজেই শ্রীসংঘকে ( শ্রীসংঘ 'মুক্তি-সংঘে'র অন্যতম সমাজসেবী পাবলিক প্রতিষ্ঠানের নাম ) যখন অনিলবাবু তাঁর বিপ্লবকর্মের সংস্থারূপে প্রচারিত করলেন, তখন পুলিশ 'শ্রীসংঘ' এবং মূল দলকে আলাদা করে বুঝবার জন্যে ঐ মূল দলকে একটি 'নামে' পরিচিত করতে ব্যগ্র হল। 'হেম ঘোষের দল' বা 'ঢাকা পার্টি'—এ ধারার নাম পুলিশের কণ্ঠে ব্যবহৃত হলেও ১৯২৯ সালের পর ও-জাতীয় নামে হেমচন্দ্রের সারা বঙ্গদেশব্যাপী দলকে চিহ্নিত করায় পুলিশের অসুবিধা ছিল। যা হোক, মূল দলের পুলিশী-নামকরণের ইতিহাস যথাস্থানে উল্লেখ করবো।...

ভাগাভাগির ফলে স্বভাবতই মূল দল কিছুটা দুর্বল হয়েছিল। কিন্তু দুর্নিবার কর্মশক্তি ও কর্মস্পৃহা এবং বিপ্লবাত্মক-চৈতন্য মূল দলটিতে অজস্রতায় বর্তমান ছিল। মূল দলের দুর্বলতা তাই বোঝাই গেল না। ভিতরের ভাগাভাগি বাইরে

অধিকাংশ সময় মন্দ রূপ ধারণ করে-নি বলেই পুলিশের ধারণা ছিল যে—এই 'ভাগাভাগি'র ব্যাপারটা হয়ত সত্যিকারের বিভেদ নয়, পুলিশের চোখে ধূলো দেবার নতুন একটি ছল মাত্র !…

*   *   *   *

মূল দলের সর্বময়-নেতা হেমচন্দ্র হলেও তিনি তাঁর প্রধান কর্মীদের নিয়ে একটি **সমবেত-নেতৃত্বে** সমগ্র দলটিকে কর্মচঞ্চল করে রেখেছিলেন। তিনি কোন কালে 'ডিক্টেটর' ছিলেন না। অথচ সকলের কাছে সর্বাধিনায়কের সম্মান তিনি চিরকাল পেয়ে এসেছেন। 'সমবেত-নেতৃত্ব' তাই সর্বাধিনায়কের অধীনে বিশেষ তাৎপর্যে কাজ করে যাচ্ছিল। ফলে দলের মধ্যে যাঁদেরই যথার্থ প্রতিভা, নেতৃত্ব ও কর্মশক্তি ছিল তাঁরাই যথাযোগ্য স্থানে কাজের সুযোগ পেতেন। হেমচন্দ্রকে ঘিরে এই 'সমবেত-নেতৃত্ব' বিশিষ্ট সৌন্দর্যে লক্ষ্যণীয়। সেখানে একটি মানুষ যেন একই মন, চিন্তা ও ভাবনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। দলের বাস্তব প্রতিনিধিত্ব এঁদের যে-কেউ করতে পারতেন। মতের বা মনের অমিল কার্যক্ষেত্রে কেহ কখনো হেমচন্দ্র বা তাঁর বন্ধুদের পরস্পরের মধ্যে দেখে নি।…এ-যুগে মূল দলটির কার্যকরী-সংসদের সভ্যরূপে হরিদাস দত্ত প্রমুখ দলের প্রতিষ্ঠাতা-সভ্যদের সঙ্গে সত্যরঞ্জন বক্সি, রসময় শূর, সত্য গুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, সুরেন নাগ, প্রফুল্ল দত্ত, ভূপেন রক্ষিত-রায়ের নাম উল্লেখ করতে হয়। এই কার্যকরী-সংসদের প্রধানতম সহায়ক ছিলেন জ্যোতিশ জোয়ারদার, যতীশ গুহ, তেজোময় ঘোষ, জিতেন সেন, সুপতি রায়, নিকুঞ্জ সেন, সুধীর নন্দী, অশোক সেন, গোপাল সেন, অনিমেষ রায়, শচীন ভৌমিক, মণি সেন নির্মল গুহ প্রমুখ।

**সত্যরঞ্জন বক্সি** প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সুভাষচন্দ্র-শরৎচন্দ্রের বিশ্বস্ততম বন্ধু। তিনি পাবলিক-পলিটিক্সে দলের প্রতিনিধিত্ব করতেন।…

**মীরা দত্ত-গুপ্ত** মহিলাকর্মী-সংগঠনের ভার পেয়েছিলেন। তাঁর মন্ত্রগুপ্তি-রক্ষায় নৈপুণ্য এবং সাংগঠনিক-কর্মদক্ষতা অনস্বীকার্য। প্রভাবশালী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর কন্যা রূপে তাঁর গৃহ নিরাপদ থাকায় 'বি-ভি'র বম্ব-পিস্তল সংগোপনে মজুদ রাখার উহা একটি আস্তানা ছিল। উত্তর কালে য়্যাসেমব্লির

সভ্যা রূপে, শিক্ষাপ্রসারের কাজে এবং সমাজ-সেবায় মীরা দত্ত সেই সংগঠনক্ষমতা ও নিষ্ঠারই পরিচয় দিয়েছেন যা' এককালে বিপ্লবকার্যে তিনি নিযুক্ত করতে পেরেছিলেন।....

১৯৩০ সালের পর থেকে ঢাকায় ও কলকাতায় গোপনে ছাত্রীদের মধ্যে বিপ্লবের কাজ যাঁরা করতেন তাঁদের মধ্যে উজ্জ্বলা মজুমদার, সন্ধ্যারানী দত্ত, কমলা দাসগুপ্তা, চামেলী বসু প্রমুখা ছিলেন অগ্রণী।

মীরা দত্ত-গুপ্ত

এখানে বলে রাখা ভাল যে, নারায়ণগঞ্জে 'বি-ভি'-কেন্দ্রের প্রথম পত্তনে জ্যোতির্ময় রায়, হেমেন্দ্র দাস, সুকুমার (কালু) সেন, রণদা চৌধুরী, অম্বুজ চ্যাটার্জি ও মনীন্দ্র মিত্রের চেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। পরে অবশ্য কালীপদ (মালু) ব্যানার্জি, রমেশ চ্যাটার্জি এবং দেবেন দাস প্রমুখ কর্মীরা এর দুর্ধর্ষ বৈপ্লবিক-রূপ দান করেন বিশেষ তাৎপর্যে।

নির্মলচন্দ্র গুহ এবং মণীন্দ্রনারায়ণ র। (তৎকালে বিহারে 'Search Light' পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক) বাংলার বাইরে দল-সম্প্রসারণে চেষ্টিত হন। মণীন্দ্রনারায়ণ কিছুদিনের মধ্যেই 'কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা' নিয়ে একখানা প্রামাণ্য পুস্তক লেখেন। নির্মল গুহ তাঁর 'ডেভেনহ্যাম প্রেসে' বইখানা ছাপালেন এবং নিজে উহার প্রকাশক হলেন। বইখানা সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। 'প্রেস-এ্যাক্টে'

নির্মল গুহ এবং 'সিডিশান'-এ্যাক্টে মণীন্দ্রনারায়ণ রায় দু'বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন এবং আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে প্রেরিত হন। সেটা ১৯৩০ সাল।...

দলের সংগঠন-কার্যের ধারা বিপুল বেগে এগিয়ে চলে পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে শচীন ভৌমিক, মণি ভৌমিক, সুনীল সেনগুপ্ত, মালু ব্যানার্জি, বীরেন গুহ-রায়, রমেশ চ্যাটার্জি, কামাখ্যা রায়, বিনয় সেনগুপ্ত, মধু ভট্টাচার্য্য, প্রভাত নাগ, নিরঞ্জীব রায়, সুকুমার ঘোষ, চারু জোয়ারদার, কমেট দাসগুপ্ত, বীরেন ঘোষ, হরিদাস সেন, সরল গুহ, কুমুদ মুখার্জি, সত্যেন দাসগুপ্ত, সুনীল সেন ( ঢাকা মেডিকেল স্কুল ), অমূল্য মুখার্জি প্রমুখ কর্মীদের ধৈর্য্যে ও কর্মস্পৃহায়।

১৯২৭ সালে দীনেশ গুপ্তকে পাঠান হলো মেদিনীপুরে কাজকর্মের 'ফিল্ড' পর্যবেক্ষণ করার জন্যে। দলের ইচ্ছা, ওখানে একটি কর্মকেন্দ্র গড়ে তোলা হোক। দীনেশচন্দ্র ১৯২৮ সালে মেদিনীপুর কলেজে ভর্তি হয়ে কাজ শুরু করে দিলেন। ক্রমে তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়ালেন পরিমল রায়, ফণী কুণ্ডু, ক্ষিতি সেন, হরিপদ ভৌমিক, প্রফুল্ল ত্রিপাঠী ( স্বর্গগত ), অমর চ্যাটার্জি প্রমুখ কিশোরবৃন্দ। এঁদের সনিষ্ঠ কর্ম-ইতিহাস যথাস্থানে ব্যক্ত করা হবে।

**১৯২৮ সাল** সারা বাংলার বিপ্লবীদের কাছে একটি অগ্নিগর্ভ যুগের বার্তা নিয়ে উপস্থিত হল। সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে, মেজর সত্যগুপ্তের প্রতিভাদীপ্ত নেতৃত্বে হেমচন্দ্রের দলের কর্মীরা 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এ ( কংগ্রেস অধিবেশনে আহূত ) স্বেচ্ছাসৈনিকরূপে যোগ দিয়ে বাংলাদেশ জুড়ে বিভিন্ন বিপ্লবীদলের সঙ্গে ভলান্টিয়ার-মুভমেণ্ট পরিচালনার কার্যক্রম গ্রহণ করেন।

## বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স মুভমেণ্ট

সুভাষচন্দ্র পরিচালিত **বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স** নামক স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ১৯২৮ সালের 'কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে'র এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এ বাহিনী বাঙলার বিপ্লবীদের কল্পনায় সমুজ্জল হয়ে এক দুর্জয় কর্মপথের সন্ধান দিল। হেমবাবু ও তাঁর বন্ধুগণ 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-মুভমেণ্ট'কে শুধু মুভমেণ্টের ভূমিকায় রাখলেন

না। তাঁরা গভীর নিষ্ঠায় উহাকে বিপ্লবী-কর্মপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করলেন। এ সম্ভব হয়েছিল সত্য গুপ্তের দক্ষ নেতৃত্বে। তাঁর চমৎকার মিলিটারি মন, মেজাজ ও শিক্ষা ছিল। তাঁর রক্তে ছিল একটি ভয়হীন সেনানী। তাঁর প্রত্যয় ছিল সুসংযত সেনাধ্যক্ষের। হেমচন্দ্রের 'মুক্তিসংঘ' আর 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স মুভমেণ্ট'-সংস্থা কার্যত ভিতরে-বাইরে মিলেমিশে গিয়েছিল কর্মীদেরই ইচ্ছায়। পুলিশ এই সূত্রে হেমবাবুর বিপ্লবী-সংস্থার নাম দিল 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'—সংক্ষেপে 'বি-ভি'। দলের সভ্যরা যুগান্তর-দলের সভ্যদের মত 'বি-ভি' নামটিকেও অস্বীকার করেন নি।...

কংগ্রেস-অধিবেশন শেষ হলেও সুভাষচন্দ্র 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' ভেঙ্গে দেন নি। তাঁরই নেতৃত্বে বিপ্লবীদলগুলো একটি মুভমেণ্ট রূপে এবং স্বেচ্ছাসৈনিক-বাহিনীর তাৎপর্যে একে চালু রাখলেন। বাংলাদেশ জুড়ে বিপ্লবীদলগুলো এই বাহিনীটিকে জীবন্ত করে তোলার দায়িত্ব যাঁদের ওপর দিয়েছিল তাঁদের অন্যতম হলেন—সত্য গুপ্ত, যতীন দাস, প্রতুল ভট্টাচার্য, জগদীশ চ্যাটার্জি, পঞ্চানন চক্রবর্তী, অনন্ত সিং ও লোকনাথ বল। বিভিন্ন বিপ্লবীদল বেঙ্গল-ভলান্টিয়ার্স-মুভমেণ্টকে গ্রহণ করেছিল বিপ্লবের অস্ত্ররূপে। 'মুক্তিসংঘ' গ্রহণ করল এ আন্দোলনকে শুধু অস্ত্ররূপে নয়, বিপ্লবের প্রাণরূপেও।

সত্য গুপ্তকে তাঁর নিজের পার্টিতে এই স্বেচ্ছাসৈনিক-বাহিনী সংগঠনে যাঁরা নানা জিলায় সুদক্ষ নিষ্ঠায় সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তেজোময় ঘোষ, জ্যোতিশ জোয়ারদার, হারাণ দত্ত ( স্বর্গগত ), বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত, বাদল ( সুধীর ) গুপ্ত, ননী চৌধুরী, নির্মল বসু, বীরেন ঘোষ, দেবেন ভৌমিক ( বুক্ষু ), রমাপতি ( নাণ্টু ) মিত্র, পরিমল রায়, ফণী কুণ্ডু, ক্ষিতি সেন।

কলকাতায় এ-ব্যাপারে সত্যগুপ্তকে সাহায্য করতেন নীরদ দত্ত-গুপ্ত, নীহার দত্ত ( স্বর্গগত ), কমেট দাসগুপ্ত, অমল দত্ত, প্রিয়শংকর, মনিশংকর, অশোক সেন ( জাস্টিস্ ), সত্যেন দাসগুপ্ত প্রমুখ তরুণ দল।

সামরিক প্যারেড শিক্ষা গ্রহণে এঁদের প্রচুর পরিশ্রম করতে হত। অনিল রায়-চৌধুরি নামে দক্ষিণ কলিকাতার একটি স্বেচ্ছাসৈনিকের অকাল-মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে মেজর সত্য গুপ্ত লিখছেন :

"বিভি-র মাস্-প্যারেড, মার্চ-পাস্ট ও রুট মার্চ সেদিন সারা ভারতবর্ষের বিস্ময়ের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। পার্কসার্কাস ময়দানে স্বেচ্ছাসৈনিকের শিবির-জীবন

তখন এমনই কঠোরতাপূর্ণ ছিল যে কর্মঠ ব্রতী-সৈনিক **অনিল রায়-চৌধুরি** কিছুদিনের মধ্যে Sun-stroke-এ মৃত্যুমুখে পতিত হন।"

( বিপ্লবী-বাংলা রচনায় বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স—'আমার দেশ', ১৩. ৯. ৫৩ )

দক্ষিণ কলিকাতায় 'বিভি'-গুপ্তসমিতি সংগঠনে ভূপেন বসু, কেস্ট সরকার চারু ঘোষ, নীরদ দত্তগুপ্ত, বিনয় বসু ( স্বর্গগত ), ইন্দু রায়, সুনীল সেন, এবং অনেক পরে মুকুল কর, চঞ্চল মজুমদার, রাতুল রায়, ধীরেন মুখার্জি ও বিমল দত্তের নাম উল্লেখ করতে হয়।

১৯৩০ সালের মধ্যে **'বিভি'**-র ( এখন থেকে আমরা এই দলকে 'বিভি' বলেই উল্লেখ করব ) প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হল।...চট্টগ্রামের বিদ্রোহ-দুন্দুভি 'জিরো আওয়ার' অতিক্রান্ত হবার সংকেত জানিয়েছে। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, চট্টগ্রাম-বিদ্রোহের নায়ক একদিন ( ১৯২৯ সালের শেষান্তে ) হেমচন্দ্রের সঙ্গে আলাপে 'সকলে মিলে একটা কিছু করা'র কথা বলায় তিনি ( হেমচন্দ্র ) বলেছিলেন: যদি সত্যি কিছু করতে চাও তবে চুপেচুপে তৈয়ের হও। তারপর সহসা একদিন দুঃসাহসে ঝাঁপিয়ে পড়ো। কাউকে কিছু বোলো না। আমাকেও না। সব পণ্ড হয়ে যাবে। 'মন্ত্রগুপ্তি-রক্ষা' মানে যাকে একান্ত বিশ্বাস কর তাঁকেও অকারণে কিছু না বলা। একেবারে নিজের কাছে তোমার কথা লুকিয়ে না রাখলে দেখবে —সার্থক বিপ্লবের নায়ক না হয়ে আখেরে হয়তো হবে একটি ব্যর্থ-ষড়যন্ত্রের নেতা!' ...সূর্য সেন গভীর করে প্রবীণ নেতার কথাগুলো হয়তো সেদিন শুনেছিলেন।...

* * * *

২৫শে আগস্ট ( ১৯৩০ ) টেগার্টের উপর ডালহৌসি স্কোয়ারে বোমা পড়ল। কাজেই 'বি-ভি' আর অপেক্ষা করতে পারে না।...

## রিভোল্টিং গ্রুপ ও যুগান্তরের সঙ্গে যোগাযোগ

১৯২৭ সালের শেষের দিকে বিপ্লবী বন্দীরা জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন। মেদিনীপুর জেলে অনুশীলন-সমিতির নরেন সেন, রবি সেন, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ( মহারাজ ) ও প্রতুল গাঙ্গুলির সঙ্গে যুগান্তরের যাদুগোপাল মুখার্জি, মনোরঞ্জন গুপ্ত ও ভূপতি মজুমদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দিনের পর দিন উভয় দলের সংগঠন ও

ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিয়ে বহু আলাপ-আলোচনা করেন। অবশেষে তাঁরা স্থির করেন যে, জেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে দুটি দলকে একত্রিত করে ফেলবেন। সম্মিলিত একক একটি সংস্থারূপে তাঁরা বিপ্লবের কাজ শুরু করবেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হবে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা।...

জেল থেকে বেরিয়েই নেতারা মিলনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু ১৯২৮ সালের কংগ্রেসেই নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে কঠিন মনান্তর হল, ফলে মিলনের স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। উভয় দলেরই দ্বিতীয় ধাপের নেতাদের অনেকের ধারণা হল যে 'নেতারা' সত্যি বিপ্লবের পথে যেতে চান না; কেবল ক্ষমতার লোভেই 'দল' রাখছেন বলে মিলন-চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, ভাবী বিপ্লব-অভ্যুত্থানের যে-আশা তাঁরা দিয়েছিলেন তা-ও স্তোকবাক্যের সামিল হয়েছে।

বিপ্লবীদের প্রত্যেকটি দল ও উপদলে এই বিদ্রোহ-ভাব কিছু কিছু দানা বেঁধে উঠছিল। দ্বিতীয় স্তরের নেতৃবৃন্দ প্রত্যেক দল থেকেই কিছু ছেলে খসিয়ে এনে বাংলাদেশে 'নতুন দল' গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন। এঁরা 'Alternative Leadership'-এর কথাও বলতেন।—নেতারা এই দলের নাম দিয়েছিলেন 'Revolting Group'!

এই **রিভোল্টিং গ্রুপের** মধ্যে প্রধানত এসেছিলেন অনুশীলন সমিতির সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন, প্রতুল ভট্টাচায, সৌরভ ঘোষ, যতীন দাস, বিনয় রায়; চট্টগ্রামের নগেন (জুলু) সেন ও গণেশ ঘোষ; মাদারীপুরের পঞ্চানন চক্রবর্তী, যতীন ভট্টাচার্য, অমলেন্দু দাসগুপ্ত, কালীপদ গুহ-রায়, ফণী মজুমদার; যুগান্তরের (বরিশাল গ্রুপের) রাখাল দাস প্রমুখ। এঁদের একটা কিছু করার প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকলেও এঁদের নিটোল 'সংস্থা' কোনদিনই গড়ে ওঠে নি। সতের দলের সতের রকম লোক নিয়ে আর যা-ই হোক গুপ্ত-সমিতির কাজ হয় না। কাজেই ১৯২৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর মেছুয়াবাজারের আড্ডা সার্চ হবার ফলে সতীশ পাকড়াশী-নিরঞ্জন সেন-পান্নালাল দাসগুপ্ত প্রমুখ ধরা পড়লেন ঐ 'মন্ত্রগুপ্তি' রক্ষায় ত্রুটি ছিল বলেই।—'মেছুয়াবাজার-ষড়যন্ত্র-মামলা'র সঙ্গেসঙ্গে 'রিভোল্টিং গ্রুপে'র একটি 'বিপ্লবীদল-হয়ে-উঠে' কিছু কাজ করার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, ইতিপূর্বে ১৯২৯ সালেই সূর্য সেন কলকাতা এসে গণেশ ঘোষকে চট্টগ্রামে নিয়ে গেলেন। তা ছাড়া তিনি জুলু সেনকেও সতর্ক করে গেলেন

'রিভোল্টিং গ্রুপ' সম্পর্কে। এর কারণ, তাঁরা সংগোপনে প্রস্তুত হতে চাচ্ছিলেন নিজস্ব প্ল্যান মত।

* * * *

'রিভোল্টিং গ্রুপে'র সঙ্গে যোগাযোগ 'বিভি'-রও ছিল। সে সম্পর্ক রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সত্য গুপ্তের ওপর। সম্পর্ক রাখার হেতু ছিল। 'বি-ভি' তখন সশস্ত্র বিপ্লবের কাজে যে-কেহ যে-কোন ভাবে এগিয়ে এলেই নিজের বিপ্লবী-সত্তা অটুট রেখে তার সঙ্গে হাত মেলাতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু মেছুয়াবাজার-ঘটনার পর 'রিভোল্টিং গ্রুপে'র সঙ্গে 'বি-ভি'-র যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হল। সত্য গুপ্ত এ-ফ্রন্ট থেকে সরে এলেন।

* * * *

**যুগান্তর দলের** কিরণ মুখার্জি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন আপোষহীন বিপ্লবী। কিরণবাবু, ভূপেন দত্ত ও সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'ডিরেক্ট-য়্যাক্‌শান'-এর প্রস্তুতিতে লেগে গেলেন ১৯৩০ সালেরই এক সময়ে। তখন স্থির হয়েছিল যে সকলে যথাসম্ভব একত্রিত হয়ে সমগ্র বাংলায় আঘাতের পর আঘাতে ইংরেজ-শাসন বিকল করে দেবেন। চট্টগ্রাম-বিদ্রোহের পব আর বসে থাকা যায় না।

'বি-ভি'র পক্ষ থেকে ভূপেন রক্ষিত-রায়কে যুগান্তর দলের সঙ্গে গোপনকার্যের ব্যাপারে যোগাযোগ রাখার নির্দেশ দেওয়া হল।

এদিকে ভূপেন দত্তের নেতৃত্বে ডাঃ নারায়ণ রায় 'বোমা' তৈরি শুরু করলেন। প্রচুর বোমা তৈয়ের হতে থাকল।...

এখানে উল্লেখ করবো যে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং ও তাঁদের বন্ধুরা "আর্মারি রেইডে"র পর কলকাতায় পালিয়ে এলে কিরণবাবু ও ভূপেন দত্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'বি-ভি' উক্ত পলাতকদের আশ্রয়দানের ব্যাপারে যথাসম্ভব সহযোগিতা করেছে।

'আর্মারি রেইডে'র পরেই একটি যুক্তবৈঠকে যুগান্তর ও 'বি-ভি'দলের প্রতিনিধিদ্বয় স্থির করলেন যে সর্বপ্রথম য়্যাক্‌শান্‌টি এ-যাত্রা তাঁরা একত্রে করবেন —কর্মীও উভয় দল থেকেই আসবেন।...

১৯৩০ সালেরই প্রথম দিকে সুভাষচন্দ্র, সত্যরঞ্জন বক্সি, কিরণশঙ্কর রায় ও সত্য গুপ্ত প্রমুখ নেতারা আলিপুর জেলে বন্দী ছিলেন। জেল্-সুপার ছিলেন

আই-এম-এস অফিসার মিঃ সোম দত্ত। জেলের তথাকথিত নিয়মনিষ্ঠা ভঙ্গ করার জন্যে একদিন সুভাষচন্দ্রকে জেলের কয়েদী-ওয়ার্ডারদের দ্বারা বেদম প্রহার করান হয়। সুভাষচন্দ্র বহুক্ষণ অচৈতন্য অবস্থায় থাকেন। এ দুর্ঘটনায় সেদিন সারা বাংলা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। 'বেণু' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে বেরুল: আমরা বাংলার সেই তারুণ্যশক্তিকে আহ্বান করি, যে-শক্তি গোটা আলিপুর জেল উপড়ে ফেলে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে সরকারের এই অপকর্মের প্রতিবাদ করবে।'··· তখনকার দিনে এ-কথা লিখবাব দুঃসাহস যাঁদের ছিল তাঁরা ফাঁকা আওয়াজ করতেন না। তার প্রমাণ অল্পদিনেই সরকার টের পেয়েছিলেন জেলের বিধাতা 'আই-জি অব্ প্রিজন'-এর নিধনে।

সুভাষচন্দ্রের উপর জেলে এই নির্যাতন বর্ষিত হবার পর 'বি-ভি' ও 'যুগান্তর' স্থিব করল যে, তাদের প্রথম 'টার্গেট' হবেন সোম দত্ত, এবং কাজটি হাসিল করতে যাবেন দু'দল থেকে দু'জন একত্রে।

কর্মী দেওয়া হল সে-ভাবেই। দীর্ঘ এক মাস ধরে প্রত্যহ তরুণদ্বয় অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সোম দত্তের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করেও তাঁকে পাচ্ছেন না। 'বি-ভি'র এ ব্যাপারটা ভাল লাগল না। নিজেদের কর্মীটিকে খুঁটিনাটি অনেক কথা জিজ্ঞেস করে বোঝা গেল যে, দু'টি কর্মী পরস্পবের একেবারেই 'অজ্ঞাত' হওয়াতে তাঁরা পবস্পরের উপর সেই 'প্রত্যয়' রাখতে পারছেন না, যা' এ-ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন। অথচ আমবা জানতাম যে, তাঁরা উভয়েই ছিলেন দুঃসাহসী ও য়্যাক্শানে যাবার জন্যে উন্মুখ। উভয়ের দুঃসাহসিকতা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় তাঁদেব উত্তর বিপ্লবী-জীবনেও নিঃসন্দেহে পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পরস্পর পরস্পরের একেবারে অজানা বলেই তাঁদের মধ্যে স্বভাবতই সে-Understanding হতে পারেনি যা' একত্রে মৃত্যু পর্যন্ত পথ চলতে একান্তই দরকার।···

'বি-ভি' তৎক্ষণাৎ অজানা লোকদের একত্রে এসব য়্যাক্শানে পাঠাবার রীতি নাকচ করা বিধেয় মনে করল। কাজেই আর একটি গোপন যুক্ত-বৈঠকে 'বিভি'র প্রতিনিধি নিবেদন করলেন যে, অতঃপর মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে যে-কাজ করতে হবে তার কর্মী হয়ে যাঁরা যাবেন তাঁদেরকে "নিকটতম বন্ধু" হতে হবে। সুতরাং

কোন্ দল কোন্ কাজ করবেন তা' পরস্পরের জানা থাকলে-ও কাজের সময় যার যার 'য়্যাক্‌শান্' তার তার দায়িত্বে এখন থেকেই ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন।—এ প্রস্তাব গৃহীত হল।...

সোম দত্তকে ( আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ) দণ্ড দানের দায়িত্বে 'বিভি' যে কর্মীকে নিযুক্ত করেছিল তাঁর নাম **বীরেন ঘোষ**। দীর্ঘ একটি মাসের পরিসরে প্রতিমুহূর্তের জন্যে মৃত্যুপথযাত্রীর সার্থক ভূমিকায় অপেক্ষিত থাকা যে কী কঠিন ব্যাপার তা হেসেখেলে বোঝা যায় না। নার্ভ্ যে কতদূর শক্ত হওয়া প্রয়োজন এ-ধারার কর্মীর, তা কর্মী বাছাই কালে বিপ্লবের নেতারা বুঝতেন। বীরেনের অদ্ভুত সাহসের পরিচয় অতঃপর ঢাকায় কয়েকটি বৈপ্লবিক এ্যাক্‌শানে পরিলক্ষিত হয়েছিল।

অতঃপর 'বোমার' কথা। ...ডাক্তার নারায়ণ রায়দের তৈরি বোমগুলো বাংলার সর্বত্র ছড়ান হল। 'বি-ভি' স্থির করল যে হাতেনাতে বোমার শক্তি পরীক্ষা না করে ওগুলো ব্যবহার করা হবে না। কাজেই দু'জন বিশ্বস্ত কর্মীকে পাঠান হল বিনোদ দাসের কাছে ধানবাদের দিকে বোমা পরীক্ষা কবার জন্যে। গভীর রাতে ট্রেন-চলাচলের সময় দু'টি বোমা যথারীতি নিক্ষিপ্ত হল। একটি সামান্য ফাটলেও, অপরটি ফাটল না।

'বি-ভি' কোন ঝুঁকি নিতে রাজী নয়। কর্মীরা যেটুকু কববেন তা' বিশ্বস্ত 'অস্ত্রে'র সাহায্যেই করবেন। 'অস্ত্র' বিশ্বাসঘাতকতা করে কাজ পণ্ড করে দেবে—এ অসহ্য। অতএব 'বোমা' ব্যবহাবের প্ল্যান বাতিল হয়ে গেল। তা' ছাড়া একত্রে অনেক লোকের উপর আক্রমণ চালাতে বোমার ব্যবহার প্রশস্ত হলেও একসঙ্গে দু'-একজনকে ঘায়েল করতে তার প্রয়োজন নেই।...

পরদিন আবার এক গোপন বৈঠকে যুগান্তরের প্রতিনিধিকে জানান হল যে উল্লিখিত কারণে বি-ভি বোমার ব্যবহার করবে না। তার ভরসা শুধুই আগ্নেয়াস্ত্র।...এ বৈঠকে মনোরঞ্জন গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। তিনি সম্প্রতি তাঁর মাদ্রাজের আস্তানা গুটিয়ে কলকাতা চলে এসেছেন বৈপ্লবিক-কর্মের তাগিদে।

দুঃখের বিষয় ইতিপূর্বে ১০ই জুন ভূপেন দত্ত এবং জুলাই মাসে কিরণ মুখার্জি ধরা পড়ে গেছেন। এঁদেরই স্থলে মনোরঞ্জন গুপ্ত যে কর্মদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন

তা পূর্বেই বলা হয়েছে। বস্তুতই সে-যুগে ভূপেন দত্ত, কিরণ মুখার্জি, মনোরঞ্জন গুপ্ত ও সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের মধ্যে বিপ্লবাত্মক কাজের জন্য ব্যাকুলতা লক্ষণীয় ছিল।

বি-ভি অবশ্য তার কাজকর্ম 'লোম্যান-শুটিং'-এর পূর্ব থেকেই নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। যুগান্তরের সঙ্গে ডাইরেক্ট্ য়্যাক্‌শান্ প্রসঙ্গে তার কোন সক্রিয় যোগাযোগ থাকে না। নিজের প্ল্যান নিজের দায়িত্বে ও কর্মক্ষমতায় অল্পবিস্তর প্রত্যেক দলই এ-যুগে কার্যকরী করতে লাগলো।

## দলে কর্মদায়িত্ব কা'র কোথায় ?

১৯৩০ সালেরই শেষের দিকে ব্রিটিশ-শাসন-কাঠামোকে মারণ-আঘাত দেবার জন্য কতগুলো **য়্যাকৃশান স্কোয়াড্** তৈরি করার প্ল্যান স্থির হয়। এই স্কোয়াড্-গুলো পরিচালিত করার ভার পড়েছিল যথাপ্রয়োজনে হরিদাস দত্ত, রসময় শূর, প্রফুল্ল দত্ত, সুপতি রায় ও নিকুঞ্জ সেনের উপর। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এঁদের প্রায় সকলকেই পলাতক হয়ে চলাফেরা করতে হচ্ছিল। বাংলা-প্রাদেশিক-কংগ্রেসের সম্পাদক রূপে হেমচন্দ্র আড়াই বৎসরের কারাদণ্ড নিয়ে ( ২৬. ৮. ৩০ ) জেলে ঢুকবার পূর্বেই এসব ব্যবস্থা তিনি জেনে গেছেন।...

এখানে অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে, হেমচন্দ্রকে ১৯৩১ সালের ১৭ই মার্চ মাত্র সাত মাসের মত কয়েদভোগ করিয়েই হঠাৎ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল! তখনো কিন্তু 'গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট' সম্পন্ন হয় নি, জোর কথাবার্তা চলছে শুধু।...তবে এ-মুক্তির কী কারণ? কারণ আর কিছুই নয়—ইতিমধ্যে পরপর 'লোম্যান-হডসন্ শুটিং' ও 'রাইটার্স বিল্ডিং রেইড' হয়ে গেছে। পুলিশ কাউকে ধরে মামলা দায়ের করতে পারছে না– কোন 'হদিস' করাই তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে! বিনয় বাদল মৃত। দীনেশ আলিপুর জেলে ফাঁসির অপেক্ষায় বন্দী। কিন্তু পুলিশ নানা সন্দেহ করলেও কোন বৈপ্লবিক দলের সঙ্গে তাঁদের সরাসরি যুক্ত করতে পারছে না। তাই হেমচন্দ্রকে ছেড়ে দেওয়া হল, যেমন ইতিপূর্বে সত্য গুপ্তকে-ও ( দক্ষিণ কলিকাতায় ১৪৪ ধারা অমান্য করার অপরাধে দণ্ডিত থাকা কালে ) তাঁর কয়েদকাল সমাপ্ত হবার পর মেদিনীপুর জেল গেটে 'ডেটিনিউ' না করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল একটি ফাঁদ রচনার কূটবুদ্ধি থেকে। পুলিশ ভেবেছিল যে এইসব

বৈপ্লবিক-এ্যাকশানের ষড়যন্ত্রকারীরা হেমবাবুদের গোষ্ঠীভুক্ত হলে নিশ্চয়ই হেম ঘোষ বা সত্য গুপ্ত মুক্ত থাকলে কোন না কোন সময় তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে। তখন এই ষড়যন্ত্রকারীদের নির্মূল করা পুলিশের পক্ষে কষ্টসাধ্য হবে না।...কিন্তু পুলিশের সেই সাধের গুড়ে বালি পড়েছিল।...

হেমচন্দ্র মুক্তি পাবার দু'দিন পরে (অর্থাৎ ১৯৩১ সালের ১৯ শে মার্চ) সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে চলে গেলেন বম্বাই। তাঁরা দেখা করলেন মহাত্মার সঙ্গে। এই সাক্ষাৎকারের আলোচ্যবিষয় ছিল ভগৎসিং-এর ফাঁসি রোধ করার দাবীকে 'গান্ধী-আরউইন-চুক্তি'র অন্তর্ভুক্ত করা।

গান্ধীজি সাগ্রহে সুভাষচন্দ্রকে গ্রহণ করলেন, হেমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় করলেন। তিনি শুনলেন তাঁদের সব যুক্তি। পরে বললেন যে এ-প্রসঙ্গে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন ও করবেন—কিন্তু বৃটিশ মাথা পাতবে না। সুভাষচন্দ্র বললেন—'তবে আপনি সমগ্র চুক্তির প্রস্তাবই আগ্রাহ্য করুন। কী হবে ওদের সঙ্গে আপোষ করে? ওরা ব্যায়নেটের ভাষা ছাড়া কিছু বোঝে না।' গান্ধীজি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এক মত হতে পারলেন না। তবে তাঁকে অনতিবিলম্বে দিল্লী যেতে বললেন, কারণ গান্ধীজি স্বয়ং যাচ্ছেন দিল্লী লর্ড আরউইনের সঙ্গে আর এক দফা আলোচনা করার জন্যে। ...সুভাষচন্দ্র হেম ঘোষ মহাশয় সহ দিল্লী রওনা হয়ে গেলেন। সেখানে বহু চেষ্টা সত্বেও সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসী-হাইকমাণ্ডকে প্রভাবিত করতে পারলেন না। 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি' যে ভগৎসিং-এর ফাঁসি রোধ করতে পারে নি অথবা সহিংস-যোদ্ধাদের বিনাবিচারে বন্ধন-লাভ থেকেও অব্যাহতি দিতে পারে নি সে কথা ইতিহাসখ্যাত।...যাহোক আমরা পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। বাঙলার পুলিশ ব্যর্থ হল। হেমচন্দ্র বা সত্যগুপ্তকে বাইরে রেখে তাদের কোন সুবিধা হলো না। সুতরাং দু'এক মাস দেখে উভয় নেতাকেই পুলিশ 'বেঙ্গল্ অর্ডিনান্সে' বন্দী করে কলকাতার জেল থেকে বক্সাদুর্গের বন্দীবাসে পাঠিয়ে দিল।...

* * * *

এবার **ছাত্র-সংগঠনের** কথা। তৎকালে কলকাতা, মৈমনসিংহ, ঢাকা বা মেদিনীপুরে 'বিভি'-র কতিপয় ছাত্রকে বিশেষ করে উৎসাহিত করা হয়েছিল ছাত্র-আন্দোলনে যুক্ত হবার জন্যে। কারণ 'ছাত্র-আন্দোলন' ক্রমশ জীবন্ত হয়ে

উঠেছিল ! দলের একাংশ উহার সঙ্গে জড়িত থাকলে সংগঠনের মাধ্যমে অনেক কর্মীকে বিপ্লবধর্মী করা যায়।...

১৯৩৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত অল্পবিস্তর ছাত্র-আন্দোলন বা ছাত্রদেরকে 'বিপ্লবী'-দলে টেনে আনার কাজে সত্যি যাঁদের নিষ্ঠা প্রচুর ছিল তাঁদের মধ্যে চিত্ত বিশ্বাস ( স্বর্গগত ), শৈলেন নিয়োগী, ক্ষিতি রায়, সুনীল বসু, সমর গুহ ( গোপা ), সুধীন পাল, অমলেন্দু ঘোষ ( মুকুল ), নারায়ণ চ্যাটার্জি, অমল নন্দী, বকুল কর, নির্মল রায় ( মেদিনীপুর ), অসিত ভৌমিক, সুবোধ রক্ষিত, শান্তি ব্যানার্জি, ধীরুভাই, হর্ষ, নির্মলেন্দু দত্ত ( গৌর ), জ্যোতির্ময় ঘোষ, দেবপ্রসাদ গুহ, মাণিক সেন, সতীন সেন ( বগুড়া ) ও শান্তিময় গাঙ্গুলি অন্যতম।—এঁদের কতক ১৯৩০ সালেই দলে এসে গেছেন।...

মেয়েদের মধ্যে সুবালা সেন, উষা সেন, সুবালা রায়, লিলি বসু, প্রতিভা রায়, লীলা সরকার, বেলী বসু, বেলা সেন, মেধা ঘোষ, মায়া রায়, উমা সেন, চাঁপা ( অঞ্জলি ) মুখার্জির নাম করতে হয় ছাত্রীদের মধ্যে কাজকর্ম করার ব্যাপারে।...

* * * *

১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত অন্তরীণ থাকাকালেও ঢাকা শহরে দলের কেন্দ্রটি বাঁচিয়ে রাখার অনেকাংশ কৃতিত্ব মৃত্যুঞ্জয় রায়ের।...

* * * *

১৯৩০ সালে-ই ২৯শে আগস্ট তারিখে 'বি-ভি' সর্বপ্রথম আঘাত হানলো ব্রিটিশ-শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লোম্যান্ ও হডসন্‌কে আক্রমণ করে। এর পর উপর্যুপরি ( ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ) বাংলাদেশে এই 'বি-ভি'র বিপ্লবীরা যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা স্বাক্ষরিত করে গেছেন তা ভীষণ সুন্দর। লোম্যান, সিম্পসন, জেমস্ পেডি, ডগ্‌লাস, বার্জ-এর মৃত্যু এঁরাই ঘটিয়েছেন। এঁদেরই হাতে হডসন, নেলসন, জোন্স, টয়নাম্, ভিলিয়ার্স, জনসন, স্যার জন্ এণ্ডার্সন্ আহত বা আক্রান্ত হয়েছিলেন। এঁদের কর্মীরাই দিনেদুপুরে রাইটার্স বিল্ডিং-এ ঢুকে খণ্ডযুদ্ধ রচনা করেন, মেদিনীপুরে পর পর তিনটি শ্বেত-ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা করেন। এঁদেরই বিনয়-বাদল-দীনেশের বীর বিক্রম স্বচক্ষে দেখে সিভিলিয়ান প্রেস-অফিসার টাফ্‌নেল ব্যারেট বিহ্বলকণ্ঠে তৎকালে বলেছিলেন : **'My tongue stuck to the roof !'**...

'বি-ভি'র সেল্-সিস্টেমে **সংগঠন-নীতি** অনেকটা নিখুঁত হওয়াতেই বছরের পর বছর ইংরেজের শাসন-সংস্থাকে কঠোরতম আঘাত দিতে গিয়ে প্রচুর প্রত্যাঘাত পেয়েও সে ভেঙে যায় নি। এক হাতে বিষ এবং অপর হাতে রিভল্‌বার নিয়ে কর্মপ্রবুদ্ধ হওয়া এ-দলের অনুসৃত টেক্‌নিক। ফিরবার পথ না রেখে এগিয়ে যাবার সঙ্কেত কর্মীদের আয়ত্ত হয়েছিল বলেই তাঁরা ফিরে আসার কথা ভুলে গিয়ে কর্মের তাগিদে নিঃশেষে প্রাণ দেবার জন্যে ছুটে যেতেন।...

*　　　*　　　*　　　*

বিপ্লবীদের **সময়-জ্ঞান** সম্পর্কে একটু ধারণা করার জন্যে একটি প্রসঙ্গের এখানে উল্লেখ করব।...ঢাকা শহরের পল্টনের মাঠ। এখানে সাধারণত বিপ্লবী-নেতারা তৎকালে রাতের অন্ধকারে দলের ছেলেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। দীনেশ গুপ্ত তিনটি ছেলেকে রাত ৩ টার সময় পল্টনে ( যেখানে 'চানমারি' হয় সেখানে ) আসতে বলেছেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে। তাঁদের নাম সুনীল বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও জিতেন চক্রবর্তী।—সুনীল ও কালীপ্রসন্ন পৌনে তিনটায় 'চানমারি'র মাঠে এসে গেছেন। কালীপ্রসন্ন বললেন যে জিতেন চক্রবর্তীকে নাকি পথে পুলিশ চ্যালেঞ্জ করে সদুত্তর না পেয়ে থানায় নিয়ে গেছে!—দীনেশ গুপ্ত তখনো আসেন নি। তিনটা প্রায় বাজে এমন সময় দেখা গেল নিঝুম রাতে কে যেন একজন তাঁদের দিকে দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে। কাছে এলে বোঝা গেল আগন্তুক তাঁদেরই 'দীনেশদা'!...কী ব্যাপার? দীনেশ কথা বলতে পারছেন না। ভীষণ হাঁপাচ্ছেন। প্রায় মিনিট খানেকের চেষ্টায় দম সংযত করতে পারলেন। তারপর শোনা গেল যে বেরুবার সময় দীনেশ দেখতে পেলেন যে তাঁর সাইকেলের টায়ার্ ফুটো হয়ে গেছে—হাওয়া নেই! সর্বনাশ! হাতে মাত্রও সময় নেই—অথচ কাঁটায় কাঁটায় ঠিক মত মাঠে পৌছতে হবে! ছেলেদের কাছে কথার ব্যতিক্রম মানে 'বিপ্লবী'র মৃত্যু। কিন্তু এত রাতে টায়ার্ সারাই করা চলবে না। কি করা যায়? নিরুপায় দীনেশ তখন বাড়ি থেকে 'ডাবল্-মার্চ' করে ছুটে চললেন। তাঁর বাসা থেকে 'চানমারি'র মাঠ অন্তত দেড় মাইলের পথ। হাতঘড়ি ঘন ঘন দেখছেন দীনেশ। আর সময় নেই। কাঁটায়-কাঁটায় তাঁকে পৌছতেই হবে—সৈনিক-জীবনের এ শিক্ষা। অপেক্ষ্যমান বন্ধুদের কাছে 'বিপ্লবী' সময়ের খেলাপ

করতে পারেন না। এবার 'ডাবল্-মার্চ' নয়, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়! দৌড়াতে দৌড়াতে পৌঁছলেন এসে দীনেশ যথাস্থানে। তখন তাঁর সবটুকু দম ফুরিয়ে গেছে—কিন্তু ঘড়ির কাঁটা তিনটার ঘরে পৌঁছয় নি!...

*          *          *          *

চিকিৎসক ও আইনজীবী বন্ধুর প্রয়োজন বিপ্লবীদের কম ছিল না। অসুস্থ পলাতকদের জন্যে **চিকিৎসকের** সাহায্য তো চাই-ই; তা' ছাড়া আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটলে-ও হাসপাতালে যাওয়া অথবা বাইরের ডাক্তার ডাকা সম্ভব ছিল না। গোপনে অস্ত্র-শিক্ষার কালে কিংবা বোমা তৈরির সময় মাঝে মাঝে কর্মীরা জখম হতেন, তখন বিশ্বস্ত বন্ধু-ডাক্তারের সাহায্য না নিলে পুলিশের হাতে পড়ার সম্ভাবনা থাকতো ষোল আনা। এসব ডাক্তাররা পরোক্ষভাবে বৈপ্লবিক-প্রতিষ্ঠানের কর্মসহায়ক ছিলেন, বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ বন্ধু রূপে বিপদের সম্মুখীন হতেন। এঁদের অবদান অতুলনীয়। ...'বিভি'-র সুহৃদ ও পৃষ্ঠপোষক ডাক্তারদের অন্যতম ছিলেন প্রফুল্ল দত্তের দাদা সত্যেন্দ্রকুমার দত্ত। 'বি-ভি'র সতীর্থ ডাক্তারদের মধ্যে দুর্গাদাস ব্যানার্জি, সুরেন বর্দ্ধন, প্রভাস ঘোষ, প্রকাশ দত্ত, অরুণ নন্দী, অনিমেষ রায়, জিতেন সেন প্রমুখের নাম উল্লেখ করা হল।...

**আইনজীবী**-বন্ধুদের মধ্যে খগেন কর, চিন্তাহরণ রায়, বিনয় সেন, পরেশ সাহা প্রমুখের কথা মনে পড়ে। এই বন্ধুরা পার্টির সদস্যের মতই সনিষ্ঠায় আইন-আদালতের ব্যাপারে 'বি-ভি'কে দক্ষ উকিল বা য়্যাড্‌ভোকেটের মর্য্যাদায় সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতেন।

*          *          *          *

এ-দলের **শহিদদের** নাম করব। তাঁরা হলেন **বিনয়কৃষ্ণ বসু, বাদল** ( সুধীর ) **গুপ্ত, দীনেশচন্দ্র গুপ্ত, নৃপেন দত্ত, বীরেন রায়-চৌধুরী, প্রদ্যোত ভট্টাচার্য, অনাথ পাঞ্জা, মৃগেন দত্ত, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নির্মলজীবন ঘোষ, নবজীবন ঘোষ, মতি মল্লিক, সন্তোষ বেরা, ভবানী ভট্টাচার্য, হৃষীকেশ সাহা, অসিত ভট্টাচার্য, প্রবোধ মজুমদার, জ্যোতির্ময় ভৌমিক, শচীন কর, গোপাল সেন** ( ছোট ), **অমলেন্দু ঘোষ** ( খোকন )।...

*          *          *          *

'বি-ভি'র কর্মনৈপুণ্য ও নিখুঁত সংঘ-শক্তির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথমেই স্বীকার করতে হয় দলীয় কর্মীদের **মন্ত্রগুপ্তি-শিক্ষার** ও **সাংগঠনিক টেক্‌নিকের বৈশিষ্ট্য।**

মন্ত্রগুপ্তি-শিক্ষার পরিচয় পাই আমরা সন্তোষ বেরা ও ফণী দাসের মধ্যে কী অসম্ভব সৌন্দর্যে। অনিল দাসেরই মত সন্তোষ বেরাকেও মেদিনীপুরে শয়তানের হিংস্রতায় পুলিশ মারতে মারতে মেরেই ফেলেছিল। ফণী দাসের উপর মারপিট ও লাথি গুঁতো বীর বিক্রমে চালিয়ে সহসা অজ্ঞান ফণীকে মৃত ঠাউরে পুলিশ হাত গুটিয়ে নিয়েছিল! তরুণ বীর নবজীবন এই অত্যাচারেরই বলি।

তাছাড়া প্রদ্যোত, ব্রজকিশোব, রামকৃষ্ণ ও নির্মলজীবনের উপরই কি দস্যুর মত অত্যাচার করে নি পুলিশ? কিন্তু 'বি-ভি'র মন্ত্রগুপ্তি-শিক্ষার চবম পরিচয় দান করে এঁরা 'শহিদ' হয়ে গেছেন দিব্য সৌন্দর্যে।...শান্তি সেন, কামাখ্যা ঘোষ, সনাতন রায়, সুকুমার সেন, নন্দদুলাল সিংহের উপর অত্যাচারও কম হয় নি। কিন্তু 'বি-ভি'র মন্ত্রগুপ্তি-বোধ এ-সব কর্মীদের ক্ষেত্রেও অক্ষুণ্ণ ছিল। এঁরা সবাই দ্বীপান্তরিত হয়েছিলেন আন্দামানে।...

১৯৩৩ সালে যাঁবা সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কুরিগ্রামের (রঙ্‌পুর) কুমুদ মুখার্জি (স্বর্গগত), রাজমোহন করঞ্জাই ও নরেন দাস এবং মেদিনীপুরের ভূপাল পাণ্ডা ও বিমল দাসগুপ্ত অন্যতম।...এরপর অবশ্য ১৯৩৪ সালে দার্জিলিং-গভর্ণর-শুটিং মামলায় সুকুমার ঘোষ, মধু ব্যানার্জি, রবি ব্যানার্জি, মনোরঞ্জন ব্যানার্জি ও সুশীলকে আন্দামান পাঠান হয়।...মৈমনসিংহের চিত্তবিশ্বাস পূর্ব থেকেই আন্দামানে ছিলেন।...

পাঁচ বৎসর ধরে ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিকরূপে বাংলার নানা জিলায় সাফল্যের সহিত বহু 'য়্যাক্‌শান্‌' সমাপিত করে যাওয়ার এবং সর্বগ্রাসী পুলিশী-নির্যাতন সত্ত্বেও দলের কাঠামো শক্ত রাখার নজির বিপ্লবের ইতিহাসে 'বি-ভি' রেখে গেছে। ১৯৩৪ সালের 'এ্যাণ্ডার্সন্‌ শুটিং'-এর পরও 'বি-ভি' বা অন্যান্য কিছু বিপ্লবীদলের কার্যকলাপ থামতো না। কিন্তু সশস্ত্রবিপ্লবে বিমুখ বিহ্বল মহাত্মা গান্ধী বনাম কংগ্রেস, জাতীয়তাবাদী কাগজগুলো এবং দেশের গণ্যমান্য অনেক ব্যক্তি তৎকালে

দেশোদ্ধারের কর্ম মুলতুবী রেখে সরকারের চেয়েও বড় গলায় জনমত বিগড়ে দেবার চেষ্টায় নেমে পড়লেন। তাঁরা একটা শস্তা পথের আশ্রয়ে দু'দিক রক্ষা করে চললেন। তাঁরা বিপ্লবীদের সাহসের প্রশংসা করে, তীব্রতর কণ্ঠে নিন্দা করতেন বিপ্লবীদের কর্মপথের। তাই 'বি-ভি' বা যেকোন বিপ্লবীদলকেই কিছুকালের জন্যে অস্ত্র সম্বরণ কবতে হল।...

## ব্রিটিশ প্রেস্টিজ্ আহত

বিপ্লবকর্মের অবসান আপাতত হলেও 'ব্রিটিশ প্রেস্টিজ্' বিচূর্ণ হয়ে গেছে।... ইংরেজের রাষ্ট্রিক-মেরুদণ্ড তখন ক্ষতবিক্ষত। দেবতার পৌরুষ নিয়ে যে জাত ভারতবাসীকে গোলাম করে রেখেছিল, তার ভয়ার্ত রূপ ভারতবাসী স্বচক্ষে দেখে ফেলেছে।...

চট্টগ্রাম-বিদ্রোহীদেব দুর্বাব বিদ্রোহে ভীত ইংরেজ কিছুটা আত্মস্থ হতেই বাংলার সর্বত্র সকল বিদ্রোহীদলই অস্ত্র-ঝনঝনায় ইংরেজের চোখে আতঙ্কের ছায়া ফেলে দিল। 'লোম্যান্-হডসন শুটিং' থেকে শুরু করে 'বাইটার্স-রেইড', স্টিভেন্স-পেডি-গার্লিক-ডগলাস-ক্যামারণ-এলিসন হত্যা এবং টেগার্ট-ভিলিয়ার্স-নেলসন-ক্যাসেল্স-ডুর্নো-জনসন-টয়নাম-লিউক-গ্রাস্বি-ওয়াটসন ও স্টানলি জ্যাক্সন হত্যা-চেষ্টার দাপটে ইংরেজের বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল। তাই নিরুপায় ব্রিটিশরাজ অবশেষে আইরিশ বিদ্রোহ-শায়েস্তাকারী, 'ব্ল্যাক-এণ্ড-ট্যান' নীতির আবিষ্কর্তা স্যার্ জন এণ্ডার্সনকে বাংলার গভর্নব করে এনে মান রক্ষার চেষ্টা করলেন।...সেই কালে সারা বঙ্গদেশ কার্যত সামরিক-শাসনের অঙ্গীভূত। সেই শাসনের কঠোর চাপে মেদিনীপুর, ঢাকা ও চট্টগ্রাম হাঁপাতে লাগল।...কিন্তু এণ্ডার্সন সাহেব যত বড় দাম্ভিক ও দুর্দান্ত লাটই হোন না কেন, তাঁরই আমলে যখন মেদিনীপুর শহরেই আবার একটি শ্বেত ম্যাজিস্ট্রেট নিপাত হয়ে গেলেন, নারায়ণগঞ্জের দেওভোগ-গ্রামে একটি হোমগার্ড নিহত হলো এবং পরিশেষে তাঁকেই (স্বয়ং গভর্নরকে) তাক্ করে বিপ্লবীর রিভল্বার গর্জে উঠলো—তখন তাঁর দম্ভের ফানুস ফুটো হয়ে গিয়েছিল বই কি।...

## পাবনার বিপ্লবী সংঘ

পাবনার হিমায়েৎপুরে ছোটখাটো একটি নিটোল বিপ্লবী-প্রতিষ্ঠান ছিল। তার নেতা ছিলেন **দ্বিজেন দাস**। দ্বিজেনবাবুরই সহযোগী ছিলেন সুরেন সরকার। দ্বিজেনবাবু ও সুরেনবাবু দেউলি জেলে অবস্থানকালে ( ১৯৩২-'৩৭ ) 'বি-ভি'র নেতাদের সংস্পর্শে এসে বিশেষ প্রীত হন এবং নিজেদের দল 'বি-ভি'র

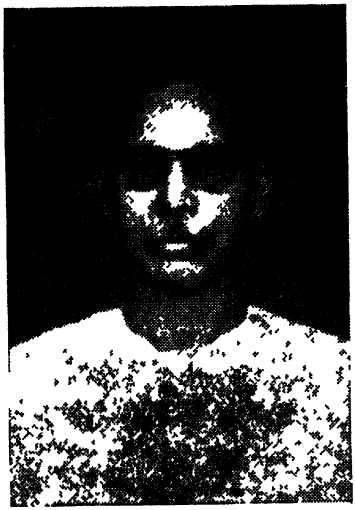

দ্বিজেন দাস

সঙ্গে বিনা দ্বিধায় সম্মিলিত করেন। অতঃপর জেলে এবং জেল থেকে বেরিয়ে এসে কর্মক্ষেত্রে দ্বিজেনবাবু, সুরেনবাবু ও নরেন সরকার তাঁদের বন্ধুবান্ধব সহ 'বি-ভি'র একাত্ম রূপেই কাজ করেন। পাবনার বন্ধুরা নিয়মানুবর্তিতায় ও মন্ত্রগুপ্তি-রক্ষণে এবং বৈপ্লবিক-চেতনায় 'বি-ভি'র শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন।...

## ললিত বর্মণ ও কুমিল্লা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে কুমিল্লার **ললিত বর্মণ** পরিচিত। ললিতবাবু ১৯২৩ সালের মাঝামাঝি রেবতী বর্মণের মাধ্যমে হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর দলের কর্মাদর্শে নূতন প্রেরণা লাভ করেন। পরে উক্ত দলের বিশ্বস্ত সভ্যপদ গ্রহণ করেন। ললিতবাবু কংগ্রেস-আন্দোলনে বিশেষ জড়িত

হয়ে পড়ায় কুমিল্লায় গুপ্তসমিতি গড়ে তোলার কাজে অসুবিধা বোধ করছিলেন। কাজেই এক সময় হেমচন্দ্রের কাছে তিনি একজন সংগঠক চাইলেন। ললিতবাবুর হেডকোয়ার্টার ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। সেখানে নিকুঞ্জ সেনকে পাঠান হল ললিতবাবুর সাহয্যার্থে। নিকুঞ্জ সেন তৎকালে এম-এ ক্লাসে ভর্তি হবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। পরীক্ষায় তাঁর কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হবার সম্ভাবনা ষোল আনা। কিন্তু দলের ইচ্ছা ব্যক্ত হতেই নিকুঞ্জ সেন অম্লান বদনে পড়াশুনা ছেড়ে চলে গেলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া। কিছুকাল সেখানে কাজ করার পর নিকুঞ্জ সেনের ডাক এলো 'বানরী' যাবার জন্যে। বানরীগ্রামের (ঢাকা, বিক্রমপুর) কেন্দ্র থেকেই উত্তরকালে বাদল (সুধীর) গুপ্ত, মধু ব্যানার্জি প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী কর্মীদের আমরা বিপ্লব-ক্ষেত্রে দেখতে পাই। —নিকুঞ্জ সেনের হাতেগড়া কর্মী এঁরা সকলেই।

ললিত বর্মণ

নিকুঞ্জ সেন চলে এলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সুনীল সেনগুপ্তকে (পরে 'বেণু'র সম্পাদক) পাঠান হয়। এঁরা দু'জনে মোটামুটিভাবে ললিতবাবুর গুপ্তসমিতির কাঠামোটি গড়ে দিয়ে আসেন। ললিতবাবু ও তাঁর বন্ধুগণ হেমবাবুর দলের একাঙ্গ হয়েই কুমিল্লায় যে-বিপ্লবচেষ্টা শুরু করেছিলেন তার অপূর্ব পরিস্ফুরণ ভবিষ্যতে ঘটেছিল ম্যাজিস্ট্রেট হত্যায়। সুনীতি চৌধুরী ও শান্তি ঘোষের অবিচলিত হস্তে এই শ্বেত-সাম্রাজ্যবাদের শ্বেত-প্রতীক নিধন ভারতবর্ষকে বিস্মিত করে দিল। এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ যথাস্থানে দেওয়া হবে।…

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বীরেন ভট্টাচার ও কামাখ্যা চক্রবর্তী (ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে তৎকালে পাঠরত-ছাত্র) ললিতবাবুর বিশ্বস্ত কর্মীরূপে ১৯২৬ সাল থেকে ঢাকার নতুন বন্ধুদের সঙ্গে ব্রাহ্মণবাড়িয়া তথা কুমিল্লার যোগাযোগ রক্ষা করতেন।…

## আশ্রয়স্থল বা শেল্টার

যেকোন বিপ্লবীদলের একটি প্রধানতম শক্তিউৎস হলো পলাতকদের জন্যে সংরক্ষিত প্রচুর আশ্রয়স্থল বা শেল্টার। **সুরেশচন্দ্র মজুমদার** (উজ্জ্বলা মজুমদারের পিতা) মহাশয়ের উপর শেল্টার-সংগ্রহের গুরু-দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিল 'বি-ভি' পার্টি। এ কাজে হরিদাস দত্ত ও রসময় শূরের সর্বপ্রধান 'রিসোর্স্ফুল' সহায়কই ছিলেন সুরেশচন্দ্র। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের প্রধান দায় ছিল হরিদাসবাবুর। সে-ক্ষেত্রেও গৃহী সুরেশচন্দ্রের সাহায্য সামান্য ছিল না। উত্তরকালে এসব সক্রিয় সাহাযাদানের জন্যে সুরেশবাবু ও তাঁর পরিবার পুলিশের অশেষ নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। আর্থিক ক্ষতির তো কথাই নেই।

এ ছাড়া রাজেন গুহ, সত্য ঘোষ, নির্মলা বসু (স্বর্গগতা), তাঁর স্বামী উপেন বসু এবং কৃষ্ণকালী বসুর কাছেও শেল্টার দানের জন্যে 'বি-ভি' সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

একটি বিশেষ ব্যক্তি, যার সহায়তার তুলনা বিরল—তাঁর নাম এখানে করব। তিনি হলেন ঢাকা জগন্নাথ কলেজের কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক **মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়**। তিনি দলের লোক নন, অথচ বিনয়ের ঢাকা থেকে পলায়নকালে সুপতি রায়কে মেসের অধিকর্তা রূপে যে ঝুঁকি নিয়ে তিনি সাহায্য দান করেছিলেন তা' অদ্ভুত, তা' অপূর্ব।...

শহরে-শহরে বা গ্রামে-গ্রামান্তরে পলাতক অবস্থায় 'বি-ভি'র কর্মীরা বহু আশ্রয়স্থলের স্মরণীয় অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। শহরে বা পল্লী অঞ্চলের নিভৃতে একাধিক শিক্ষিতা-অশিক্ষিতা নির্বিশেষে মা-বোনেরা আশ্রয় ও পরিচর্যা দান করে যে মমতা, সাহস ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তা' স্মরণ করে আজও অভিভূত হতে হয়। কিন্তু গ্রন্থের এই সংকীর্ণ পরিসরে তাঁদের কর্মকথা বিবৃত করার সুযোগ নেই। তবে দু'একটি ঘটনা উল্লেখ করে বিপ্লবীদের সম্পদরূপ এসব তীর্থক্ষেত্রের কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।...

* * * *

'তাজপুর' **সরকারবাড়ি**। ঢাকা বিক্রমপুরের একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামের এক নামী পরিবারের মস্ত গৃহ। বিরাট পরিবার। অনেকগুলো হিস্যা। এই সরকার-পরিবার অর্থে, সাংস্কৃতিক-পরিচ্ছন্নতায়, সৌজন্যে ও রাজনীতিক-চৈতন্যে

সমৃদ্ধ ছিল। গান্ধীজির নানা আন্দোলনে এ-বাড়ির মেয়েপুরুষের অবদান সে অঞ্চলে সর্বজনবিদিত। ওদেরই নিবারণ সরকার কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতা। বাড়ির তরুণদের অনেকে অবশ্য অহিংসার পথে পা না-বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বিপ্লবের কর্মযজ্ঞে।....

এ-বাড়ির ইন্দু সরকার ও শান্তি সরকার দু'টি ভাই। ইন্দু বেণু-আপিসের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। শান্তি দেশের বাড়িতে থেকেই 'বি-ভি'ব কাজকর্ম করেন। তাঁদের মা আইন-অমান্য-আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন। কিন্তু ছেলেদের টানে তিনি 'বি-ভি'র ছেলেদের সংস্পর্শে আসেন এবং সহজেই তাঁদের স্নেহময়ী জননীর স্থান গ্রহণ করেন। ছেলেরা প্রথমাবধি কারণে-অকারণে তাঁর কাছে যেত দুঃসাহসিনী মায়ের একটু স্নেহ ও প্রশ্রয় পাবার লোভে। তাবপর প্রয়োজনে পলাতকদের আশ্রয়দানের দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করলেন।...একদিন 'বি-ভি'র একটি পলাতক বিপ্লবী তাঁর গৃহে আশ্রয় নিয়েছেন। পলাতককে আড়াল করে রেখেছেন তিনি একটি আলাদা ঘবে। ঘরের দরজা সব সময়েই ভেজান থাকতো। মা ও ছোট ছেলে শান্তি সর্বদা পলাতকের খোঁজখবর কবেন। হঠাৎ একদিন বাড়িতে এক 'জামাই' এসেছেন—একটু দূর-সম্পর্কের জামাই। জামাইটি আই-বি আফিসের ফটোগ্রাফার। মা এসে পলাতককে বলে গেলেন যে—অমুক 'জামাই' এসেছেন, পলাতক যেন ঘর থেকে না বের হন।···কিন্তু এমনই অদৃষ্ট, কোন্ এক ফাঁকে জামাইবাবু 'ঘুরঘুব' ক'রে পলাতকের ঘরের কাছে এসেই ভেজান দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করেছেন। মা'ব সতর্কতার অবধি ছিল না। তিনি দূর থেকে দেখেই ত্বরিৎপদে ছুটে এসে ঘরে ঢুকলেন। জামাই সবিস্ময়ে একটু সন্দেহের সুরে প্রশ্ন করলেন: 'এ কে ?'···

মা অতি সহজে বললেন: 'আরে, ও তো আমাদের নতুন মাস্টার! তোমায় বলি নি বুঝি ?'—এবং পলাতকের দিকে তাকিয়ে একই সুরে বললেন: 'এটি বাবা আমাদের বাড়ির জামাই। পুলিশে কাজ করে।'—

পলাতক বিগলিতভাবে জামাইকে নমস্কার করলেন হাত দু'খানা তুলে। —জামাই তাঁর সঠিক পরিচয় ব্যক্ত হওয়ায় যেন অস্বস্তি বোধ করলেন এবং কোন প্রকারে একটি প্রতিনমস্কার জানিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।···তখনকার দিনে সামাজিক অবস্থা এমনই হয়েছিল যে, কেউ নিজেকে ভদ্রসমাজে পুলিশের

লোক বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হতেন। কারণ, লোকেরা পুলিশকে ঘৃণা করত।...

ইন্দু ও শান্তির জননী এসব পলাতকদের আপন সন্তানের স্থানে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাছে তাই পুলিশদলের লোক 'জামাই' হলেও পর। কাজেই এ মহিলার প্রত্যুৎপন্নমতিই শুধু নয়, এ-ক্ষেত্রে তাঁর পলাতক-সন্তানপ্রতিমকে নিজেদের জামাতার শ্যেন-দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখার যে ব্যাকুলতা সেদিন প্রকাশ পেয়েছিল, তা' লক্ষ্য করাব মত।...

* * * *

বিক্রমপুরের আর একটি গ্রাম 'রাইজদিয়া'। দলের ছেলে মণি চ্যাটার্জিদের এই বাড়ি। 'বি-ভি'র একটি চমৎকার আশ্রয়স্থল। মণির বাবা এককালে ছিলেন পুলিশেব দারোগা। এখন তিনি স্বর্গগত। দারোগাব বাড়ি বলেই মণিদের গৃহ পুলিশের কুনজরে পড়ে নি। মণির দাদা যতীন চ্যাটার্জি সুদূর সেকেন্দ্রাবাদে রেলওয়েতে চাকুরি করতেন। তাঁর স্ত্রী **কনকরেণু চ্যাটার্জি** শাশুড়ীর কাছেই রাইজদিয়ার বাড়িতে থাকেন। মণিব মা ছিলেন প্রৌঢ়া বিধবা। খুব ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা। তাব নাম ছিল **প্রিয়তমা দেবী**। মা ও কিশোরী পুত্রবধূ 'বি-ভি'র বিপ্লবীদেব মা ও বোনেব স্থান এমন অনায়াসে গ্রহণ করেছিলেন যে, তাতে ফাঁক ছিল না এতটুকুও। এই গৃহটি শুধু পলাতকদের আশ্রয়স্থলই নয়, অস্ত্রাদি রাখার গোপন আস্তানারূপেও ব্যবহৃত হত।...

...১৯৩৪ সালেব ঘটনা। 'বি-ভি'র একটি কর্মী কোন এক দুঃসাহসী এ্যাকশান্-ফেবৎ আহত ও অসুস্থ অবস্থায় এসে প্রিয়তমা দেবীর আশ্রয়স্থলে স্থান নিয়েছেন। তাকে একটি ঘরে রেখে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু মা ও পুত্রবধূ প্রয়োজনে তালা খুলে ঘরে ঢুকতেন। ছেলে মণিকে বাড়ি পাহারা দেওয়া এবং দলের সঙ্গে পলাতকের যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে বিশেষ সর্তক থাকতে হতো।...

কিশোরী বধূ ঐ কনকরেণু কি অদ্ভুত শুশ্রূষাই না করলেন রুগ্ন পলাতকের! মাতা ও পুত্রবধূ মিলেমিশে অসুস্থ বিদ্রোহীকে অল্পদিনেই সারিয়ে তুললেন। দূর হয়েছে জ্বর এবং লাঙস্-এর বেদনা, শুকিয়ে গেছে কপালের ক্ষত, কেটে গেছে

অনেকটা গ্লানি। কিন্তু কাসিটা কমচে না। ঘরে বসে খুক্‌খুক্ করে কাসেন। পলাতক এবং আশ্রয়দাতা—এতে উভয়েরই অসুবিধা হবার কথা।...

একদিন পাশের ঘরের দাওয়ায় গ্রাম্যমহিলাদের আড্ডা বসেছে দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর। প্রিয়তমা দেবী সবাইকে নিয়ে গল্প করছেন। বধূ কনকরেণু ঘরে বসে পান সাজছেন। পলাতক তালাবদ্ধ হয়ে আছেন পাশের কামরায়।...তৈরি-পান নিয়ে কনকরেণু বাইরে আসতেই মহিলাদের একজন বললেন: 'কে কাসে গো?'

বধূ ঘোমটার ফাঁক থেকেই ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি নিজেই কাসছেন। ...প্রিয়তমা দেবীও অম্লান বদনে বধূমাতাকে সায় দিলেন।...

প্রশ্নকর্ত্রী মহিলাটি আবার পাড়ার "গেজেট'। একটু হেসে শাশুড়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন: "লালবাড়িব খবর জান তো?"..

কেউ আর এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলেন না।...লালবাড়ি ও-গাঁয়েরই একটি ছাড়া-বাড়ির মত গৃহ। অল্প কিছুদিন হয় 'অনুশীলন সমিতি'র একটি পলাতক কর্মীকে ওখান থেকে খুঁজেপেতে পুলিশ ধবে নিয়ে গেছে।...

গ্রামের মহিলাদের ছোট্ট আসরের সামান্য এই ঘটনাকে ঘিরে যে আলোচনা বিবৃত হল তা' থেকে অনুমান করা কি সহজ নয় যে, কি স্বাভাবিক দায়িত্বেই না সেকালের গ্রাম্য-সমাজ বিপ্লবীদেব লালনপালনেব ভার গ্রহণ করেছিল? প্রিয়তমা দেবী বা ইন্দুর মা'র মত সবাই হয়তো এই দুবন্তদেরকে জেনেশুনে বুকে টেনে নেবার সাহস পান নি, কিন্তু 'প্রিয়তমা' দেবীদেব মত বহু মাতা ও গৃহিণীকে তাঁরা অবকাশ দিয়েছেন দুরন্তদেব লালনে।..

*　　　*　　　*　　　*

অপর একটি আশ্রয়স্থলের উল্লেখ করবো। সেটি হল ঢাকাশহরে গেণ্ডারিয়া অঞ্চলের **'সরকার-বাড়ি'**। প্রখ্যাত অধ্যাপক স্বর্গগত সতীশচন্দ্র সবকার এক কালে শুধু কৃতী শিক্ষকরূপে নয়, 'মানুষ' রূপেও সকলের শ্রদ্ধেয় ছিলেন। ত্যাগ, সংযম এবং অপূর্ব দেশপ্রেমে সুন্দর এই পুরুষটির গৃহ একটি বিপ্লবী-কর্মী লালনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। তাঁর পুত্র হরিশ সরকার ও শচীশ সরকার থেকে শুরু করে বাড়ির সবগুলো ছেলেই বিপ্লবীদলের কর্মী হয়ে উঠেছিলেন। কারাবরণে এবং দুঃখ, নির্য্যাতন ও দারিদ্র্য গ্রহণে এই পরিবারটির স্থান অসামান্য।

পলাতকদের আশ্রয়দানে, কর্মীদের সময়ে-অসময়ে আহার দানে এবং নানাবিধ সহায়তা দানে সরকার-পরিবারের রেকর্ড একটি শ্লাঘার বস্তু।...

*  *  *  *

এ প্রসঙ্গে আরো দু'জন মহিলার নামোল্লেখ না করলে আমাদের প্রত্যবায় হবে। তাঁদের নাম স্বর্গগতা হেমলতা দেবী ও স্বর্গগতা নগেন্দ্রবালা দেবী।

**হেমলতা দেবী** হেমচন্দ্র ঘোষ থেকে শুরু করে তাঁদের দলের কনিষ্ঠতম কর্মীরও জননীর স্থান গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গৃহের দ্বার তাঁদের সবার জন্যেই খোলা থাকতো। শুধু পলাতকদের আশ্রয়দান নয়—কারণে-অকারণে ঐ গৃহে, ঐ জননীর আশীর্বাদ সংগ্রহের জন্যে সকলে যাতায়াত করতেন। তাঁর স্নেহ, আপ্যায়ন, অকাতর সাহায্যদান ও নিভাক ব্যক্তিত্ব 'বি-ভি'র কর্মীদের ভুলে যাবার বস্তু নয়। হেমলতা দেবীকে শুধু ভূপেন রক্ষিত-রায়ের জননী বললে ঠিক বলা হয় না, আদপে তিনি ছিলেন হেমচন্দ্রের বিপ্লবীদলের শুভানুধ্যায়ী জননী।...

**নগেন্দ্রবালা দেবীর** পরিচয়ও কেবল যতীশ গুহর জননীর পরিচয়ে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁকেও জানতেন বন্ধুরা এই বিপ্লবীসংস্থারই জননী রূপে। তাঁর গৃহ-ও অবারিত ছিল দলের কর্মীদের জন্যে। পরম মমতায় তিনি বিপ্লবীদের লালন করে গেছেন, রক্ষা করে গেছেন কত আপদে ও বিপদে।...

## ৭নং ওয়ালিউল্লা লেন

৭ নং ওয়ালিউল্লা লেনের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে উহা 'বি-ভি'র একটি প্রধান আশ্রয়কেন্দ্র ছিল। কিন্তু শুধু 'আশ্রয়কেন্দ্র বললে উক্ত বাড়ির কথা কিছুই বলা হল না। ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩৩ সালের শেষ পর্যন্ত বি-ভি'র গুপ্তকর্মের গুরুত্বপূর্ণ কর্মস্থান ছিল ওখানেই। ঐ আড্ডায় প্রধান প্রধান পলাতক কর্মী ও নেতারা যাতায়াত করতেন, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহেব ব্যবস্থা ওখান থেকেই হত। ওখানেই নানা কাজের পরিকল্পনা দানা বাঁধত। **সুরেশচন্দ্র মজুমদারের** ঐ আস্তানা গুপ্তসমিতির কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। এই কেন্দ্রটিতে বিপ্লবীরা তো বটেই, বিপ্লবীদের গুপ্ত কর্মের বিশ্বস্ত বন্ধুরাও গতায়াত করতেন বিবিধ কাজের প্রয়োজনে।...আমরা এখানে একটি কর্মীর কথা আলোচনা করব। সাত নম্বর গৃহের সঙ্গে তার সম্পর্ক এমনই অবিচ্ছিন্ন যে তাকে বাদ দিয়ে এই গৃহ সম্পর্কে কিছুই লেখা চলে না।...

কর্মীটির নাম দোস্ত্ মহম্মদ। দোস্ত্ মহম্মদ এক তরুণ। বাড়ি তার বাংলা দেশে নয়, জাতিতে সে বাঙালী নয়, ধনিক বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত লোকও সে নয়। কিন্তু পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত হবার কামনা কি করে তার চিত্তে জেগেছিল জানা নেই। হয়তো চিত্ত তার স্বভাবতই নির্মল, এবং বুদ্ধি তীক্ষ্ণ থাকায় হৃদয় দিয়ে সবকিছু সে বুঝে ফেলত। কঠিন বস্তু-ও তাব কাছে সহজ হয়ে ধরা দিত। মোটের উপর দোস্ত্ মহম্মদ এটুকু বুঝে ফেলেছিল যে স্বাধীনতা মানুষের জন্মেব অধিকাব।

সুবেশচন্দ্র মজুমদাব

মজঃফরপুব জেলার অধিবাসী তরুণ কৃষক দোস্ত্ মহম্মদ। ১৯২৬ সালের এক অপরাহ্ণে সে কতিপয় গ্রামবাসীব সঙ্গে কলকাতায় আসে রুজিরোজগারের আশায়। কলকাতায় কিছুদিন অবস্থানের পব সে স্থিব কবল যে রিক্সাপুলারের কাজই তার মত কর্মঠ ও শক্তিমান যুবকের পক্ষে উপযুক্ত কাজ। ঘটনাচক্রে ৭ নং ওয়ালিউল্লা লেনে এসে সে উপস্থিত হল সুরেশচন্দ্রেব কাছে। লোকটিকে সুবেশবাবুব ভাল লাগল। সুরেশবাবুকেও দোস্ত্ মহম্মদ পছন্দ কবল। সেদিন থেকেই সে সুবেশচন্দ্রেব ব্যবসায়ে রিক্সাপুলারের কাজে বহাল হল। অল্পকালেব মধ্যেই নিজেব সততা, সুবুদ্ধি ও কর্মনৈপুণ্য দেখিয়ে সে মালিকের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। এমন একটি বিশ্বাসী লোক সুরেশবাবুব জীবনেও বড বেশী আসে নি।

ধর্মভীরু ও সচ্চরিত্র এই বিহারী মুসলমান যুবকটি ধীরে ধীরে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারায় মালিক তাকে সর্দারের পদে উন্নীত করলেন। এবং ক্রমশ মালিকের গোটা রিক্সা-কুলিবাহিনীই সর্দারের ব্যবহারে ও ন্যায়নিষ্ঠায় একটি বাঞ্ছনীয় নেতৃত্বের পরিচয় পেল। সেটা ১৯২৮-'২৯ সাল।...

পূর্বেই বলা হয়েছে যে নিম্নশ্রেণীর মুসলমান অধ্যুষিত ওয়ালিউল্লা অঞ্চলে পুলিশের নজর ছিল-না বলেই বি-ভির গুপ্ত কর্মের প্রধান আড্ডাস্থল ৭ নং বাড়িতে হতে পেরেছিল। ···সাত নম্বরের বিরাট প্রাঙ্গণে গেট দিয়ে ঢুকলেই দুই পার্শ্বে বহু রিক্সার এবং কয়েকটি মোটারের গ্যারেজ দেখা যেত। গ্যারেজগুলো পার হলে মালিকের থাকবার জন্যে ছোট্ট একটি দোতলা গৃহ চোখে পড়তো। ঐ দোতলাটি লতাগুল্মে আচ্ছাদিত এবং উঁচু প্রাচীরে বেষ্টিত। সুতরাং প্রচুর জনসমাবেশের মধ্যেও অন্তরালে অবস্থিত ঐ শ্যামল নিরালা নিকেতন বিপ্লবীদের গুপ্ত-কর্মের স্থান হিসেবে লোভনীয় ছিল।

বি-ভির গোপনতম কার্যকলাপ ( পার্টির সভ্যদেরও অলক্ষ্যে ) কয়েকটি নেতৃস্থানীয় কর্মীর পরিচালনায় সাত নং বাড়িতেই প্রধানত সমাপিত হয়। কিন্তু এ বস্তু কখনই সম্ভব হতো না যদি সুরেশচন্দ্র তাঁর সর্দারকে কার্যত দলভুক্ত করতে অপারগ হতেন। তথাকথিত মূর্খ সর্দার বেশী কিছু বুঝতে চায় নি। সে শুধু বুঝেছিল তার মনিবকে, এবং তার ভাল লেগেছিল মনিবের কাছে সংগোপনে যাঁরা যাতায়াত করেন তাঁদেরকে। তা'ছাড়া কি করে যেন সে উপলব্ধি করেছিল যে তাঁর এবং এই মানুষগুলোর চাওয়া যেন এক। সে তো সত্যি দেশকে ভালবাসে— দেশের শাসন বিদেশীর হাতে থাকা যে মহা পাপ তা অনুভব করেছিল সে নিজের অজান্তে। কাজেই অসাধারণ-পথের যাত্রী এই মানুষগুলোর কার্যকলাপে তার তরুণ রক্তে দোলা লেগেছিল। তাই কি করে যেন অতি সহজে সে এই বিপ্লবীদের বিশ্বস্ত সাথীর স্থান নিয়ে নিল, যেমন দুঃখ-দিনে সম-ব্যথায় ব্যথীরা পরস্পরের পাশে এসে পরস্পর দাঁড়ায়!···

* * * *

একটি ঘটনা বলব। ১৯৩০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর। বর্ষণস্নাত কলকাতার শহর। বিনয় বসু কলকাতায় এসে সাত নম্বরের আস্তানায় উঠেছেন। পার্টির শেণ্টারে দাদাদের সান্নিধ্যে বিদ্রোহী কিশোরের তখন নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। ভোর হতেই মালিক শুনতে পেলেন তাঁর কুলি-বাহিনীর কাছে থানার কে এক জমাদার এসে নাকি কার একটি ছবি দেখিয়ে গেছে। ছবি দেখানর সময় নাকি এ-ও বলেছে যে ঐ চেহারার কোন যুবকের খোঁজ পেলেই তারা যেন থানায় খবর দেয় এবং লোকটিকে ধরিয়ে দিলেই নগদ পাঁচ হাজার টাকা ইনাম হাতে এসে

যাবে।...কিছু পরে মালিক গ্যারেজে ঢুকতেই অনুরূপ সংবাদ ঐ জমাদারই তাঁকেও জানিয়ে দিল।...

পুলিশের এই তৎপরতা সাধারণ খোঁজখবর করার সীমায় থাকলেও বিপ্লবী-কর্মকর্তারা একটু শঙ্কিত হলেন। তাঁরা বিনয়কৃষ্ণকে অন্য শেল্টারে সরাবার পরামর্শ করছেন এমন সময় দোস্ত্ মহম্মদ এসে তার মালিককে গোপনে ডেকে বলল: 'বাবুজি, ছোটা সর্দার জৈনুদ্দিন সব্ কুছ্ বরবাদ্ কর্ দেগা।'

মালিক প্রশ্ন করলেন: 'কেন কি হয়েছে?'

সর্দার তখন যা বলল তার সার মর্ম এই—জৈনুদ্দিন তার কানে কানে বলেছে যে, জমাদারসাহেব যে-ছবিটা প্রাতে তাদের দেখিয়েছিল ওটার সঙ্গে সে-নওজোয়ানটি মালিকের কাছে নতুন এসেছে তার বহুত্ মিল আছে। সর্দার এ-কথা শুনেই জৈনুদ্দিনকে খুব ধমকে দিয়েছে, কিন্তু অন্য কুলিদের মনে এ সন্দেহ এলে আর রক্ষা থাকবে না। অতএব সর্দারের অভিমত যে বিনয় বসুকে এই মুহূর্তে অন্যত্র সরান হোক।...

সুরেশচন্দ্র জানালেন যে তাঁরা এ ব্যবস্থাই করছেন। অধিকন্তু সর্দারকে বললেন যে তাঁর কোন পরম আত্মীয়ও কেউ যদি আসেন তাঁকে গৃহের ভেতরে না এনে বাইরের ঘরে যেন বসান হয়।...

ঐ দিবসই সন্ধ্যা সমাগমে বিনয় বসুকে অন্য শেল্টারে পাঠান হল।...

*　　*　　*　　*

ওয়ালিউল্লা তথা ওয়েলেসলি অঞ্চলে সর্দারের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে এই চরিত্রবান ধর্মভীরু অথচ আগাগোড়া অসাম্প্রদায়িক-বুদ্ধিতে নির্মল এবং সাহসী পুরুষটির সর্ব অবয়বে এমন একটি প্রত্যয় লিখা সুস্পষ্ট ছিল যে তার প্রভাব সকলেই অনুভব করত। সর্দারের অভূতপূর্ব প্রভুভক্তি এবং প্রভুকে ঘিরে ঘরছাড়া ঐ তরুণদের দুঃসাহসী ও গোপন জীবনধারার প্রতি মমতা যথার্থই এক দুর্লভ বস্তু ছিল। মায়ের মত সদাজাগ্রত চৈতন্যে এই ব্যক্তি নিয়ত সাত নম্বরের এসব আগন্তুক কর্মীদের পাহারা দিত। এই দোস্ত্ মহম্মদের জন্যেই একাধিকবার 'বি-ভি'র এ গুপ্ত কর্মক্ষেত্রটি কঠিন বিপদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে।

আর একটি ঘটনা।...রাইটার্স-রেইড সুসম্পন্ন হয়ে গেছে।...বিনয়দের সঙ্গে যেসব রিভলভার পাঠান হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে একটি রিভলভার ছিল মিঃ মিল্ নামে জনৈক য়্যাংলো-সাহেবের কাছ থেকে কেনা। রিভলভারটির লাইসেন্স যে পূর্বে করা ছিল এবং পরে উহা যে রিনিউ করা হয় নি এ-সব সংবাদ বিপ্লবীদের জানা ছিল না। রাইটার্স-য়্যাকশানের পর উক্ত রিভলভারের লাইসেন্স-নম্বর অনুসারে পুলিশ একজন ইউরেশিয়ানকে গ্রেপ্তার করে। শেষোক্ত সাহেব আবার মিল্‌সাহেবেরই শ্যালক। শ্যালকটি পুলিশের কাছে বলেছে যে ঐ রিভলভার সহ তাঁর ট্রাঙ্ক মিল্‌সাহেবের বাড়িতে ছিল এবং এ বাড়ি থেকেই অস্ত্রটি খোয়া গেছে। এর অতিরিক্ত সে কিছু জানে না।...এ প্রসঙ্গে মিঃ মিলকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু সব কিছু অস্বীকার করায় তাঁর জামিনে মুক্তি ঘটে।...

মিল্‌সাহেব সাত-নম্বরের আড্ডা চেনে, মালিককে চেনে, অধিকন্তু হরিদাস দত্তকেও সে এখানে বহুদিন দেখেছে। কাজেই খবরটা দেবার জন্যে মিঃ মিল হন্তদন্ত হয়ে সাত নম্বরে ঢুকেছে। মিল্‌সাহেবকে দেখতে পেয়েই সর্দার তাকে গেটে পাকড়াও করে আপিস-ঘরে বসিয়ে নিজে প্রথমটায় সকল তথ্য জেনে নিয়েছে। তৎপর সে মালিককে সকল সংবাদ দেবার জন্যে ভিতরের ঘরে প্রবেশ করে। ও-সময় সুরেশবাবুর ঘরে কতিপয় বিপ্লবী অবস্থান করছিলেন বলেই মিল্‌সাহেবকে সর্দার বাইরের ঘরে আটকিয়ে রেখেছিল। কারণ আনুপূর্বিক ঘটনা শুনে মিল্‌সাহেবকে বর্তমানে বিশ্বাস করা উচিত নয় ভেবেই সর্দার উল্লিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে।...

সুরেশবাবু বাইরে এসে মিল-এর কাছে সব শুনে বললেন যে, তার স্বীকারোক্তির ব্যতিক্রম না করে মামলা চালিয়ে গেলে এ-যাত্রা সে নিশ্চয় বেঁচে যাবে। সাহেবকে মামলা চালান বাবদ একটা মোটা টাকা তখনই দেওয়া হল। মিল্ জানতে চাইল, হরিদাস দত্ত কোথায়? কারণ স্মাগলিঙ-এর ব্যাপারে দত্তমহাশয়ের সঙ্গেই তার সরাসরি যোগাযোগ ছিল।...মিল্-এর প্রশ্নের উত্তর সুরেশচন্দ্র দেবার পূর্বেই দোস্ত্ মহম্মদ বলে দিল: 'বাবুজি আট তারিখ্-সে প্যহলে মুল্লুক চলে গয়ে।'

সুরেশচন্দ্রের পরামর্শ মত কাজ করায় সে-যাত্রা মিল্‌সাহেব সত্যি পুলিশের কবল থেকে রক্ষা পেল। মিল্‌সাহেবের বিশ্বস্ততায় কোন ত্রুটি পাওয়া যায় নি।..

* * * *

কিড্ স্ট্রিটে কলকাতার তৎকালীন ভাগ্যবিধাতা স্যার চার্লস টেগার্টের প্রাসাদ। তারই অনতিদূরে চৌরঙ্গীর উপর 'ফার্পো হোটেল'। এই হোটেলে বড় বড়

সাহেবদের আনাগোনা—'বি-ভি'র কালো-তালিকাভুক্ত জাঁদরেল ইংরেজ-রাজপুরুষদের যাতায়াত। দোস্ত্ মহম্মদেরও বহু শিষ্যসামন্ত ছিল ঐ হোটেলের বাবুর্চি-খানসামা-বেয়ারাদের মধ্যে। কাজেই তার উপর সুরেশচন্দ্র ভার দিয়েছিলেন ওসব সাহেবদের গতিবিধি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নানা তথ্য সংগ্রহ করার। স্বল্পভাষী, মন্ত্রগুপ্তিমুগ্ধ এই ব্যক্তি তার লোকজনদেরকে কোন কথা বুঝতে না দিয়ে তাদেরই মারফৎ কি করে যে সংবাদাদি সংগ্রহ করত তা আজও এক বিস্ময়ের বস্তু হয়ে রয়েছে।...

দোস্ত্ মহম্মদ

* * *

দোস্ত্ মহম্মদের কর্মদক্ষতা সম্পর্কে আব একটি ঘটনাব উল্লেখ করব।... পার্টির কাজকর্মের জন্যে একটি গাড়ির প্রয়োজন। তাই পার্টির নির্দেশে প্রফুল্ল দত্ত 'আর. কে. জাইডকা'দের কাছ থেকে 'হায়ার পার্চেজ' সিস্টেমে একখানা ট্যাক্সি খরিদ করে নিয়ে আসেন। ট্যাক্সিটার নম্বর ছিল ১১১ ( B. T. III )। প্রাইভেট গাড়ির নানা অসুবিধা। —কিন্তু এসব কাজে ট্যাক্সির সুবিধা রয়েছে বলেই জাইডকাদের 'ট্যাক্সি' কেনা হল। লাইসেন্স থাকবে ওদের নামেই, যতদিন না মূল্য শোধ হয়। গাড়িটার দাম ছিল ছয় হাজার টাকা। প্রফুল্লবাবু নগদ দেড হাজার এবং মাসে ১৫০৲ টাকা ইনস্টল্‌মেণ্ট হিসেবে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। গাড়ি তো কেনা হল, এখন বিশ্বস্ত ড্রাইভারের প্রয়োজন! সুরেশচন্দ্র সকল মুস্কিলের আসান করে দেন। তিনি বললেন, "ভাবছো কেন? দোস্ত্ মহম্মদ থাকতে ভাবনা?"....সত্যি দোস্ত্ মহম্মদ একটি বিশ্বস্ত ড্রাইভার ঠিক করে দিল। পার্টির কাজ না থাকলে ঐ ট্যাক্সি ভাড়া খাটে। বেশ চলছে।...

হঠাৎ স্থির হল, পার্টির পলাতক কর্মী মুরারি ( সুপতি রায়ের ছদ্ম নাম ) মোটর গাড়ি চালান শিখবেন। গাড়ির ড্রাইভার তাঁকে ফাঁক বুঝে 'ড্রাইভিং'

শেখাতে লাগল। বলা বাহুল্য ফেরারী মুরারির পেছনে তখন পুলিশের খবরদারি যথেষ্ট।

একদিন প্রত্যুষে হিরণ্ময়বাবু ( পলাতক রসময় শূরের ছদ্ম নাম ), নিকুঞ্জ সেন ও মুরারিবাবু ঐ গাড়ি করে গড়ের মাঠে চলে যান। অবশ্য ড্রাইভারই চালিয়েছে গাড়ি।...গড়ের মাঠে পৌঁছে মুরারি ষ্টিয়ারিং-হুইল ধরে গাড়ি চালনা শুরু করলেন। পরে স্বহস্তে রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে 'সাত নম্বর'-এর গ্যারেজে আসবার নেশায় তাঁকে পেয়ে বসল। গাড়ি কঁকাতে-কঁকাতে পার্ক স্ট্রিট হয়ে ওয়েলসলি দিয়ে ওয়ালিউল্লা লেনে ঢুকতে গেল। মোড়েই ছিল কয়েকটি ফলের দোকান। মুসলমান দোকানদারটির ৯-১০ বৎসরের একটি মেয়ে দোকানের পূর্বভাগে বসে ছিল। মোড় ঘুরবার কালে একটু ত্রুটি হবার ফলে ফলওয়ালার কন্যাকে ঐ গাড়ি দেয়ালের গায়ে চেপে ধরল। ড্রাইভার ক্ষিপ্রহস্তে মুরারির হাত থেকে ইতিমধ্যে স্টিয়ারিং-হুইল ছিনিয়ে নিয়েছে। মেয়েটা তাই মরতে-মরতেও সে-যাত্রা বেঁচে গেল। জখম তার তেমন কিছুই হয় নি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা কয় না। তা' ছাড়া ওটা উদ্ধত নিম্নবিত্তের পাড়া, বাজে লোক সর্বত্র কিলবিল করে। এমন স্থানে একটি মোটর-দুর্ঘটনার সঙ্গে পলাতকদের জড়িত হওয়া মানে, সেধে পুলিশের কবলে আত্মদান করা। হিরন্ময়বাবু, নিকুঞ্জবাবু ও মুরারিবাবু—অর্থাৎ রসময়বাবু, নিকুঞ্জবাবু ও ভূপতি রায়—দ্বিধা না করে ত্রস্তে চম্পট দিলেন। সুরেশবাবুর গ্যারেজে গিয়ে তাঁর মাধ্যমে তাঁরা বিপদ-তারণ দোস্ত্ মহম্মদের শরণ নিলেন।...

এদিকে থানায় খবর যেতেই পুলিশ ঘটনার বিবরণ শুনে কেমন যেন সন্দিহান হয়ে উঠল। তাই তাদের তৎপরতার সীমা রইল না।

পাড়ায় একজন ধর্মভীরু মুসলমান হেকিম ছিলেন। তাঁর প্রভাবপ্রতিপত্তি সাধারণ মুসলমানদের উপর সামান্য ছিল না। সুরেশবাবুর পরামর্শ মত দোস্ত্ মহম্মদ হেকিমসাহেবের কাছে গিয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করল। হেকিমসাহেবের সাহায্যে এবং দোস্ত্ মহম্মদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বাক্‌চাতুর্যে সহজেই বিপদ কেটে গেল। ফলওয়ালাকে কিছু অর্থ দিতে হল। কিন্তু পুলিশ বারেবারে উহাকে ও পাড়ার মুসলমান প্রতিবেশীদেরকে বিব্রত করা সত্ত্বে-ও সকলের মুখে একই কথা ধ্বনিত

হল : "নেহি ! বাচ্চীকো কোই গিরায়া নেহি ; না কোই মোটার কিসিকা নুকসান্ পৌঁছায়া।"...

*        *        *        *

আর একদিনের ঘটনা। রসময় শূর ধরা পড়েছেন। তাঁকে হাওড়া জেলে রাখা হয়েছে। সপ্তাহখানেক পর একদিন রাত্রিকালে সুরেশচন্দ্র 'সাত নম্বরে'র দ্বিতলে ঘুমিয়ে আছেন, এমন সময় দ্বারে ত্রস্ত করাঘাত শোনা গেল। দ্বার খুলতেই দেখা গেল সর্দার দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে ঢুকেই সে বলল : 'হুজুর, বহত ডর্‌কী বাত হ্যায়!'...কি হয়েছে প্রশ্ন করতেই সর্দার যা বলল তার অর্থ এই, যে-উকিলবাবু (রসময়বাবুকে অনেকে 'উকিলবাবু' বোলত—কারণ তৎকালে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে উকিলের তালিকায় তাঁর নাম ছিল) সেদিন ধরা পড়েছেন তাঁর জেলখানা থেকে লেখা একটি পত্র নিয়ে একজন লোক রাত এগারটায় এসেছিল এবং প্রভাতবাবুকে (সুরেশচন্দ্রের জনৈক কর্মচারী) খোঁজ করেছিল। প্রভাতবাবু নিকটেই ছিলেন এবং নিজের নাম শুনতেই তিনি হাত পেতে পত্রখানা নিচ্ছিলেন। লোকটাকে দেখেই সর্দারের সন্দেহ হয়, তা ছাডা 'উকিলবাবু' তো কাঁচা লোক নন—তিনিই বা পত্র দেবেন কেন?...

মালিক (সুরেশবাবু) প্রশ্ন করলেন : "তারপর?"

দোস্ত্ মহম্মদ উত্তর দিল : "প্রভাতবাবুকো গুস্‌সাসে ম্যয় বোলা—আ-রে কিসকা খত আপ্ লেতে হেঁ? ছোড়্ দিজিয়ে।...পিছে উয় আদমিকো ম্যঁয় বোল দিয়া—এ্যায়সা নামকা কোই ইধর নেহি হ্যায়। মগর্ কাল সবেরে মালিককে পাস আ যাও, কুছ পত্তা মিল্ সকতা হ্যায়।"

—"তারপর?"

—"উয় চলা গিয়া। লেকেন কাল জরুর আয়েগা।...অভি জো করনা করিয়ে।"

সর্দারের সাবহিত-দৃষ্টি ও উপস্থিতবদ্ধি এক বিস্ময়কর বস্তু ছিল। প্রভাতকে ঐভাবে না সামলালে সেদিন অনর্থ ঘটে যেত। মালিকও কালবিলম্ব না করে প্রভাতকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।...পরদিন প্রত্যুষে অবশ্য সেই বিপুলকায় হিন্দুস্থানীটি এসে হাজির হল। চিঠিখানা হাওড়া জেল থেকে লিখিত, হস্তাক্ষরও রসময়বাবুর বলেই মনে হয়, অধিকন্তু চিঠির বিষয়বস্তুর মধ্যে রসময়বাবুরই

পারিবারিক কথাবার্তা এমনভাবে সন্নিবেশিত যে একটু তলিয়ে না দেখলে যেকোন মানুষই ধোঁকা খেতে বাধ্য। প্রভাত সুরেশবাবুর রিক্সাগ্যারেজেরই নিরীহ একটি কর্মচারী। তাঁকে লক্ষ্য করে বিশেষ মতলব সিদ্ধি করার জন্যেই যে পুলিশ তীর ছুঁড়েছিল তা সর্দার আঁচ করেছিল, সুরেশবাবুও বুঝেছিলেন। আগন্তুক-পত্রবাহককে সুরেশবাবু বলে দিলেন যে, 'প্রভাত' নামে বহু পূর্বে তাঁর একটি কর্মচারী ছিলেন বটে, তবে তাঁর কোন পাত্তাই তিনি রেখে যান নি বলে বহুকাল তাঁর খোঁজ তিনি জানেন না।

লোকটি তখন নিরুপায় হয়ে পত্রে নির্দেশিত 'বকশিস' দাবী করল। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, পত্রের 'প্রভাতবাবু'র অনুপস্থিতিতে কেউ আর তাকে কিছু দেবার আগ্রহ বোধ করলেন না।...

'বি-ভি'র এই গোপন কেন্দ্রটিকে লক্ষ্য করে কর্মীদেরকে ছেঁকে তুলবার উদ্দেশে পুলিশ যে বেড়া-জাল বিস্তার করতে চেয়েছিল তা' ছিন্নভিন্ন করে দিল ঐ সদা সতর্ক একটি মানুষ, যে বিশ্বস্ত প্রহরীর মত নিয়ত পাহারা দিয়ে যাচ্ছিল তার প্রভু ও বিপ্লবীদের কর্ম-মন্দিরকে। প্রচুর প্রলোভন ও বিপুল অর্থের আবেদন পদাঘাতে চূর্ণ করে অতন্দ্র সাধনায় সেই কালে এই ত্যাগমুগ্ধ মানুষটি যে কত বৃহৎ কাজই করে গেছে তার মূল্যের পরিমাণ জাতি কোনকালে অনুধাবন করবে কিনা জানিনে।...

* * * *

দোস্ত্ মহম্মদ যে কত খাঁটি মানুষ তার পরিচয় পরম শ্রদ্ধায় পরিব্যাপ্ত দেখা গেছে অন্য এক পরিবেশেও। তখন 'ক্যালকাটা কিলিং' শুরু হয়ে গেছে। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় দিনগুলি রক্তরঞ্জিত। মানুষ বর্বরতায় শয়তানকে হার মানিয়েছে। ইয়োরোপীয়ান্ এসাইলামে তৎকালে (১৯৪৬) ছিল সুরেশবাবুর রিক্সা-গ্যারেজ। সুরেশবাবুর অবর্তমানে তাঁর গ্যারেজ এবং হিন্দু-কুলিদের প্রাণ এই দোস্ত মহম্মদ ও তার সহকারী সর্দার মহম্মদ্দীনের প্রভাবে এবং নির্লোভ ও একান্ত অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির প্রাচুর্যে রক্ষা পেয়েছিল।

আজ দোস্ত্ মহম্মদ সত্তরের কাছাকাছি এসে গেছে। কিন্তু আজও সাহসে, পরিমিতিজ্ঞানে ও মানসিক-সৌন্দর্যে সে মহান্, সে সুন্দর। প্রায় নিরক্ষর এই মানুষটি বিপ্লবের যুগে বিপ্লবের থিয়োরেটিক্যাল্-পাঠ বেশি নেয় নি, কিন্তু বিপ্লবের

প্র্যাক্টিক্যাল্-পাঠ নিয়েছিল নিখুঁত করে। আজ মনে হয় তার অক্ষর-পাঠ (বিপ্লবের) সকলের অপেক্ষা নির্ভুল হয়েছিল বলেই প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িকতার যুগেও সে খাঁটি অসাম্প্রদায়িক থেকে গেছে এবং আজকের কালোবাজারে ও সে শুভ্রচিত্তে তার মনিবের সঙ্গে ও প্রাক্তন 'বি-ভি'-বন্ধুদের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক অব্যাহত রেখে যাচ্ছে।...

৭নং ওয়ালিউল্লাকে বাদ দিলে যেমন 'বি-ভি'র কর্মকাণ্ড লেখা যায় না, তেমনি দোস্ত্ মহম্মদকে ভুলে গেলে 'সাত নম্বর' বাড়িকেও ভুলে যেতে হয়। তাই সর্দারের কথা এত লিখেও মনে হয় কিছু লেখা হয় নি। সবারই অলক্ষ্যে যে 'রূপে' একদিন দোস্ত্ মহম্মদ দেখা দিয়েছিল এই বিপ্লবতীর্থে মঙ্গলঘট ভরে নেবার জন্যে, সেই 'রূপ'কে স্মরণ করতেই মনে হয়ঃ

"সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে,
তার কোন পরিমাপ নাই বাহিরের দেশেকালে।
সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়॥"

## ১৯৩৭ সালের পর

১৯৩৭ সালের শেষভাগে রুদ্ধ কারাগার পুনরায় খুলে গেল। বন্দীরা দলে দলে মুক্তি পেতে লাগলেন। এ মুক্তিসংগ্রহে মহাত্মার অবিচলিত চেষ্টা বর্তমান ছিল। কারণ ঐ সময় বাংলায় পদার্পণ করেই তিনি বুঝেছিলেন যে জেলে হাজার-হাজার ছেলেমেয়েদের বন্দী রেখে কংগ্রেসের কাজ চালান সম্ভব নয়। সেকালে যেখানেই তিনি গিয়েছেন তাঁকে শুনতে হয়েছে—'আগে ছেলেদের বাইরে নিয়ে আসুন, বাপুজী, তারপর দেশের কাজ।'...ইংরাজ-ও চাচ্ছিল যে, গান্ধীজির মারফত বিপ্লবীদের 'নাকে খৎ' যদি দেওয়ান যায় তবে মন্দ কি?...গান্ধীজি তাই জেলে-জেলে ও বন্দীবাসে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর চেষ্টা বন্দীদের কাছ থেকে 'বদলে ফেললেম মতটা, ছেড়ে দিলেম পথটা' গোছের কোন কথা আদায় করা। মহাত্মা চাচ্ছেন যেকোন উপায়ে বন্দীদেরকে জেলের বাইরে নিয়ে আসা এবং 'কংগ্রেস'কে চালু করা। কিন্তু বিপ্লবীরা আদর্শনিষ্ঠায় নাবালক নন। তাঁরা সবাই বলে দিলেন যে, জেলের বাইরে গিয়ে, সকল অবস্থা বিবেচনা করেই শুধু তাঁরা তাঁদের কর্মপথ স্থির করতে পারেন।...

হিজলি-বন্দীবাসে 'তিন-আইনে' ( Regulation III, 1818 ) স্টেট্‌-প্রিজনার্‌রা ছিলেন। তাঁদেরকে পেশোয়ার থেকে মাদ্রাজ অবধি ভারতবর্ষের নানা জেলে আলাদা-আলাদা করে রাখা হয়েছিল। হালে বাংলায় ফিরিয়ে এনে তাঁদের রাখা হয়েছিল হিজলির ছোট ( ডিস্ট্রিক্ট ) জেলে। এবারকার 'তিন-আইনে'র বন্দীদের নাম—জ্যোতিষ ঘোষ, পূর্ণ দাস, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, সুরেন ঘোষ, রবি সেন, ভূপতি মজুমদার, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপেন দত্ত, সত্য গুপ্ত, রমেশ আচার্য, প্রতুল গাঙ্গুলি, রসিক দাস, অরুণ গুহ, জীবন চট্টোপাধ্যায়, প্রতুল ভট্টাচার্য, ভূপেন রক্ষিত-রায়। সুরেশ দাস ও বিনয় রায়কে পূর্বেই বহির্বাঙলার জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।...

গান্ধীজি হিজলি এসে গেলেন। বাংলার লাট এণ্ডার্স'ন তখন এ-দেশ থেকে বিদায় হচ্ছেন। বিদায়ের পূর্বে তাঁর ইচ্ছা বিপ্লবের নেতৃস্থানীয় স্টেট্‌প্রিজনারদের ( অবশ্য এঁদের সমতুল্য বা প্রবীণতর কতিপয় দায়িত্বশীল নেতা অপরাপর জেলে বন্দী ছিলেন ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করার। কিন্তু তাঁদের মনের সংবাদ তিনি জানতে উৎসুক মহাত্মার মাধ্যমে।...মহাত্মা এলেন হিজলির ছোট জেলে। তাঁর সঙ্গে স্টেট্‌প্রিজনারদের আলাপ হল, তর্ক হল, প্রচুর মতদ্বৈধতা ঘটলো। এই তর্কাতর্কির ফলে মহাত্মার রক্তের চাপ ( তিনি রক্তচাপবৃদ্ধিতে ভুগছিলেন ) অসম্ভব বেড়ে গেল। কিন্তু স্টেট্‌প্রিজনাররা নির্মমকণ্ঠে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা কোন শর্তে মুক্তিলাভে প্রস্তুত নন।...মহাত্মা ব্যর্থমনোরথ হয়ে বিদায় নিলেন।...

পরদিন খবরের কাগজে বড বড় হেড্‌লাইনে বেরুল :

"The Revolutionary Leaders Refused Conditional Release !"...

ভারত ও বহির্ভারতের জনমনের চাপে পরিশেষে গান্ধীজির সঙ্গে ইংরেজ আপোষ করল। বিনা শর্তে রাজবন্দী ও কিছুসংখ্যক দণ্ডিত রাজনৈতিক-বন্দী মুক্ত হতে থাকলেন। রাজবন্দীদের সর্বশেষ ক্ষুদ্র দলটি ১৯৩৮ সনের শেষের দিকে মুক্ত হলো। 'বি-ভি'র কর্মীরাই ছিলেন এই শেষের দলে।...মহিলা দণ্ডিতা রাজনৈতিক-বন্দীদের মুক্তি পেতে-পেতে ১৯৩৯ সাল এসে গেছে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী বড-বড রাজনৈতিক-মামলার বন্দীদের বাইরের অলোক দেখা সম্ভব হবার পূর্বেই দ্বিতীয় মহাসমর শুরু হয়ে গেল। ইংরেজের ছোটবড় সকল প্ল্যানই বানচাল হলো।...

## সুভাষচন্দ্র ও 'বি-ভি'

১৯৩৮ সালের শেষের দিকে জেল থেকে বেরিয়ে 'বি-ভি' সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে 'পাবলিক-পলিটিক্সে' কিছুটা আত্মনিয়োগ করল।

দক্ষিণপন্থী-কংগ্রেসের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতবিভেদের ফলেই যে 'ফরওয়ার্ড ব্লকে'র সৃষ্টি তা' ইতিহাসের কথা। 'এফ্‌-বি' প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় সুভাষচন্দ্রের বিশ্বস্ততম বন্ধু ছিল যেসব দল তাদেব মধ্যে 'বি-ভি' ও 'শ্রীসংঘ' অন্যতম। হেমচন্দ্র, সত্যরঞ্জন বক্সি, লীলা রায়, অনিল রায়, সত্য গুপ্ত, ভবেশ নন্দী, মনীন্দ্রকিশোর রায়, জ্যোতিষ জোয়ারদাব ও মিহির মোতায়েদ এবং দ্বিজেন দাস ও সুরেন সরকার প্রমুখ ঢাকা-কলকাতা-কুমিল্লা-মৈমনসিংহ ও পাবনায় 'ফবওয়ার্ড ব্লক' সংগঠনে লেগে গেলেন। তাঁদেব সঙ্গী বিপ্লবীদল হিসেবে সুভাষচন্দ্রের পাশে এসে দাড়ালো পূর্ণ দাস মহাশয়, তাবক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমর বসুদের দল এবং উত্তবঙ্গ গ্রুপ।

## মাসিকপত্র চলারপথে

'বি-ভি' বিপ্লবাদের মুখপত্ররূপে পুনরায় একটি সাংস্কৃতিকপত্র ( রাজনৈতিক পটভূমে ) বের করার প্রয়োজন বোধ করলেন। সরকারী চাপে 'বেণু'র পুনঃ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। কাজেই ভূপেন্দ্রকিশোর বক্ষিত-রায়ের সম্পাদনায় **'চলারপথে'** নামক মাসিকপত্র ১৩৪৫ সনের ফাল্গুন মাসে ( ইং ১৯৩৯ ) প্রকাশিত হল।

সুভাষচন্দ্র তখন রাষ্ট্রপতি তথা কংগ্রেস-সভাপতি। রাষ্ট্রপতির আসন থেকে জনসাধারণকে তিনি আবেদন জানান :

"The now-defunct 'BENU' once provided the opportunity of doing national service to the country through the medium of literature. It ceased to exist due to its own merit in certain line. That is a long story which is known to the country. The country further knows how deep and abiding has been the impression left by it in the minds of youth. The organisers of 'BENU' who are my friends were detained for long years in prison without trial. On their release, they have ventured upon the project of publishing a first class monthly entitled 'CHALAR PATHE'. It is my firm belief that the journal will

exercise a powerful influence upon the minds of my countrymen. I unhesitatingly appreciate the utility of 'Chalar Pathe' for those who are pledged to sacrifice their all to lead the country to liberation through political, social, economic and cultural movements conceived from a newer angle of vision. I fervently pray for the long life of CHALAR PATHE. I humbly entreat my countrymen to manifest their sympathy for the Journal by helping it in its onward march."

( Sd/ Subhas Chandra Bose,
38/2 Elgin Road. 30. 1. 39 )

'চলারপথে'র প্রথম সংখ্যাই প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যপত্র রূপে বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাংলার প্রথিতযশা বহু কথাশিল্পী, শান্তিনিকেতন ও পণ্ডিচেরী আশ্রমের সুসাহিত্যিকগোষ্ঠী, নন্দলাল বসু ও অসিত হালদাব প্রমুখের মত প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী 'বেণু'ব মতই 'চলাবপথে' কাগজখানাকে-ও আপন জ্ঞানে গ্রহণ করেন। তবু ইহা মর্মান্তিক সত্য যে, শরৎচন্দ্রের স্নেহ ও নেতৃত্ব ( তাঁর দেহরক্ষাব জন্যে ) না-পাওয়া 'চলাবপথে'ব জীবনে এক বেদনাবহ বঞ্চনা।...

চলাবপথের প্রথম সংখ্যায় ( ফাল্গুন, ১৩৪৫ ) কবিগুরুর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। নাম তার 'চলারপথে'—

'চলার পথের যত বাধা
পথ বিপথের যত ধাঁধা
পদে পদে ফিরে ফিরে মারে,
পথের বীণার তারে তারে।'...

প্রথম-সংখ্যা থেকেই শুধু প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যপত্র নয়, বৃটিশ বিরোধী পত্র হিসেবেও 'চলারপথে' সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাজেই এর আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত হয়ে এল। তিন মাস কাগজটি চালানর পর তৎকালে নাজিমুদ্দিন-সরকার উহার প্রকাশ নির্মম হস্তে বন্ধ করে দেন। কাগজখানার পেছনে যাঁদের সেদিন অনেকখানি শক্তি ব্যয়িত হত তাঁদের মধ্যে শৈলেন নিয়োগী, রমেশ

চ্যাটার্জি ( স্বর্গগত ), নীরদ দত্তগুপ্ত, পরিমল রায়, শান্তি গাঙ্গুলী, বিনয় সেনগুপ্ত, নির্মল রায় ( মেদিনীপুর ), অমলেন্দু ঘোষ, মুকুল কর, সন্তোষ দাসগুপ্ত প্রমুখ অন্যতম।

'চলারপথে' প্রকাশিত হত 'যন্ত্রলেখা' প্রেস থেকে। 'বেণু'-প্রেসেরই নতুন নামকরণ করা হয়েছিল 'যন্ত্রলেখা'। কর্মীদের দীর্ঘদিনের অবর্তমানে এই প্রেসটি একাধিক হাত ঘুরে প্রায় বেহাত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জেল থেকে ফিরে আসার পর 'বেণু'র প্রেসটি আবার 'বি-ভি'র হাতেই চলে আসে।...ভূপতি মণ্ডল 'বি-ভি'র মেদিনীপুর শাখার বিশ্বস্ত কর্মী। জেল থেকে মুক্তিলাভের পর ভূপতিবাবুর হাতেই 'যন্ত্রলেখা' পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল। 'যন্ত্রলেখা'র কার্যালয় তখন ১১/১, প্রতাপ চ্যাটার্জি লেনের ( কলিকাতা ) বাড়িতে। কিন্তু এ প্রেসটির পক্ষে কেবল একটি 'ট্রেডেল' মেসিনে 'চলারপথে' ছাপানর সুবিধা হতো না। তাই বিজয়চন্দ্র ধর ও দেবেন্দ্রলাল বসাক পরিচালিত 'পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্' ( ৪৭নং মধু রায় লেন, কলিকাতা ) থেকে কাগজটি ছাপিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হতো।...

এই সময়ে 'বি-ভি'র কর্মীরা **'ন্যাশনাল লিটারেচার এম্পোরিয়াম'** নাম দিয়ে ৬২নং বহুবাজার স্ট্রীটের বাড়িতে মণীন্দ্রকিশোর রায়ের পরিচালনায় একটি 'পাবলিশিং হাউস' খুলে কয়েকটি পুস্তক প্রকাশিত করেন। পুস্তকগুলো যথাক্রমে ছিল :—ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়ের 'মুখর বন্দী' ও 'বন্দীর মন ; জ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদারের 'Determinism' ( আচার্য সত্যেন বসুর ভূমিকাপত্র সহ ) ; বিনয় সেনের 'Political Groupings in India'। এ ছাড়া ভবেশচন্দ্র নন্দীর 'বাংলার চাষী', ভূপেন্দ্রকিশোরের 'A Prisoner Speaks', চিত্ত বিশ্বাসের 'Students And Their Role' এবং রমেশ চট্টোপাধ্যায়ের 'বাংলার মজুর' প্রভৃতি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি তৈয়ের হওয়া সত্ত্বেও বইগুলো প্রেস থেকে বার করা সম্ভব হলো না 'বি-ভি'র নেতৃস্থানীয় কর্মীরা দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের শুরুতেই গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নানা পুস্তক, পত্রপত্রিকা ও গোপন ইস্তাহার ছাপানর ব্যাপারে আপ্রাণ সাহায্যদান করেছেন 'বি-ভি'র দুঃখদিনের পরম বন্ধু বিজয় ধর ও দেবেন বসাক তাঁদের 'পপুলার প্রিন্টিং' প্রেসটির মাধ্যমে। লক্ষাধিক রাজদ্রোহ-মূলক ইস্তাহার তাঁরা ছেপে দেন নির্ভয়ে। কোন সময়ই এসব কাজে ছাপার খরচ

তাঁরা নিতেন না।...'বি-ভি'র আর একটি কর্মী ছিলেন আর একটি প্রেসের মালিক রূপে ঢাকা শহরে। তাঁর নাম বঙ্কিমচন্দ্র সাহা। বঙ্কিমবাবুর কাছেও 'বি-ভি' কৃতজ্ঞ। তাঁর ছাপাখানার মাধ্যমেও প্রচুর গোপন কাজ সমাপিত হয়েছে বিপদের আশঙ্কা নিয়ে।...

## ফরওয়ার্ড ব্লক

কংগ্রেস-হাইকমাণ্ডের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতবিভেদ ইতিহাসবিশ্রুত ঘটনা। কেবল সুভাষচন্দ্র নয়, গোটা 'বি-পি-সি-সি'ই সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত। হাইকমাণ্ড বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেললেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস 'এ্যাডহক কমিটি' কোন জনসভা করতে পারতো না। 'এ্যাড্‌হক কমিটি'র পুরোভাগে ছিলেন গান্ধীবাদী কংগ্রেসীদল এবং 'যুগান্তরে'র অধিকাংশ। কংগ্রেস থেকে তাড়িত হয়ে সুভাষচন্দ্র সর্বভারতীয় **ফরওয়ার্ড ব্লক** স্থাপিত করলেন। রামগড কংগ্রেস-অধিবেশনের ( ১৯৪০ ) খুব তোড়জোড। পাশাপাশি সুভাষচন্দ্র আহূত 'আপোষ-বিরোধী সম্মেলন'। সেই সম্মেলনের মঞ্চ থেকে বিউগিল বাজিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র আপোষহীন গণ-যুদ্ধেব রণভেরী ধ্বনিত করলেন। বিজ্ঞজনের ওষ্ঠে বিদ্রূপের হাসি।...কিন্তু সে-হাসি মিলিয়ে গেল যখন চোখ বিস্ফারিত করে তাঁরা একদিন শুনলেন জর্মান-বেডিও খুলে **'I am Subhas, speaking !'...**

* * * *

'বি-ভি'র কর্মীরা জেল থেকে বেরিয়ে এসে বছর দেড়েকও সময় পেলেন না। ১৯৪০ সালের প্রথম ভাগে, রামগড় কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই জার্মান সৈন্য-বাহিনী যেদিন নরওয়েতে পদার্পণ করল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা কঠিনতম হস্তে বাজিয়ে—সেদিনই বাংলার পুলিশ সচকিত হয়ে উঠল। তার পরদিনই গভীর নিশীথে একযোগে বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো জেলা থেকেই পঁচিশজন বিপ্লবীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ফেলল। এঁরা সবাই 'বি-ভি' দলের নেতৃস্থানীয় ( পুলিশের জানিত ) কর্মী। এঁদের মধ্যে ছিলেন হেমচন্দ্র ঘোষ, সত্যরঞ্জন বক্সি, মণীন্দ্র-কিশোর রায়, সত্য গুপ্ত এবং ভুপেন রক্ষিত-রায়। রসময় শূরকে কলকাতার আস্তানায় না-পাওয়াতে কয়েকদিন পর খড়্গপুর স্টেশানে পেয়ে গ্রেপ্তার করা হয়।

আকস্মিক এই ধরপাকড়ে 'বি-ভি'র বিশেষ ক্ষতি হলেও দলের গোপন সংহতি নষ্ট হলো না।...তা ছাড়া কয়েক মাসেব মধ্যেই অতিরিক্ত অসুস্থতার জন্যে সত্যরঞ্জন বক্সি মহাশয়কে পুলিশ ছেড়ে দেয়।

সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক-কর্মের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল। তৎসঙ্গে 'বি-ভি'র যে-ধারার গোপন যোগাযোগ থাকা স্বাভাবিক তার কিছু অংশ আমরা যথাস্থানে প্রকাশ করব। এখানে এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষ থেকে অন্তর্হিত হবার পরে আফগানিস্থানের পথে তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যেগোযোগ রেখেছিলেন সত্যরঞ্জন বক্সির মাধ্যমে যতীশ গুহ, কামাখ্যা রায়, বিনয় ( সর্বা ) সেনগুপ্ত, কমেট দাসগুপ্ত, চন্দ্রশেখর সেন ও শান্তিময় গাঙ্গুলি। এ ছাড়া পরে বর্মায় নেতাজীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন **অজিত রায়, নিতাই বসু** এবং **হরিপদ ভৌমিক**। হরিপদ পূর্ব থেকেই সিঙ্গাপুরে বাস করছিলেন। অজিত রায় চট্টগ্রামের ফরওয়ার্ড ব্লক-নেতা এবং 'বি-ভি'র শ্রদ্ধেয় বন্ধু দেশখ্যাত মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদি ও তাঁর মুসলমান সহকর্মীদের সাহায্যে সীমান্ত পার হয়ে রেঙ্গুনে চলে যান।

এ ছাড়া বাংলায় বসে যাঁরা এই যোগাযোগ বর্মা ফ্রন্টের সঙ্গে রক্ষায় কর্মব্রত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকটি কর্মী হলেন কামাখ্যা রায়, ধীরেন সাহা-রায়, সত্যব্রত ( চঞ্চল ) মজুমদার, নীরেন রায় ( স্বর্গগত ), সুবোধ চক্রবর্তী, গোপাল সেন ( ছোট ), রাতুল রায়-চৌধুরী, ধীরেন মুখার্জি এবং রামলাল দাস। মেয়েদের মধ্যে সুবালা সেন; উষা সেন, কমলা দাসগুপ্তা, মেধা ঘোষ, শান্তি রায়-চৌধুরী দলের এসব কাজে তৎপর ছিলেন।

সুভাষচন্দ্র বিদেশ থেকে সর্বপ্রথম যে-প্যাম্ফ্লেটখানা সংগোপনে পাঠিয়েছিলেন ( ১৯৪১ সনে ) সত্যরঞ্জন বক্সিদের কাছে ( শরৎবাবুর মাধ্যমে )—তা' গোপনে ছাপিয়ে 'বি-ভি'র কর্মীরা দেশময় ছড়িয়ে দিলেন। প্যাম্ফ্লেটটিতে স্থান উল্লেখ ছিল : "From somewhere in Europe"! নীচে সুভাষচন্দ্রের সহি ছিল। সেই সহি 'Facsimile' করে ছাপান-প্যাম্ফ্লেটে দেওয়া হয়।...

* * * *

'বি-ভি'র কর্মীরা নেতাজির ব্যাপক রণযাত্রায় সামান্যতম যোগাযোগ রক্ষা

করে ধন্য হতে পেরেছিলেন শুধু ঐ 'সেল্'-সিস্টেমে দল গড়ার ফলে। তাঁদের পুলিশে জানিত কর্মীরা তখন জেলে। নেতৃস্থানীয় অনেকেই বন্দী। তবু যাঁরা বাইরে ছিলেন তাঁদের চতুষ্পার্শে নতুন নতুন কর্মী এসে দলের শক্তি বৃদ্ধি করতে লাগলেন। ...কিন্তু হঠাৎ অবস্থা বদলে গেল। বাশিয়া মিত্রপক্ষে যোগ দেওয়াতে ভারতীয় কম্যুনিস্টবা বৃটিশবিবোধী-সংগ্রামকে 'জনযুদ্ধ' বলে চালিয়ে দিতে চাইলেন। এবং অতি সৎ ও একনিষ্ঠ বন্ধুরূপে জনযুদ্ধেব অংশীদাব ইংরেজ-পুলিশকে ওঁদের সহযোগী 'কীর্তি পার্টি' ( পাঞ্জাব ) সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান-ব্যাপারের যতটুকু জানা ছিল তা' বলে দিল!. .এই কম্যুনিস্ট সহযোগীদের তৎপরতায় 'বি-ভি'র কয়েকটি কর্মীব নামও আই-বি বিভাগ জানতে পাবল। এবং অনতিবিলম্বে তাবা সত্যবঞ্জন বক্সি মহাশয়কে যতীশ গুহ সহ দিল্লী ফোর্টে এনে মিলিটারীব হাতে ছেড়ে দিল টিট্ কববাব জন্যে। শান্তি গাঙ্গুলিকে খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া গেল না। কাবণ তিনি পলাতক ছিলেন। ..এব কিছুকাল পব বর্মা ফ্রন্টে নেতাজিব আবির্ভাব ঘটেছে। তখন আবাব পুলিশ সত্যবাবুব ছোট ভাই সুধীব বক্সি, ধীবেন সাহা-বায় ও সত্যব্রত মজুমদাবকে নিয়ে যায় লাহোব ফোর্টে। তাঁবাও মিলিটাবীব হাতেই সমর্পিত হলেন।

যতীশচন্দ্র গুহ

দিল্লী ও লাহোব দুর্গে বিভিন্ন সময়ে অকথ্য মাবপিট ও নির্যাতনের পালা মাসের পর মাস অব্যাহত ছিল। এ নির্যাতনেব ফলেই **যতীশচন্দ্র গুহ** দুরাবোগ্য ব্যাধির কবলে অচল হয়ে যান এবং উক্ত ব্যাধিব প্রকোপেই ১৯৪৬ সালে অকালে দেহত্যাগ কবেন।....

যাঁরা ভারতে অবস্থান করে নেতাজিব সংগ্রামে পরোক্ষ অংশ গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের কিছু কথা বলা।

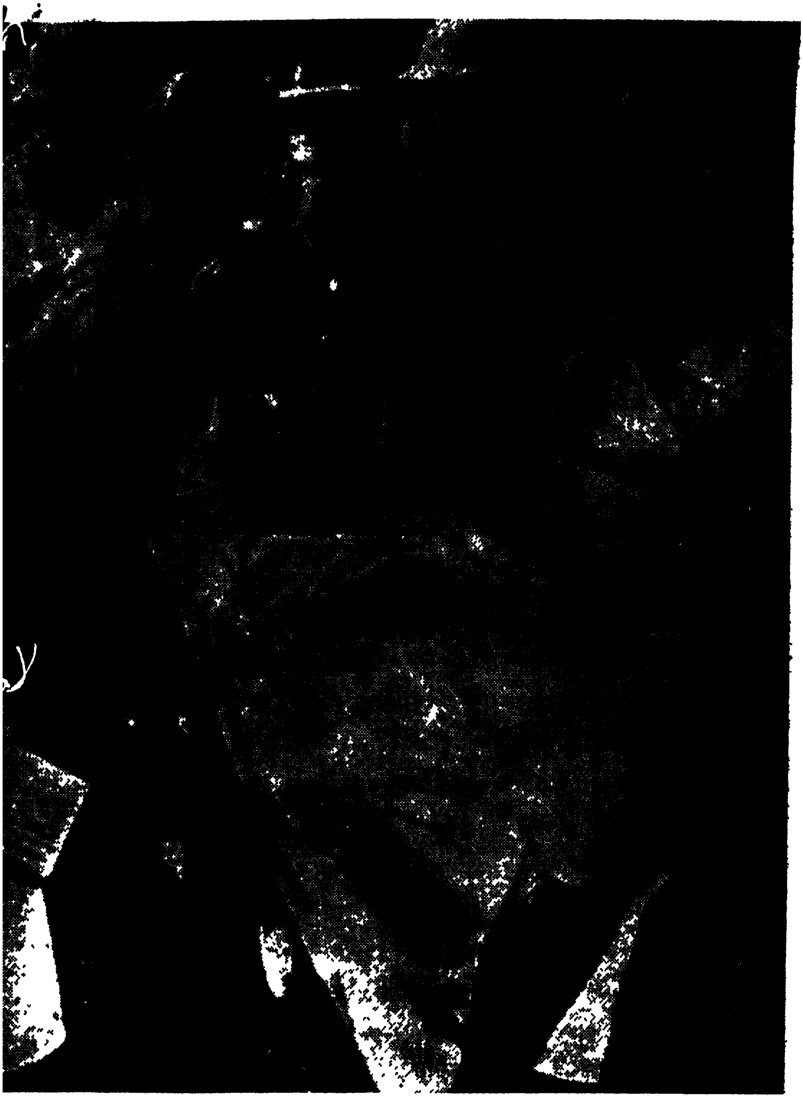

ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুকে স্ট্রেচারে করে সভাস্থলে নেওয়া হচ্ছে ;
( ডাইনে ) তত্ত্বাবধায়ক রূপে মেজর সত্য গুপ্ত

হয়েছে, আরো কিছু বলা হবে যথাস্থানে। কিন্তু বর্মার বনে-প্রান্তরে দুর্মদ সেই সংগ্রামে 'বি-ভি'র কয়েকটি কর্মীরও যে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল তা'ও যথাস্থানে উল্লিখিত হবে। তবে উক্ত কর্মীদের অন্যতম হরিপদ ভৌমিকের কথা এখানে সামান্য বলব। **হরিপদ ভৌমিকের** ডান হাতখানা এবং বাঁ-হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ শত্রুপক্ষের বোমায় উড়ে গেছে। এ দুর্দৈবে তাঁর মনে অবসাদ আসে নি, নিয়ত দুঃখদৈন্যের নিষ্ঠুর চাপেও ক্ষোভের স্পর্শ লাগে নি !···

## ইডিয়লজি-র ফ্রন্ট

১৯৩৫—'৩৬ সাল থেকে রাজনৈতিক-জগতে 'ইডিয়লজি'র মারপিট শুরু হয়ে যায়। রাশিয়ান কম্যুনিজম্ সহস্র পুঁথিপত্র নিয়ে ভারতবর্ষের বাজার ছেয়ে ফেলে ভাবপ্রবণ তরুণদের কল্পনায় নতুন করে আগুন ধরিয়ে দেয়। সে-আগুন আত্মঘাতী। শত্রু তখন আব শাসক 'ইংবেজ জাতি' রইল না। শত্রু হল দেশী-বিদেশী ধনস্বামীরা শুধু নয়, 'বুর্জোয়া' মধ্যবিত্ত-শ্রেণীও! মহাশত্রু হল 'জাতীয়তাবাদ'! নতুন বন্যার জলের মত কম্যুনিস্টিক-সাহিত্য ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল বন্দীদের ধারণা, জ্ঞান, এমন কি যেসব কাজ করে তাঁরা জেলে এসেছেন তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পর্যন্ত। জেলখানায় বন্দীদের সম্মুখে মাত্র দুইটি জিনিস—এক তাঁদের অসীমিত বন্ধনকাল, আর তাঁদেব নিষ্ক্রিয় জীবন। কাজেই গোগ্রাসে তাঁরা চোখাচোখা যুক্তিসহ 'রেড্'-সাহিত্য পড়েন, আর বিশ্ব-প্রলিটারিয়েটের প্রেমে মুগ্ধ হতে থাকেন। নতুনতর এই ভাবধারা গ্রহণ কবাব মূলে বন্দীদের দুর্বলতাও কিছু উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। এই দুর্বলতাও কিছু অস্বাভাবিক নয়। বিনাবিচারে-বন্ধনকালের কোন সময় নির্দেশ থাকে না! এ বন্ধন অন্তহীনও হতে পারে। রাজনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে বন্দীদের মুক্তি। যে-সময়ের কথা বলা হচ্ছে সেই সময়ে দেশের অবস্থা ছিল এমনই যে, মুক্তির স্বপ্ন দেখা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। এদিকে বিপ্লবীদের 'কম্যুনিজম্' গ্রহণের ঝোঁক পুলিশের কাছেও ভাল লাগল। কারণ চতুর পুলিশ বুঝে ফেলেছে যে, এতে সশস্ত্র-বিপ্লববাদের আসন্ন মৃত্যু ঘটবার পথ প্রশস্ত হবে। ভাবপ্রবণ বাঙালীর জাতীয়তাবোধ এসব তরুণদের কল্যাণে যদি আত্মঘাতী ক্লাস্-স্ট্রাগলের মাধ্যমে 'বিশ্ব-প্রলিটারিয়েট-বুর্জোয়া-স্ট্রাগলে'র বেদীতলে জবাই হয়ে যায় তবে মঙ্গল। অন্তত বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষে অবিচলিত থাকবে। ফলে পুলিশও বন্দীদের

এই 'ফ্রন্ট' অদলবদলে সাহায্য করে চলল।....অনেক বন্দীই তাই ভবেলেন—অতীতের কর্মকে নির্বিচারে নিন্দা করলে হয়ত এখুনি 'মুক্তি', এবং মুক্তি পেয়েই আবার বাংলা ছেড়ে পৃথিবীর গণসাধারণের স্বার্থে যুক্ত হওয়া যাবে বৃহত্তর কাজে। এ ধারার তথাকথিত যুক্তিপূর্ণ বাক্যে মনকে বুঝ দিয়ে তাঁদের অনেকেই কঠোর 'কম্যুনিস্ট' হয়ে থাকলেন। অবশ্য সত্যি আদর্শমুগ্ধ কনভার্টেড্ কম্যুনিস্ট যে এঁদের মধ্যে ছিলেন না, তা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা তুলনায় ছিল কম। তাঁরা তাঁদের অতীতকেও নিন্দা করেন নি এই কারণে যে, অতীতের পশ্চাৎভূমি না থাকলে তাঁদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কাপুরুষ ছিলেন না বলেই তাঁরা অতীতকে মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হন নি।...

কিন্তু বিপদ হল তাঁদের, যাঁরা বৃটিশের কবল থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করবার যুদ্ধকেই অগ্রাধিকার দিতে চান। যাঁদের জাতীয়তাবোধ 'বিশ্ববোধে'র সহায়ক, কিন্তু তথাকথিত বিশ্ব-প্রলিটারিয়েটদের ক্রীড়নক হতে যাঁরা রাজী নন—তাঁরা প্রমাদ গণলেন। 'বিশ্ব-প্রলিটারিয়েট বিপ্লবে'র বাক্য-যুদ্ধকে প্রতিহত করার মত বিজ্ঞানসম্মতভাবে লিখিত জাতীয়তাবাদী পুঁথিপত্র জাতীয়তাবাদী-বিপ্লবীদের হাতের কাছে সামান্যই আছে। কাজেই 'ইডিয়লজিক্যাল ফাইট্' দিতে হলে ঐ কাজের উপযুক্ত প্রবন্ধনিবন্ধপুস্তক ইত্যাদি রচনা করার বিশেষ প্রয়োজন।...

১৯৩৮ সালে 'বি-ভি'র কর্মীরা জেল থেকে মুক্ত হয়ে এ-প্রয়োজন তীব্রভাবে উপলব্ধি করলেন। তাঁরা 'ইডিয়লজি' সংক্রান্ত কিছু পাণ্ডুলিপি তৈয়ের করে দলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ঐসব পুস্তিকা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হবার সুযোগ হতে না-হতেই দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং কর্মীরা পুনরায় বন্দী হন। ইতিমধ্যে কম্যুনিস্ট পার্টির স্বরূপ দেশবাসীর কাছে এমন করেই ব্যক্ত ও প্রকট হয়ে ওঠে যে, তার বিরুদ্ধে কিছু বুঝিয়ে বলারও তেমন প্রয়োজন থাকে না। রাতারাতি সাম্রাজ্যবাদী-শাসক ইংরেজের যুদ্ধ যখন 'জনযুদ্ধ' হয়ে গেল, পুলিশের সহায়করূপে এই পার্টির লোকেরা যখন ইংরেজ-বিরোধী জাতীয়-আন্দোলনের যোদ্ধাদেরকে ( সহিংস ও অহিংস ) পুলিশেরই হাতে ধরিয়ে দিতে লাগল—তখন এদের বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকা কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হলো না।...

* * *

এদিকে ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৪ সাল অবধি পৃথিবী জুড়ে মহাতাণ্ডব বিরচিত

হয়ে গেল। ভারতবর্ষের বুকে তার ভালমন্দের ঢেউ প্রচুর জোয়ার-ভাঁটার চিহ্ন রেখে গেছে। সুভাষচন্দ্রের কর্মকাণ্ড রক্তলিখনে জাতীয়তাবাদের 'ইডিয়লজি' লিখে গেছে।…কিন্তু তথাপি 'বি-ভি' ও শ্রীসংঘের কর্মীরা যখন স্থির করলেন ( জেলে বসে ) যে তাঁদের বিপ্লবীদল ভেঙে তাঁরা 'ফরওয়ার্ড ব্লক্'কেই **পার্টি** রূপে সারা ভারতবর্ষে গড়ে তুলবেন, তখন আগামী দিনের বিপদ অনুধাবন করেই জেলখানায় বসে উক্ত পার্টির 'ইডিয়লজি' লেখায় তাঁরা প্রবৃত্ত হলেন। ঐ মর্মে তাঁরা কিছু সাহিত্য রচনায় মন দিলেন।

জেল থেকে মুক্তিলাভের পর 'ফরওয়ার্ড ব্লক'কে পার্টি রূপে গঠন করা হবে বলেই দলের ছেলেদের জন্যে ও দেশের বুদ্ধিজীবীদের লক্ষ্য করে প্রয়োজনীয় বইপুস্তক নিজেরা লিখে ও জাতির গুণীজ্ঞানী ব্যক্তিদের দিয়ে লিখিয়ে একটি 'কাল্চারেল্ ফ্রন্ট' অর্থাৎ সাংস্কৃতিক-লড়াইয়ের সংস্থা খোলার স্বপ্নে তাঁরা উৎসাহিত হন। জেলখানায় বসে ১৯৪৪ সাল থেকে কিছু বইপত্র তাঁরা লিখে ফেলেছিলেন।…

১৯৪৬ সালে 'বি-ভি' ও শ্রীসংঘে'র কর্মীরা সবাই বেরিয়ে এলেন নানা জেল থেকে। এই সময় ৩২-বি চক্রবেড়িয়া রোড-এ ( ভবানীপুর, কলকাতা ) একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা হল "জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী" নাম দিয়ে। 'প্রকাশনী' পরিচালনার দায়িত্ব পড়ল সুবোধ ঘোষের ওপর। সুবোধের অক্লান্ত চেষ্টায় প্রকাশিত হল অনিল রায়ের 'সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কস্‌বাদ', রসময় শূরের 'সমাজ ও সংস্কৃতি', নিকুঞ্জ সেনের 'ইতিহাসের অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যা' ও 'Idealism —a realistic approach', বিনয় সেনগুপ্তের 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম', সুনীল দাসের 'ভূমি-সমস্যা ও কিষাণ-আন্দোলনের ধারা' এবং অতীন বসুর 'Crossroad of Science And Philosophy' ইত্যাদি পুস্তকের প্রায় সবগুলোই। এদের দু'একখানা বোধ হয় পাণ্ডুলিপি তৈয়ের থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে ছাপা হতে পারে নি।…

'ইডিয়লজি' সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রামাণিক লেখা অনিল রায় লিখেছিলেন লীলা রায় সম্পাদিত 'জয়শ্রী' মাসিকপত্রের বিভিন্ন সংখ্যায়।

বছরখানেকের পরিসরে আরো কয়েকখানা পুস্তক ও পুস্তিকা বের হয় 'সুভাষ

সংস্কৃতি পরিষদ' ( ১৩ নং সার্কাস রো, কলিকাতা-১৭ ) থেকে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :—রসময় শূরের 'মানুষেব দর্শন', জ্যোতিশ জোয়ারদারের 'Dominion Status—or Death Trap ?' ও 'সুভাষবাদ', নিকুঞ্জ সেনের 'নেতাজী ও মার্কসবাদ', অমলেন্দু ঘোষের 'কেন আমি মার্কসবাদী নই ( ? )'।

এ ছাড়া চিত্ত বিশ্বাসের 'নেতাজীর আদর্শ' বেরিয়েছিল 'ফরওয়ার্ড-ব্লক কর্মী-পরিষদ' ( মৈমনসিংহ ) থেকে।...

অমলেন্দু ঘোষের "কেন আমি মার্কস্‌বাদী নই ( ? )" পুস্তকে পার্টির 'ইডিয়লজিক্যাল্ ফ্রন্ট্' সম্পর্কিত মতামতই ব্যক্ত হয়েছে। তাই এ বইখানা সম্বন্ধে 'শনিবারের চিঠি'র ( ভাদ্র, ১৩৬২, পৃঃ ৪৩৮—৪৩৯ ) উক্তি তুলে দিচ্ছি : "...এতাবৎ মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে সকল প্রতিক্রিয়া নিতান্ত বিচ্ছিন্ন আকারে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, সব জড়াইয়া একটি সামগ্রিক সমালোচনার একান্ত অভাব পূরণ করিয়াছেন গ্রন্থকার তাঁহার সংক্ষিপ্ত অথচ যুক্তিপূর্ণ বর্তমান গ্রন্থখানিতে।... প্রথমে লেখক মার্ক্সবাদী দর্শনের ভিত্তি পূর্বজ্ঞেয়বাদের ( Determinism ) আলোচনা করিয়াছেন। জড়বিজ্ঞানের হেতুবাদের (The law of Causation) সহিত পূর্বজ্ঞেয়বাদের বিশেষ যোগ আছে, কিন্তু গ্রন্থকার নব্যবিজ্ঞানের আবিষ্কারাদি আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, হেতুবাদ এক্ষণে আর সর্বমান্য একটি মত নহে, ভিন্নতর মতের সম্মুখে উহা পরিত্যক্ত হইবার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। অতঃপর তিনি দ্বান্দ্বিক জড়বাদের দার্শনিক ভিত্তি পরীক্ষার সূত্রে হ্যা ব্রগ্‌লি, ম্যাক্সবোর্ন, শ্রডিংগার প্রমুখ আধুনিক পরমাণু-বিজ্ঞানীদের মতামত পর্যালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, জড়বাদ এক্ষণে নিছক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আর গ্রাহ্য নহে। তা ছাড়া যে ডায়ালেক্‌টিস্‌ মার্ক্সবাদের প্রধান নির্ভর বলিয়া বলা হয়, জড়বাদের সহিত উহার সম্পর্ক স্বাভাবিক নহে, বরং ভাববাদ-ই উহার প্রকৃত উৎস ও অবলম্বন। মার্ক্সবাদী-পন্থায় শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, পরিবার, জাতীয়তা ও আন্ত-র্জাতিকতা প্রভৃতি মৌলিক বিষয়গুলির কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মেলে না তাহাও লেখক এই গ্রন্থে পর্যালোচনা করিয়াছেন। মোটের উপর গ্রন্থটি যুক্তনিষ্ঠ ও সুলিখিত।.. আলোচনাগুণে বিচারক্রিয়া জটিলতা-সমাচ্ছন্ন হয় নাই। যাঁহারা পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের সঙ্ঘর্ষে দিশাহারা, তাঁহারা এই গ্রন্থে একটি পথনির্দেশ পাইবেন বলিয়া আশা করি।..."

## 'বিয়াল্লিশের কথায়

এবার ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে ফিরে যাবো। গান্ধীজি 'কুইট্‌ ইণ্ডিয়া' এবং 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' মন্ত্র উচ্চারণ করে জেলে বন্দী হলেন। কংগ্রেসের নেতারা সবাই কারাগৃহে। নেতাদেরকে এবার ছাড়িয়ে গেল নেতাদের প্রবর্তিত 'আন্দোলন'।

এ আন্দোলনেও 'বি-ভি'র কর্মীরা রক্তদান করেছিলেন ঢাকাশহরে।...

১৫ই আগস্ট। 'বিভি', 'আর-এস্‌পি' এবং অন্যান্য বিপ্লবীদলের কর্মীদের নেতৃত্বে সমবেত হয়েছে বিপুল জনতা ঢাকার জেনারেল পোস্ট আপিসের সম্মুখে।

...জনতা ঘন ঘন 'ভারত ছাড়' হুঙ্কার দিতে শুরু করেছে। সে-ধ্বনি ভয়ঙ্কর। বিরাট জনতা ক্রমশ এগিয়ে আসে কোর্টের কাছে। কোর্ট পার হয়ে মিছিল এগিয়ে চলে ইংলিশ্‌ রোড ধরে নয়াবাজারের দিকে। তাঁতিবাজারের মোড়ে মিছিলটি আসতেই সঙ্গে আগত আর্মড্‌ 'পুলিশবাহিনী'র উপর ইটপাটকেল ছোড়ে ক্ষিপ্ত জনতার মধ্য থেকে কেউ।...সঙ্গে সঙ্গে 'ব্ল্যাঙ্ক্‌ ফায়ার্‌' কয়েকটি।.. জনতা এবার উন্মাদ।...রাস্তার পাশের দোতলা বাড়িগুলোর উপর থেকে ইষ্টকবৃষ্টি শুরু হল।...প্রচণ্ড সে সঙ্ঘর্ষ ইংলিশ রোড্‌ ও তাঁতিবাজার ক্রসিং-এ। অকস্মাৎ গর্জে উঠল পুলিশের রাইফেল। ধূলায় গড়িয়ে পড়লেন দুটি যুদ্ধরত তরুণ।...

হৃষীকেশ সাহা

'বি-ভি'র এই কিশোর বিপ্লবী **হৃষীকেশ সাহা** এবং তাঁর সঙ্গী আর্‌-এস-পি'র কর্মী **বিপুল বসাক** আপন জীবন দান করে প্রমাণ করে গেলেন যে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' বিপ্লবীর কাছে বড়ই পরিচিত বাণী।

কিন্তু দেশবাসীর রক্তগঙ্গাবিধৌত এই যে 'আগস্ট-বিদ্রোহ'—এ মান পেল না মহাত্মার কাছে। জেল থেকে বেরিয়ে এসেই তাঁর প্রধান কাজ হলো 'আগস্ট বিদ্রোহ'কে অস্বীকার করা!···এ যে তাঁকে করতেই হবে। নচেৎ ইংরেজের দরবারে তাঁর মান থাকবে না, যদি 'অহিংসা'র প্রতি কংগ্রেসী-আনুগত্য একটুও পান্‌সে হয়।···

যাক্ 'আগস্ট-বিদ্রোহ' তো দূরের কথা, নেতাজির বাহিনীও ইম্ফল অতিক্রম করে বাংলায় ঢুকতে পারে নি। জয়ী হয়ে গেছে ভারতের স্বাধীনতার শত্রু ইংরেজ। জয়ী হয়ে গেছে য়্যাংলো-এ্যামেরিকান্ সাম্রাজ্যবাদ!··

## 'বি-ভি' গুপ্ত-সমিতির স্বেচ্ছাবিলয়ন এবং ফরওয়ার্ড-ব্লক-পার্টি গঠনের চেষ্টা

জেলে অবরুদ্ধ 'বি-ভি'র কর্মী ও নেতৃবৃন্দ এ বিফলতায় হতাশ হলেন না। হেমচন্দ্রের সকল বন্ধুরা ('বি-ভি' ও শ্রীসঙ্ঘ) বিশ্বাস করতেন যে, নেতাজির আবদ্ধ কর্ম মৃত্যুহীন। তাঁরা তাই ১৯৪৩-'৪৪ সনে স্থির করলেন যে, নেতাজির সহযাত্রী সর্বভারতীয় যেসব দল 'ফরওয়ার্ড-ব্লকে' কাজ করছে, তাদের সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করে নেতাজিরই আদর্শে ঐ 'ফরওয়ার্ড-ব্লক'কে সমগ্র ভারতবর্ষের পরিসীমায় বিরাট এক পার্টি রূপে গড়ে তুলতে হবে। এই পার্টি এগিয়ে চলবে সম্মুখের দিকে। তার অসত্যের সঙ্গে আপোষ থাকবে না। তার একমাত্র লক্ষ্য সেই স্বাধীনতা, যেখানে মানুষ খেয়ে-পরে মান বাঁচিয়ে 'মানুষের জীবন' যাপন করতে পারবে। কিন্তু নেতাজির এই অসমাপ্ত কর্ম সমাপ্ত করার চেষ্টা উল্লিখিত ধরণের বিপুল একটি 'পার্টি' ব্যতীত অপর কারো দ্বারা হতে পারে না। অজস্র গ্রূপে বিভক্ত বিপ্লবীদের সাধ্য নেই পূর্ব টেক্‌নিকে একটুও এগিয়ে যাবার। কাজেই হেমচন্দ্রের বন্ধুগণ জেলে ও জেলের বাইরে অবস্থিত তাঁদের কর্মীদের জানিয়ে স্থির করলেন একটি বস্তু। তাঁরা মনে করলেন যে, 'বি-ভি'র স্বপ্ন ও কর্মাদর্শ চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে নেতাজি-বিরচিত মহাবিপ্লব-নাট্যে। এ-নাটকের পরিণতি বিধাতার 'অমোঘ-নির্দেশ' হয়ে ভারতের যথার্থ স্বাধীনতা সত্যি এনে দিতো, যদি আগস্ট-বিপ্লবের ধারা আজাদ-হিন্দের প্রবল বন্যার সঙ্গে যথাকালে মিলিত হতে পারতো! কিন্তু অতীতে যা হতে পারতো, ভবিষ্যতে

তাকে 'হওয়াতে হবে'—বিপ্লবীর চিত্তে সকল হতাশার মধ্যেও এই সঙ্কল্প অটুট থাকে। তাই বিপ্লবীর মৃত্যু নেই।...

'বি-ভি' ও শ্রীসঙ্ঘের বন্ধুবা স্থির করলেন যে, তাঁরা 'বিপ্লবী গুপ্ত-সমিতি' বিলুপ্ত করে দেবেন। এবং, 'বি-ভি'র নিয়মানুবর্তিতায় সাবা ভারতবর্ষে নেতাজিব আদর্শে ও কর্মচ্ছন্দে 'ফরওয়ার্ড্ ব্লক্'কে একটি সংগ্রামী পার্টিরূপে গড়ে তুলবেন। দল-উপদলেব মোহ ত্যাগ কবে শুধু উক্ত পার্টিকেই ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক কর্মী সর্বান্নগত্য না দিলে বড পার্টি দাঁড়াতে পারে না। উহা 'প্ল্যাটফর্মে'র অধিক মর্য্যাদা লাভে বঞ্চিত হয়। সেইজন্যে হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম 'বি-ভি'র কর্মীরাই বক্সাক্যাম্পে সমবেত হয়ে তাঁদের দল তথা গুপ্ত-সমিতি ভেঙে দিলেন। তৎপর সে-সমাবেশেই প্রত্যেক সভ্য আলাদাভাবে এফ্-বি পার্টিব আনুগত্য স্বীকার করে উহার মত-চুম্বক ও শপথ গ্রহণ করলেন।...এই 'এফ-বি' পার্টি গড়ার চেষ্টা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাংলাব বিভিন্ন বিপ্লবী দলের অবরুদ্ধ যেসব নেতৃবৃন্দ এই 'এফ-বি পার্টি' গড়ার চেষ্টাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে জেলখানাতেই কর্মরত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হেমচন্দ্র ঘোষ, লীলা রায়, অনিল রায়, পূর্ণ দাস, সত্য গুপ্ত, অমলেন্দু দাসগুপ্ত, মিহির মোতায়েদ, দ্বিজেন দাস, সুরেন সরকার, দেবেন দে, পান্না মিত্র, আস্রাফ্উদ্দিন চৌধুবী, হরেন ঘোষ, রসময় শূব, ভবেশ নন্দী, ভূপেন রক্ষিত-রায়, পঞ্চানন চক্রবর্তী, ফণী মজুমদার, যতীন ভট্টাচার্য, রাখাল দত্ত (স্বর্গগত) প্রমুখের উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য।...

১৯৪৬ সালের শুরুতেই বিপ্লবী-বন্দীরা মুক্তি পেতে লাগলেন। গোটা ভারতবর্ষ তখন নেতাজির স্বপ্নে বিভোর। এতকালের জ্বালা ও বেদনা যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বিপ্লবের মহাসম্রাট ঐ মহামানবকে ফিরে পাবার আশায়।

নেতাজির মৃত্যুসংবাদ একটি প্রাণীও বিশ্বাস করে নি। তাঁর আবির্ভাব-কামনায় মানুষের চোখদু'টো আশ্বাসে ও আনন্দে চকচক্ করে উঠতো। তাই নেতাজির সহকর্মীদের (ফরওয়ার্ড্ ব্লকের মাধ্যমে) ফিরে পেয়ে সারা বাংলা ভবসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে গেল।

'বি-ভি' ও শ্রীসঙ্ঘের নেতৃস্থানীয় কর্মীরা তখনো অধিকাংশই জেলে। তাঁদেব

মধ্যে যাঁরা বেরিয়ে এসেছেন তাঁরা 'এফ-বি' পার্টি গড়ার পটভূমি রচনায় মেতে উঠলেন। কলকাতায় শৈলেন নিয়োগী, সুবোধ ঘোষ, কিরণ মিত্র, সাধন নিয়োগী, নীতিশ গুহ প্রমুখ কর্মীরা কাজে লেগে গেলেন। ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল রজনী দাসের সভাপতিত্বে একটি সংস্থা ( 'এফ-বি' তখনো সরকার দ্বারা 'ব্যান্ড্' বা নিষিদ্ধ ) গড়ে সুকুমার ঘোষ, উজ্জ্বলা মজুমদার, শৈল সেন, নীহার গুহ (উকিল) উপেন চৌধুরী, নির্মল চৌধুরী, সমর গুহ, সাগরিকা ঘোষ, প্রমুখ বিপ্লবী কর্মীরা পরম উৎসাহে কর্মব্রতী হলেন।

এই কর্মীদের মধ্যে সুকুমার ঘোষ ( লাণ্টু ঘোষ ), উজ্জ্বলা মজুমদার ও শৈল সেন ঢাকা ও মৈমনসিংহ জিলার নানা অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে নেতাজির কীর্তিকাহিনী প্রচার করেন। তা'ছাড়া তাঁরা বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনা করে ভাবী 'ফরওয়ার্ড ব্লক পার্টি' গঠনের পূর্বাভাসও দিয়ে আসেন। তাঁদেরকে ঘিরে দেশবাসী সেদিন বিপুল উৎসাহে বহু সভাসমিতির মাধ্যমে একটি উৎসব রচনা করে। সে-উৎসবের সকল রন্ধ্রে শুধু অটুট আশা যে, এই মানুষগুলোর পেছনে আছেন নেতাজি, এবং নেতাজির আবির্ভাবের আর দেরি নেই!…এ ছাড়া মৈমনসিংহেও কিশোর কর্মীরা ঢাকার নেতাদের নির্দেশে ( তখনো মৈমনসিংহের নেতৃস্থানীয় কেউ জেলের বাইরে আসেন নি ) সুন্দর করে কাজের পরিবেশ গড়ে তুলেছেন। এই কর্মীদের অন্যতম হলেন পীযূষ-নীহার-বিশ্বজিত-পানু-অরুণাংশু-অমর-মাখন-কান্তি-প্রিয় কুণ্ডু ও বেলা-মনিকা-অনীতা-প্রতিভা-মায়া দাসগুপ্তা এবং আরো অনেকে।…জ্যোতিশ জোয়ারদারের সহকর্মী গোয়াতলার ডাঃ কুমুদ সরকার বহু পূর্বেই ২৪-পরগণায় চলে গেছেন নতুনতর কর্মস্থল সৃষ্টি করার তাগিদে। কাজেই তৎকালে মৈমনসিংহে তিনিও অনুপস্থিত।…

ঢাকায় বীরেন পোদ্দার কিছু পূর্ব থেকেই কংগ্রেসে ঢুকে কাজের সুবিধা করে ফেলেছিলেন। তাঁর সঙ্গে বীরেন দে, অসিত ঘোষ প্রমুখ কর্মীরা পরম উৎসাহে কংগ্রেস-পলিটিক্সে যুক্ত হলেন।…বীরেন পোদ্দার আজ আর ইহজগতে নেই। সাহসে, বুদ্ধিতে ও সংগঠন-ক্ষমতায় বীরেন পোদ্দার প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী কর্মী ছিলেন বললে অত্যুক্তি হবে না।…

* * * *

তারপর একদিন কলকাতায় উদযাপিত **ভিয়েৎনাম দিবসের** সমর্থনে

মৈমনসিংহ শহরে বিরাট এক শোভাযাত্রা শহরের রাস্তা পরিক্রমণ করে। শোভাযাত্রা পরিচালিত করেন জ্যোতিশ জোয়ারদারের কিশোর ছাত্রবন্ধুরা। সহসা পুলিশের সঙ্গে সঙ্ঘষ ঘটে। পুলিশের গুলীতে অধুনালুপ্ত বি-ভির কর্মী **অমলেন্দু ঘোষ** (খোকন) মৃত্যুকে বরণ করে শহিদ হন। **অনিতা বসু** গুলির আঘাতে আহত হলেন, এবং আরো আহত হলেন পুলিশেরই গুলীতে, ছাত্র লক্ষ্মী দাস ও মণ্টু সেন। এতে মৈমনসিংহ শহরে যুব-সমাজের বুকে আগুন জ্বলে উঠল। তখন নেতারা সবাই জেলের বাইরে। জ্যোতিশ জোয়ারদারের কুশল নেতৃত্বে ও বিমল নন্দীর নিখুঁত সহকারিতায় ক্রমশ বিরাট স্বেচ্ছাসৈনিক-বাহিনী (আজাদ হিন্দ ভলান্টিয়ার্স) ঢাকা, মৈমনসিংহ ও কুমিল্লায় ফরওয়ার্ড্ ব্লকের নামে সংগঠিত হতে থাকলো। বাহিনীর নিয়মানুবর্তিতা ও সামরিক কায়দায় চলাফেরা ঢাকা, মৈমনসিংহ, কুমিল্লার মানুষকে মুগ্ধ করেছিল।...

এই বাহিনীরই একটি সৈনিক জাতীয়-পতাকা রক্ষার্থে ঢাকা-মৈমনসিংহ লাইনে চলন্ত ট্রেনে আত্মদান করে বাহিনীর সম্মান রক্তস্বাক্ষরে রেখে গেছেন। তাঁর নাম **শচীন কর**।...ঐ বছরেরই শেষের দিকে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রায় এগার হাজার স্বেচ্ছাসৈনিক সমবেত করে জ্যোতিশ জোয়ারদার এক রাষ্ট্রনৈতিক-সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন শরৎচন্দ্র বসুর সভানেতৃত্বে। সে সম্মেলন উপলক্ষ্যে হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর অপূর্ব কুচকাওয়াজ দেখে শহরবাসী ভেবেছিল—দিন আগত ঐ! শুভ-মুক্তি সমাগত!...

ফরওয়ার্ড্ ব্লকের সংঘশক্তি তখন ঢাকা, মৈমনসিংহ ও কুমিল্লায় খুবই জমাট বেঁধেছে।..কিন্তু রাজনীতি—বিশেষ করে শাস্ত পরিবেশের রাজনীতি—বড়ই অদ্ভুত। ফরওয়ার্ড ব্লকের জনপ্রিয়তা দেখে বহু সুবিধাবাদী এ-প্রতিষ্ঠানে ঢুকে যাচ্ছিল। তা'ছাড়া কম্যুনিস্ট-ঘেঁষা সভ্যদের সংখ্যাও প্রতিষ্ঠানের সর্বভারতীয় শাখা-উপশাখায় বিস্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলল। ফলে আদর্শগত মতবিভেদের জন্যেই ফরওয়ার্ড ব্লকের 'পার্টি' হয়ে-ওঠা আর সম্ভব হলো না। দল-উপদলে জর্জরিত প্ল্যাটফর্ম রূপী এফ্-বির ভবিষ্যৎ অন্ধকার অনুভব করে শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় Socialist Republican Party নাম দিয়ে আই-এন্-এ প্রত্যাগতদের কিয়দংশ সঙ্গে নিয়ে নতুন একটি সর্বভারতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠিত করলেন।

*    *    *    *

হেমচন্দ্র ময়মনসিংহ-কনফারেন্স থেকে কলকাতায় ফিরে এসে তাঁর বন্ধুদের অনেকাংশ নিয়ে এস্-আর-পিতে যোগ দিলেন।...কিন্তু এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, হঠাৎ এভাবে ফরওয়ার্ড-ব্লক ছেড়ে দেওয়াতে বিশেষ করে মৈমনসিংহ ও ঢাকাতে হেমচন্দ্রের বন্ধুবান্ধবদের সংগঠন-কাজ প্রচুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ক্ষতি কোনদিন পূরণ হয় নি।...

লীলাদেবী ও অনিলবাবুরা তৎকালে ফরওয়ার্ড-ব্লক ছাড়েন নি।...

আধুনালুপ্ত বিপ্লবী বি-ভি দলের প্রাক্তন কর্মীদের বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক-কার্যকলাপ তাঁদেরই নিজস্ব ও ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার সঙ্গে অতীতের গুপ্ত 'বি-ভি' পার্টির যে কোন সম্পর্কে থাকতে পারে না তা' কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। **অতীতের 'বি-ভি' একটি 'সংগ্রামী আদর্শবাদ'রূপে মৃত্যুহীন সত্তায় অবশ্য বেঁচে আছে, এবং চিরকাল বেঁচে থাকবে।** যে নিয়মানুবর্তিতা, সঙ্ঘশক্তি, ত্যাগ, দুঃসাহস, আত্মবিলয়ন ও মন্ত্রগুপ্তি শিক্ষার সমন্বিত সাধনায় **বি-ভি দল 'মানুষ' হয়ে ওঠার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে গেছে তা' মূর্তি ধরে রয়েছে শহিদকুলের দিব্য বিভায়। সেই আদর্শ কোন ব্যক্তি বা দল বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে আর নেই। সে আদর্শ আজ সর্বকালের, সর্বজনের, সর্বদেশের।**...

*    *    *    *

বি-ভি ও হেমচন্দ্রের বন্ধুগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড আখ্যানের মত। আমরা সেসব কাহিনী পরে শোনাবো।*

***মুক্তিসঙ্ঘ** সম্পর্কে প্রতিষ্ঠাতা-সভ্যদের বক্তব্য 'পত্র-সংগ্রহে'র ছয় নং পত্রে দ্রষ্টব্য।

**॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥**

# পত্র-সংগ্রহ

## ( এক নং )

## শ্রীহরিদাস দত্তের পত্র

[ শ্রী হবিদাস দত্ত বাঙলাদেশেব প্রখ্যাত বিপ্লবী-নেতা। 'রডা-অস্ত্র-লুণ্ঠনে'ব ব্যাপারে তিনি গভীর দায়িত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেন। প্রত্যক্ষভাবে 'রডা'-ম্যাকশানে জড়িত বিপ্লবীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই আজ বেঁচে আছেন। তাঁব 'রডা-ষড়যন্ত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা'ব কথা গ্রন্থকাবের কাছে লিখিত নিম্নোক্ত পত্রে আছে বলেই উহা উদ্ধৃত।]

...তোমার পত্রের উত্তরে 'সাপ্তাহিক বসুমতী' পত্রিকায় লিখিত আমার প্রবন্ধের যথাপ্রয়োজন অংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

'রডা-অস্ত্র-লুণ্ঠন' ঘটনাটি সম্পর্কে নানারকম গল্প শোনা যায়। কোন গল্পটি ঠিক এবং কোনটি বেঠিক তাহা সাধারণ পাঠকের বোঝা মুস্কিল। পুলিশ রিপোর্ট বা ষড়যন্ত্র মামলার রিপোর্ট হইতে ঘটনার কিছু খবর পাওয়া যায়, আর বাকিটা পাওয়া যায় শোনা গল্প হইতে। সরকারী রিপোর্টে সন-তারিখ বা সরকারের জানা ( তাহা ভুলও হইতে পারে ) তথ্য পাওয়া যাইবে, কিন্তু শোনা গল্প নানা মুখে নানারকম হইতে বাধ্য। যাঁহারা সত্যি হাতেনাতে এই কাজটি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কোনো কথা আজ পযন্ত বলেন নাই বলিয়াই এই বিষয়ে ঐতিহাসিক-সত্য দেশবাসী জানেন নাই। রডা-ষড়যন্ত্রে যেইটুকু পুলিশ জানে তাহার চেয়ে তাহারা যাহা জানে না তাহার গুরুত্ব কম নহে।

দেশ স্বাধীন হইবার পর আমি অনেক সময় ভাবিয়াছি যে 'রডা' সম্পর্কে সঠিক সংবাদ দেশবাসীকে জানাইলে ভাল হয়। অল্প কিছুদিন হয় 'রডা ষড়যন্ত্র' সম্পর্কে সকল তথ্য সংগ্রহ করিবার উদ্দেশে সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আমার নিকট আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে যথাসম্ভব সমস্ত সংবাদ দিয়াছি। অধিকন্তু রঙপুরে যাঁহার নিকট শ্রীশ মিত্র (হাবু) পলাতক অবস্থায় ছিলেন এবং যাঁহার মারফৎ গোয়ালপাড়ায় ( আসাম ) 'রাভা' নামক পার্বত্য-জাতীয় বন্ধুদের সাহায্যে তিনি আসাম-সীমান্ত পার হইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার সঙ্গে পত্রে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগও আমি সত্যেন্দ্রনাথকে করিয়া দিয়াছি। সত্যেনবাবুর পূর্বে ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়কে আমি রডা-ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কিছু লেখার জন্য যাবতীয়.

তথ্য দেই। ভূপেনবাবু প্রধানত আমার দেওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই রডা action-এর যে-অধ্যায় আজও লোকচক্ষুর অগোচরে রহিয়াছে তাহা প্রবন্ধাকারে লিখিয়া তাহার পাণ্ডুলিপি আমাকে দেখান। আমি তাহা ভাল করিয়া পড়িয়া দিবার পরই তিনি সেই লেখা প্রকাশ করিয়াছেন। স্মৃতিশক্তি মাঝে মাঝে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে জানি। কিন্তু রডা-ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা আমার রক্তের সঙ্গে এমন ভাবেই জড়াইয়া আছে এবং এই ঘটনার কথা আমাদের নিজেদের ( যাঁহারা action-এ ছিলেন ) মধ্যে এতই আলোচিত হইয়াছে যে, স্মৃতির এখানে বিশ্বাস-ঘাতকতা না করারই কথা। কাজেই আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ভূপেনবাবুর 'রডা ষড়যন্ত্র' প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক তথ্যে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য।··

কিন্তু কেহ কেহ উক্ত প্রবন্ধ সম্পর্কে দুইচারিটি প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন বলিয়া 'সাপ্তাহিক বসুমতী'-র মাধ্যমে তাহার উত্তর আমি দিয়াছি।

এখানে তাহারই মর্ম পুনরায় লিখিলাম।

(১) কেহ বলেন যে স্বর্গীয় কালিদাস বসু নাকি রডা-ষড়যন্ত্রের 'Brain' ছিলেন। কিন্তু সেই ধারণা অত্যন্ত ভুল।

"কালিদাস বসু আমারও অন্তরঙ্গ সতীর্থ। তৎকালে উভয়ে মৃত্যুপথের সহযাত্রী ছিলাম। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে ভূপেনবাবুর প্রবন্ধের সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতেন। তিনি পরম শ্রদ্ধায় স্বীকার করিতেন যে, রডা-ষড়যন্ত্রের তথাকথিত 'brain' বলিয়া কিছু থাকিলে ঐ শ্রীশচন্দ্র পাল মহাশয়ের নামই করিতে হয়। শ্রীশচন্দ্র পাল ১৯০৮ সালে সার্পেণ্টাইন লেনে নন্দলাল ব্যানার্জিকে হত্যা করিয়া গা-ঢাকা দেন। তাহার পর ১৯১০ সালে ঢাকায় 'শুভাঢ্যা'-ডাকাতির পর নাম বদলাইয়া পলাতক রূপে বৈপ্লবিক-জীবন কাটাইতে থাকেন।' তাঁহার ছদ্মনাম তখন 'নরেন দত্ত'। তিনি সবারই অজ্ঞাত ছিলেন। কেবল সকল দলেরই নেতৃস্থানীয়রা তাঁহাকে জানিতেন এবং গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করিতেন। আমার জীবনে নেতৃস্থানীয় সাহসী ও কুশলী বিপ্লবী কম দেখি নাই—কিন্তু শ্রীশ পাল মহাশয়ের তুলনা নাই!···

"(২) একজনের খবর—'ষড়যন্ত্র-সভা' নাকি বসিয়াছিল গিরীনবাবুর বাড়িতে ( ৪-৩, মলঙ্গা লেনে )। ...কিন্তু ঐ ব্যক্তি জানেন না যে তৎকালে ররার্ট-ওব্রাইন হত্যার ষড়যন্ত্রের ( ১৯১২ ) পর গিরীনবাবুর বাড়ি ( ৪-৩ মলঙ্গা লেন ) এবং বিপিনবাবু, অনুকুলবাবু, হরিশবাবু প্রমুখ 'আত্মোন্নতি'-র নেতাদের বাড়িগুলি

পুলিশ সার্চ করে এবং তাহার পর হইতে ঐ বাড়িগুলির উপর অল্পবিস্তর নজর রাখে। সুতরাং গিরীনবাবুর বাড়ি অর্থাৎ ৪-৩ নং মলঙ্গা লেনে কোনো ষড়যন্ত্রের সভা অন্তত সেই সব লোক করিতে পারেন না, যাঁহারা কোনো 'ষড়যন্ত্র' হাতেনাতে করিতে চান।

"ভূপেনবাবুর কথাই ঠিক। আমাদের গুপ্ত-বৈঠক ছাতাওয়ালা গলির পার্ক-এ বসে। সে সভায় কারা ছিলেন তা ভূপেনবাবুর প্রবন্ধে আছে। আমি নিজে সেখানে ছিলাম। নরেন ভট্টাচায ( মানবেন্দ্র রায় ) ও নরেন ঘোষচৌধুরী মহাশয়দ্বয় এই প্ল্যান কাযকরী করা অসম্ভব বিবেচনায় বৈঠক ত্যাগ করেন। তখন তাঁহাদের বাদ দিয়াই উপস্থিত শ্রীশ পাল, অনুকুল মুখার্জি, আশুতোষ রায়, হাবু মিত্র (শ্রীশ), খগেন দাস, সুরেশ চক্রবর্তী, জগৎ ও বিমান এবং লেখক ( হরিদাস দত্ত ) পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন। তাহার পর বৈঠক ভাঙ্গিয়া যায় এবং পরিকল্পনাটিকে কিভাবে রূপ দেওয়া হইবে তাহা স্থির করার জন্য ঐদিন রাত্রেই হাবু মিত্রের গৃহে দ্বিতীয় বৈঠক বসে। এই বৈঠকে ছিলেন অনুকূলবাবু, হাবু মিত্র, শ্রীশ পাল, খগেন দাস ও লেখক ( হরিদাস দত্ত )। এখানে আবারও বলি যে, পুলিশের জানিত গৃহে ( ৪-৩, মলঙ্গা লেনে ) অত বড় একটা ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আলোচনার জন্য শ্রীশ পালের মত একজন পলাতক বিপ্লবীসহ আমরা উপস্থিত হইব ইহা সম্ভব নয়। অধিকন্তু আমি এবং খগেন দাসও 'ওব্রাইন-ষড়যন্ত্র' ব্যাপারের পর পলাতক ছিলাম। কাজেই আমরাও সে-বাড়িতে যাইতে পারি না। তাই পার্ক-এর সভা ভাঙিবার অব্যবহিত পর আমরা হাবু মিত্রের বাড়িতেই দ্বিতীয় বৈঠক বসাইয়াছিলাম।

"সমালোচকের অবগতির জন্য লিখিতেছি যে, কালিদাসবাবু উল্লিখিত কোনো সভাতেই উপস্থিত ছিলেন না। সভায় উপস্থিত ছিলেন তিনটি দলের প্রতিনিধিগণ এবং direct action-এ যাঁহারা শরিক হইবেন তাঁহারা। 'আত্মোন্নতি'র প্রতিনিধি ছিলেন অনুকুলবাবু এবং আত্মোন্নতির হাবুবাবু হবেন direct action-এর direct শরিক। কাজেই উক্ত সভায় কালিদাসবাবুর আসার প্রয়োজন হয় নি। ঠিক এই কারণেই বিপিনবাবু, গিরীনবাবু প্রমুখ কোনো নেতারই এ-বৈঠকে উপস্থিত হবার প্রয়োজন হয় নি। নরেন্দ্র ব্যানার্জির কথা তো আসেই না। কারণ, তখন তাঁর বয়স শুধু খুব অল্প নয়, তিনি দলেও ঢুকিয়াছেন সবেমাত্র। তাঁহার কিছুই জানিবার কথা নয়।

"(৩) সমালোচক বলিয়াছেন যে, 'যতীন মুখার্জি, হেমচন্দ্র ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র শিকদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এ পরিকল্পনার সংস্পর্শে আসেন নি। তাঁরা এ কথা জেনে থাকবেন পরে।' এখানে উল্লেখযোগ্য যে কোনো দলের প্রতিনিধিই দলের নেতার অনুমতি ছাড়া 'ষড়যন্ত্র সভায়' আসিতে পারেন না। ইহা বিপ্লবীদলের পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ। সুতরাং মানবেন্দ্র রায় বা নরেন ঘোষচৌধুরী যেমন কখনো যতীন মুখার্জিকে না জানাইয়া এ সভায় আসিতে পারেন না, তেমনি অনুকূলবাবু এবং হাবু মিত্রও হরিশবাবু-বিপিনবাবু-গিরীনবাবুদেরকে এবং শ্রীশ পাল ও হরিদাস দত্ত প্রমুখও হেমচন্দ্র ঘোষকে না জানাইয়া ঐ সভায় যোগ দিতে পারেন না।

যতীনদা-হেমদা-বিপিনদা প্রমুখ নেতারা পূর্বাহ্নেই 'পলিসি' সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, এবং details-এর সর্বদায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন বিশ্বস্ততম কর্মীদের উপর—সেখানে নাক গলাইতে যান নাই।

"(৪) গরুর গাড়ি অনুকূলবাবুই যোগাড় করিয়াছিলেন। সমালোচক এ-কাজটির গুরুত্ব দেন নাই মনে হইতেছে। কিন্তু আমাদের কাছে ইহার গুরুত্ব ছিল খুবই। ঐ গরুর গাড়ি যোগাড় না হইলে 'রডা'র মাল সরান যাইত না। কাজেই 'অনুকূলবাবু ঘটা করে কোনো গরুর গাড়ি যোগাড় করেন নি' —এই বাক্যটি দ্বারা সমালোচক কোথায় আঘাত করিতে চাহিতেছেন তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

"সমালোচক ইহার পরই লিখিয়াছেন: "শ্রদ্ধেয় হরিদাসবাবু সেই গাড়ি চালান নি। এমন হতে পারে যে, তিনি গাড়োয়ান সেজে সঙ্গে ছিলেন।"

"আমি ঐ সমালোচককে দোষ দেই না। কারণ, শোনা-গল্প এই রকমই হয়। আমি সঠিক ঘটনা বলিতেছি, যাহা সবার অলক্ষ্যেই ঘটিয়াছিল :—

"'রডা' অফিস থেকে সাতখানা গাড়ি (গরু এবং মহিষের) সহ হাবু মিত্র গেলেন মাল খালাস করিয়া আনিবার জন্য। সবপশ্চাতের গরুর গাড়ির (অনুকূলবাবুর সংগৃহীত) গাড়োয়ান ছিলাম ছদ্মবেশী আমি। ছয়টা গাড়ির মাল বোঝাই হইবার পর শেষের গাড়িতে হাবুবাবুর নির্দেশে আমাদের প্রার্থিত মালের বাক্সগুলি তোলা হইল। ইহার পর কিভাবে কখন আমরা গাড়ি নিয়া মলঙ্গা লেনে পৌছাইলাম এবং মালগুলি অতি অল্প সময়ে কিভাবে কোথায় নীত হইল তাহা ভূপেনবাবুর প্রবন্ধে সঠিক বর্ণিত হইয়াছে।

"এখন কথা হইল যে ঐ 'আব্দুল দোসাদ' আসে কোথা হইতে? কেস্-এ

এবং পুলিশ-রিপোর্টে এই দোসাদ মিঞার আমরা দেখা পাই বলিয়াই অনেকের ধারণা যে, দোসাদের গাড়িতেই বুঝি আমরা মাল সরাইয়াছিলাম।

"পুলিশ ধারণাই করিতে পারে নাই যে, বিপ্লবীরা গাড়ি আনিয়া, গাড়োয়ান সাজিয়া, 'র া'র কবল হইতে মাল তুলিয়া লইয়া যাইতে পাবে। উহারা স্থির করিয়া নিয়াছিল যে, ঐ গাডোয়ানগুলির সাহায্যেই ঐ কাজ হইয়াছে। দোসাদকে পুলিশ পয়স দিয়া ও ভয় দেখাইয়া 'সাক্ষী' বানাইয়া লয়। এবং, দোসাদ পুলিশের শিখান কথামত কোর্টেও বলে যে, তার গাডিতেই অপহৃত মাল হাবুবাবুর নির্দেশে মলঙ্গা লেন-এ আসে।

"দোসাদকে পুলিশ মলঙ্গা লেনের জানিত বাড়িগুলি সার্চ করার সময় সঙ্গে নিয়া আসে। গিরীনবাবুর বাড়ি ( ৪।৩ মলঙ্গা লেন ) সার্চ করিতে গিয়া গিরীন-বাবুর আত্মীয় ও প্রতিবেশী নরেন ব্যানার্জিকে পাওয়া যায়। দোসাদ স্বাস্থ্যবান কিশোর নরেনকে দেখিয়াই আন্দাজে সনাক্ত করে যে ঐ কিশোর-ও গাডির সঙ্গে ছিলেন। অথচ action-এর গাড়িতো দূরের কথা, এ বেচারা এ সম্পর্কে কোনো কিছুই জানিতেন না। সবার জ্ঞাতসারে 'দোসাদ গাডোয়ান'টি তাই পুলিশের রিপোর্টে ও মামলার রেকর্ডে বাঁচিয়া রহিল। আর সবার অলক্ষ্যে 'ইতিহাস' হইয়া রহিল অনুকূলবাবুর গরুর গাড়ি, ঐ গাডির গাডোয়ান হরিদাস দত্ত, মাল-বোঝাই হরিদাস দত্তের গাডির সঙ্গে সকল বিপদ বরণ করিয়া সশস্ত্র শ্রীশ পাল ও খগেন দাসদের মলঙ্গা লেন পযন্ত আসার ঘটনা। তারপর 'আত্মোন্নতি' দলের মারফতে সমস্ত মালপত্র ( বাঁশতলা লেনের গুদাম হইতে শুধু অর্ধেক পরিমাণ কার্তুজ পুলিশ পরে আবিষ্কার করিলেও ) 'যুগান্তর', 'আত্মোন্নতি', 'মুক্তি সঙ্ঘ' ও অনুশীলন সমিতি প্রমুখ বিপ্লবী-প্রতিষ্ঠানের নানা আড্ডায় সরবরাহ কার্য-ও সবার অলক্ষ্যেই সংঘটিত ঘটনা।

"রডা ষড়যন্ত্রের বৈশিষ্ট্যই হইল যে এক হাবু মিত্রকে ছাড়া direct action-এর সঙ্গে আর কাহাকেও জড়াইবার মত প্রমাণ, এমন কি সংবাদও পুলিশের সেদিন জানা ছিল না। হাবু মিত্রকে খুঁজিয়া বাহির করা গেল না বলিয়াই 'রডা-ষড়যন্ত্র-মামলা' ফাঁসিয়া গেল। হরিদাস দত্ত ও নরেন ব্যানার্জিদের সাজা-ও তাই দুই-এক বছরের বেশি হইল না।

"সুতরাং পুলিশ রিপোর্ট বা কোর্ট প্রসিডিংস্ হইতে 'ষড়যন্ত্রের ইতিহাস' কিছুই

জানিবার উপায় নাই। বিপ্লবীদের কর্মদক্ষতা ও মন্ত্রগুপ্তি-শিক্ষার প্রকৃষ্ট নজির 'রডা-ষড়যন্ত্র' ও 'বজা-ঝ্যাকশান্' দিয়া গিয়াছে।

(৫) "সমালোচক লিখিয়াছেন, 'রডা'র মালপত্র 'Crown shed' থেকে খালাস করা হয়। আমি জানি-না কোন্ মালের কথা তিনি লিখিয়াছেন।

(৬) "রডা-কোম্পানী বস্তুতই পূর্বে যেখানে ছিল আজও সেখানেই আছে। পূর্বে ওয়েলস্লি প্লেসের দিকে তার দরজা ছিল কিনা আমার মনে নাই। তবে সদর দরজা তৎকালে 'ভ্যানসিটার্ট রো' নামক রাস্তার দিকেই ছিল বলিয়া সেই পথের নাম ভূপেনবাবু উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে ত্রুটি কিছু হয় নাই।

(৭) "সমালোচক আমাদের জানাইতেছেন যে, 'দোসাদ নামক গডোয়ানের গাড়িতে একটি বড় প্যাকিং-কেসে শক্ত করে প্যাক-করা অবস্থায় মালগুলি এনে ফেলা হয় মলঙ্গা লেনে।' ৫০টি মাউজার পিস্তল, ৫০ হাজার রাউণ্ড বুলেট এবং পিস্তলের অন্যান্য সরঞ্জাম একটি বড় প্যাকেট-এ যদি সমালোচক ঢোকাতেই চান তবে সেই প্যাকেটের আয়তন কত বড় হবে? তথাকথিত সেই প্যাকেটের ওজন ও আকৃতির কথা ভাবিয়াও কি সমালোচক তাঁহার শোনা-কথাকে 'গল্প' বলিয়া বুঝিতে পারেন না?...সুতরাং ঐতিহাসিক সত্য জানিতে হইলে সমালোচককে মানিতে হইবে যে একাধিক বাক্সে মাল আসে এবং প্রত্যেক বাক্সের ওপর লেখা থাকে **R. B. Rodda & Co.**!

(৮) "অতএব সবার অলক্ষ্যে সংঘটিত 'রডা-ষড়যন্ত্র' ব্যাপারের ইতিহাস ভূপেনবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা উহার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত কর্মীরূপে আমি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করি।

"এ সত্য প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে প্রকাশ্যে উদ্‌ঘাটিত করার উপায় ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পরেও এতকাল এ বিষয়ে কেহ উৎসাহ দেখান নাই। ইতিমধ্যে ডাইরেক্ট্‌, প্ল্যানিং ও য়্যাক্‌শানের সঙ্গে সরাসরিভাবে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে এক আমি ছাড়া সবাই দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই জন্যই হালে সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় তথ্য সংগ্রহের শুভ ইচ্ছা লইয়া আমার কাছে আসিয়াছিলেন।

"আমি এখানে আবারও বলি যে, মলঙ্গা লেন হইতে মালপত্র কিভাবে, কখন, কোথায় নেওয়া হয়—হাবু মিত্র কবে, কখন, কিভাবে, কার সাহায্যে পলাইয়া যান

—হাবুর সঙ্গে মাউজার পিস্তল ও বুলেট গিয়াছিল কিনা তা' ভূপেনবাবুর প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে ঐতিহাসিক সত্যে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং কোন সমালোচকের বিচলিত হইবার কারণ নাই। যদি সত্যি তিনি ঐ অজ্ঞাত ইতিহাস সঠিকভাবে জানিতে চাহেন তবে নানাজনের নিকট হইতে নানা 'শোনা-কথা' দ্বিতীয়বার শুনিয়া যেন ঐ ইতিহাস রচনার চেষ্টা না করেন।

"আত্মোন্নতির হাবু মিত্র সম্বন্ধে ভূপেনবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে কিছুই অতিরঞ্জন নাই। এত বড় প্রাণ এবং এত বড় আত্মত্যাগী বন্ধু আমার সুদীর্ঘ বিপ্লবী-জীবনে খুব বেশি পাই নাই। কিন্তু তাঁহাকে কেহ চিনিল না—কেহ জানিল না।

"র‍্যাক্শানের দিনই দার্জিলিং মেলে শ্রীশচন্দ্র পাল হাবু সহ রংপুর কুড়িগ্রামের আস্তানায় চলিয়া যান। হাবু মিত্রের সর্বাধিক গুরুত্ব (importance) ছিল বলিয়াই শ্রীশচন্দ্রের মত কুশলী নেতা তাঁহাকে নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিয়া যান। শ্রীশচন্দ্রের দক্ষতার উপর আমাদের সকলেরই অটুট বিশ্বাস ছিল বলিয়াই মনে হইত যে, এই মানুষটি সঙ্গে থাকা মানে সর্বশক্তিমান এক পুরুষ সঙ্গে থাকা, যাঁর শক্তি হয়তো দৈবাশ্রিত!

"এখানে সমালোচকের আর একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। তিনি লিখিয়াছেন: —'মলঙ্গা লেনে লোহার গুদামের উঠানের ফটকের সামনে বেলা ৩টা কি ৪টা আন্দাজ সময়ে সেইদিনই মালগুলি ফেলা হয় এবং **আরও কিছুদিন পরে** সেই বাক্সটি সরান হয়।' সুতরাং তাঁহার প্রশ্ন যে, ঐদিনই ৫টায় দার্জিলিং মেলে হাবুবাবু ২টি মাউজার ও বুলেট 'সঙ্গে লইবার জন্য পাইলেন কোথায়?'

"পূর্বেই বলিয়াছি যে, মলঙ্গা লেন পুলিশের জানিত স্থান। রডা-র‍্যাক্শান হইবার পর হাবু মিত্রের অন্তর্ধানের কথা তাঁর আপিসে রিপোর্টেড্ হইতে না হইতেই যে পুলিশ এই মালের খোঁজে জানিত-বিপ্লবীদের আস্তানাগুলি চষিয়া ফেলিবে এইটুকু সাধারণ লোকেরও না-বুঝিবার বিষয় নয়। সুতরাং কর্মীদিগকে **ঝড়ের বেগে** সমস্ত কিছু করিতে হইয়াছে এবং পূর্ব হইতেই মাল কোথায় আনা হইবে, কিভাবে কোথায় সেই মুহূর্তে উহা সরান হইবে, কাহারা সরাইবার ব্যবস্থা করিবে, 'রডা'র ছাপমারা বাক্সগুলি ঐ দিনই নষ্ট করিয়া নিজেদের কেনা ছোট ছোট বাক্সে সেসব কাহারা কোথায় বসিয়া ভর্তি করিবে এসব পূর্বাহ্নেই স্থির করা ছিল। সমালোচক জানিয়া রাখুন যে, রডা-র‍্যাক্শানের

বাহাদুরী হইল ‘S P E E D!’ মলঙ্গা লেনে আমরা তাঁহার দেওয়া সময়ের অনেক পূর্বেই আসি এবং অনুকূলবাবুর নেতৃত্বে মালগুলি অতি সত্বর ভুজঙ্গ ধরের বাড়িতে সরান হয়। কালিদাস বসুদেরই নিজস্ব ঘোড়ার গাড়ি ছিল। এই গাড়ি থাকিতে ভাড়াটে-গাড়ি ব্যবহার করার risk আমরা লইব কেন? কালিদাসবাবু তাঁহার নিজের গাড়িতেই মালগুলি যথা-উল্লিখিত স্থানে সরাইয়া ফেলেন। এখন এই সময়ের মধ্যে ঐ বাক্স ভাঙ্গিয়া দুইটি পিস্তল ও বুলেট লইয়া শ্রীশবাবু ‘হাবু মিত্র’ সহ ৫টায় দার্জিলিং মেল ধরিবেন ইহা কি বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার? ইহাকে যে-ব্যক্তি অসম্ভব কার্য বিবেচনা করেন এবং মলঙ্গা লেনেই মালপত্র ‘আরো কিছুদিন’ রাখা হইয়াছিল বলিয়াই যাঁহার বিশ্বাস তাঁহাকে আমার বলার কিছুই নাই। রোমাঞ্চকর নানা বৈপ্লবিক action কিভাবে বাংলাদেশে পূর্বাপর সংঘটিত হইয়াছে তাহার সঙ্গে কিছুমাত্র direct যোগাযোগ যাঁহাদের ছিল তাঁহারা সমালোচকের যুক্তিকে গ্রাহ্য করিবেন না।…

“হ্যাঁ, এইবারে আবার হাবুর কথায় আসা যাক। হাবুকে লইয়া শ্রীশদা গেলেন ‘নাগেশ্বরী’ ( কুড়িগ্রাম মহকুমা, রংপুর ) ডাক্তার সুরেন বর্দ্ধনের কাছে। সুরেনবাবু আমাদের বন্ধু। কুড়িগ্রামে আমাদের দলের অবস্থা ভাল। তা ছাড়া ‘রাভা’ নামক এক শ্রেণীর পার্বত্য-জাতির মধ্যে সুরেনবাবুর কিছু প্রভাব ছিল। নিজে ডাক্তার হওয়ায় তাঁহার প্রভাবপ্রতিপত্তি তখন গোয়ালপাড়া জেলায় ( আসাম ) ঐ ‘রাভা’দের মধ্যে বেশ জমাট বাঁধিয়াছিল।····

“আমি কিছুদিন পর (অক্টোবর, ১৯১৪) কলিকাতা বাঁশতলায় ধরা পড়িলাম। আমার ধরা পড়িবার দুইদিনের মধ্যেই আমার বন্ধু ডাঃ সুরেন বর্দ্ধনের এবং আমাদের নাগেশ্বরীর বাড়ি তল্লাস করিবার পরওয়ানা নিয়া কলিকাতা হইতে পুলিশ নাগেশ্বরীতে যাইয়া হাজির হয়। পূর্ব রাত্রেই থানার দারোগা খবরটা জানেন। থানার লোকেরা ডাক্তারের কাছে স্বভাবতই ঋণবদ্ধ। তা’ ছাড়া সুরেনবাবু এমনিতেই খুব জনপ্রিয় ছিলেন। কাজেই সংবাদ পাইবার সঙ্গে-সঙ্গেই থানার ছোট দারোগা আসিয়া সুরেন বর্দ্ধনকে সাবধান করিয়া গেলেন।

“সুরেনবাবু এই খবর পাওয়ামাত্র বন্ধু নীলকমল বৈরাগী ও আমার ছোট ভাই যামিনী দত্তকে দিয়া হাবু মিত্রকে গোয়ালপাড়া ( আসাম ) অঞ্চলে ‘রাভা’দের আস্তানায় পাঠাইয়া দিলেন। ‘রাভা’রা পাহাড়ী জাত। পাহাড়ে ও পাহাড়তলীতে ইহাদের কতিপয় আস্তানা ছিল। হাবুবাবু এই ‘রাভা’দের সাহায্যে পূর্ব-সীমান্ত পার

হইয়া চীনের দিকে যাইবার চেষ্টা করেন বলিয়া অনেক পরে আমরা আমাদের 'রাভা'-বন্ধুদের নিকট হইতে খবর পাই। ফ্রন্টিয়ার পার হইতে গিয়া তাঁহার এবং তাঁহার সঙ্গী এক 'রাভা'-যুবকের মৃত্যু হইয়াছে, কারণ উভয়েই নিখোঁজ। এই মৃত্যু পুলিশের গুলীতে হওয়া স্বাভাবিক। তাহা না হইলে বিঘোরে পথ হারাইয়া বা বন্যপশুর আক্রমণে হাবু মিত্রের দেহের অবসান হয়তো ঘটিয়াছে। যেভাবেই তাঁহার মৃত্যু হউক না কেন, তিনি ছিলেন অক্লান্ত পথের **পথিক** এবং সজ্ঞানে ( মনের দিক হইতে ) কর্মরত অবস্থায়ই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি **শহিদ**। তাঁহাকে আমার প্রণাম। যে অজ্ঞাত স্থলে তাঁহার দেহ ধূলি-সমাধি লাভ করিয়াছে তাহা তীর্থ। সেই তীর্থকে আমার প্রণাম।"...

১১, গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট,<br>কলিকাতা-৬

**শ্রীহরিদাস দত্ত**

( দুই ও তিন নং )

## ডাক্তার সুরেন্দ্র বর্দ্ধনের পত্রদ্বয়

[ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বর্দ্ধন 'বি-ভি'র প্রবীণতম কর্মনেতাদের অন্যতম। তিনি হরিদাস দত্ত মহাশয়দের সমসাময়িক। বর্তমান বয়স সাতাত্তর। তিনি রংপুর জিলায় 'নাগেশ্বরী' থানায় 'বি-ভি'র গুপ্তকেন্দ্রের সংগঠক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। 'রডা'-অস্ত্রলুণ্ঠনের প্রধান আসামী হাবু মিত্রকে তাঁর আশ্রয়েই রাখা হয়েছিল। তিনি নিজে সুচিকিৎসক ছিলেন এবং সাধারণ লোকের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। হাবু মিত্র সম্পর্কে কিছু তথ্য লেখককে প্রদত্ত তাঁর নিম্নোদ্ধৃত পত্র দু'খানায় লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমানে সুরেনবাবু পশ্চিম দিনাজপুর জিলায় 'সুভাষগঞ্জ' গ্রামে বাস করছেন। ]

( প্রথম )

পোঃ সুভাষগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর

ভাই ভূপেন,

শ্রীশদা ( শ্রীশ পাল ) হাবুকে সঙ্গে করিয়া মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে সন্ধ্যার পরে কুলীর বেশে আমার ওখানে ( নাগেশ্বরী, রংপুর ) আসেন এবং পরদিনই ভোরে ( হাবুকে রাখিয়া ) তিনি কলিকাতা ফিরিয়া যান।

হাবু আমার কাছে মাস দুই ছিল। প্রথমে ( আমার বাসায়-ই অবশ্য ) একটু সংগোপনেই থাকিত। কিন্তু স্বভাবত অত্যন্ত চঞ্চল বলিয়া শেষটায় সে আমার কথা শুনিত না, আমার ঘোড়া লইয়া ছুটাছুটি করিত। গ্রামের সকলের সঙ্গেই সে মেলামেশা শুরু করিল। ফলে সকলের নজরে পড়িয়া গেল, বিশেষত থানার লোকেদের। আমার উপর পুলিশের কিছু দৃষ্টি ছিল, তদুপরি নূতন লোক দেখিয়া এবং খাস কলিকাতার 'কথা' উহার মুখে শুনিয়া পুলিশের সন্দেহ দানা বাঁধিয়া ওঠে।...আমি অন্তত পুলিশের গতিবিধি দেখিয়া এইরূপ অনুভব করিয়াছিলাম।

থানার সহকারী দারোগা আমার অনুগত ছিল। একদিন সে আমাকে জানাইল যে, কলিকাতা হইতে আই-বি পুলিশ আসিতেছে, বোধহয় আমার বাড়ি সার্চ হইবে। আমি সেইদিনই সন্ধ্যায় হাবুকে হরিদাস দত্তের ছোট ভাই যামিনী দত্ত ( বর্তমানে স্বর্গগত ) ও আমার বিশেষ বন্ধু এবং একান্ত বিশ্বাসী নীলকমল দাসের (বৈরাগী) হেপাজতে আসামের সীমান্তে রাভাদের নিকট পাঠাইয়া দেই। পরের দিনই পুলিশ আমার বাড়িঘর ও ডিস্পেন্সারি তালাসি করিতে আসে এবং হাবু মিত্রকে না পাইয়া বড়ই হতাশ হয়।

পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে সেদিন বলিয়াছিলাম যে, আমার কাছে আমারই এক মাসতুতো ভাই ছিল, হাবু মিত্র বলিয়া কেহ নহে ; সেই ভাই চাকুরির উদ্দেশে আসিয়াছিল এবং চাকুরি না পাওয়ায় গত রাত্রিতে চলিয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে দুইজন আই-বি অফিসার আসিয়া এই তালাসি পরিচালনা করে। হাবুকে না পাইয়া তাহারা স্বভাবতই চঞ্চল হইয়া ওঠে। তাহারা বলিল যে, গত রাত্রি ১০টা পর্যন্ত তাহাদের লোক এক ব্যক্তিকে আমার বাড়িতে দেখিয়াছে, ইতিমধ্যে ঐ লোক কোথায় যাইতে পারে ?

যাহা হউক আমার বাড়িঘরের মেঝে ও জমি বিস্তর খুঁড়িয়া-ও পুলিশ তাহাদের পছন্দসই কোনকিছু না পাইয়া শেষটায় চলিয়া গেল। ইহার পর বহুদিন ধরিয়া নানা দিকে লোকজন পাঠাইয়া পুলিশ হাবু মিত্রকে খোঁজ করিয়াছিল। এবং, আমাকে-ও কড়া নজরে রাখিয়াছিল।

হাবু আসাম সীমান্তে 'রাভা' নামক পার্বত্যজাতিদের মধ্যে ছিল। আমাদের জানিত একটি রাভা-যুবক ছিল উহার সঙ্গী। হাবুকে 'রাভা'রা মহিষ চরাইবার কাজে লাগাইয়াছিল। ইতি—

সুরেন্দ্র বর্দ্ধন

( দ্বিতীয় )

পোঃ সুভাষগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর

পরম স্নেহাস্পদেষু,

তোমার প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দিলাম :—

(১) রডা-অস্ত্রলুঠের কিছু পূর্বে ঢাকা হইতে গোপনে 'দাদা' ( হেমচন্দ্র ঘোষ) আমাকে একটি সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে, অল্পদিনের মধ্যেই কলিকাতায় একটি মেজর-য়্যাক্‌শান হইতে পারে এবং আমি যেন সতর্ক থাকি। ইহার দুই-চার সপ্তাহের মধ্যেই হঠাৎ রডা-য়্যাকশানের অন্যতম প্রধানকর্মী পলাতক হাবু মিত্র সহ শ্রীশদার (শ্রীশ পাল) নাগেশ্বরী আগমনের কথা পূর্ব পত্রে জানাইয়াছি।

(২) হাবুর সঙ্গী আমাদের বন্ধু একটি 'রাভা'-যুবক ছিল। দীর্ঘকাল কয়েদখানায় থাকার পর আমরা সকলে বাহিরে ফিরিয়া আসিয়া আসাম-সীমান্তবাসী 'রাভা'দের আস্তানায় খোঁজ লইয়া জানিতে পারি যে, হাবু এবং উক্ত রাভা-যুবক ঐ আস্তানা হইতে বহুদিন ধরিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে। উহারা কোথায় গিয়াছে কেহ বলিতে পারে না। তবে 'রাভা'দের-ও ধারণা যে উহারা পাহাড়ের দিকেই গিয়াছে। সুতরাং হাবুর শেষ পরিণতি **অজ্ঞাত ফ্রন্টিয়ার পাড়ি দিবার চেষ্টায় ঘটিয়াছে বলিয়া আমার-ও ধারণা।** তাহার মত প্রাণবন্ত, সাহসী ও দুর্দান্ত যুবকের পক্ষে এবম্বিধ চেষ্টা করাই স্বাভাবিক। আমরা দীর্ঘকাল জেলে থাকার জন্যই হাবুর মত কর্মী নিখোঁজ হইয়া গেল। ইহা আজও আমার কাছে একটি কঠিন বেদনাদায়ক বস্তু হইয়া রহিয়াছে। তবে যেভাবেই হউক দুর্গম স্থানে তাহার মৃত্যু যে 'শহীদের মৃত্যু' হইয়াছে এই বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

(৩) সেবার কলিকাতায় গিরীনবাবুর স্মৃতি-সভায় এক ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন যে, হাবু মিত্র নাকি চন্দননগরে মারা গিয়াছেন। ইহার কোন প্রমাণ তিনি দিতে পারেন নাই। হরিদাস দত্ত তখন বলিয়াছিলেন যে হাবু চন্দননগরে মারা গেলে বিপিনবাবুরা জানিতে পারিতেন, হাবুর নিকটতম আত্মীয়দের-ও ইহা অজানা থাকিত না।...আবার কাহারো নাকি ধারণা যে হাবু 'অরবিন্দ-আশ্রমে' চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যেন গাঙুলি প্রমাণ করিয়াছেন যে, হাবু মিত্র নামে কেহ কোন কালে অরবিন্দ-আশ্রমে পদার্পণ করেন নাই।

যাহা হউক আমি জানি যে, হাবুর একটা ঝোঁক ছিল যে, আরব্ধ কার্য শেষ না করিয়া সে থামিত না এবং সেই কাজের জন্য যে-কোন বিপদে ঝাঁপাইয়া পড়া তাহার পক্ষে সহজ ছিল। কাজেই ফ্রন্টিয়ার পাড়ি দিবার ঝোঁকে বিঘোরে প্রাণদান করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ; চন্দননগরে সবার-অজ্ঞাতে রোগে মৃত্যুবরণ করা অথবা পণ্ডিচারি-আশ্রমে যাইয়া সাধু হওয়া সেই বয়সে অন্তত তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না বলিয়া আমার-ও ধারণা।

(৪) 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র তারিখের 'সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে পৃথ্বীন্দ্রের উক্তি লক্ষ্য করিয়াছি নন্দগোপাল-হত্যা সম্পর্কে। ভদ্রলোক নন্দগোপাল-হত্যাব সঠিক তথ্য জানেন না। কেবল পুলিশের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিলে বিড়ম্বিত হইতে হয়। শ্রীশ পালের নন্দলাল-হত্যা সংবাদ পুলিশ জানিত না। উহা আমরা জানি এবং শ্রদ্ধেয় হেমদা, বিপিনবাবু, হরিশ সিকদার, অনুকূলবাবু প্রমুখ নেতারা জানিতেন।

শ্রীশ পালের রডা-ম্যাকশান সম্পর্কিত 'অবদান-ও যোগ্য স্বীকৃতি পায় নাই। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। অবশ্য শ্রীশ পালের মত কর্ম-নেতার কাজ বিপ্লবী-জগতেও একান্ত গোপনে ঘটিয়াছে। কিন্তু যথাকালে যখন গোপন কার্যকলাপ ব্যক্ত করিবার সময় আসিল তখনও তৎকালের নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীরা শ্রীশ পালের কার্যকলাপ গোপন রাখিয়া গেলেন কী কারণে তাহা আমি জানি না।

আমি জানি যে, রডা-ম্যাকৃশান কার্যকরী করার জন্য সমস্ত দলগুলিকেই তৎকালে ডাকা হয়। আমি জানি যে, এমন কি বগুড়ার যতীনদা (যতীন রায়) প্রমুখ সকলেই একবাক্যে উহা অসম্ভব বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীশদার ইচ্ছা ছিল সকলে মিলিয়া কার্য হাসিল করিবেন, কিন্তু বিপিনবাবুর দল ছাড়া আর কোন দলই উহা সম্ভব মনে করে নাই। শ্রীশ পাল বলিয়াছিলেন—**"যেখানে অসম্ভব, সেইখানেই সম্ভব।"** তাই তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া হাবু মিত্র, হরিদাস দত্ত, খগেন দাস ও অন্যান্যদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় এই কার্যটি সুসম্পন্ন করেন। অনুকূলবাবু, কালিদাস বসু, ভুজঙ্গবাবুদের সক্রিয় সাহায্যের কথা তুমি সঠিক লিপিবদ্ধ কবিয়াছ। বিপিনবাবুদের দলের সাংগঠনিক-সাহায্যে, শ্রীশবাবুর দুর্জয় নেতৃত্বে এবং হাবু মিত্র ও হরিদাস দত্তের মত দুঃসাহসীদের কৃতিত্বে এই অভাবনীয় কার্যটি সেই যুগে কলিকাতার বুকে দিনেদুপুরে সংঘটিত হয়।...

আমি নিজে তখন 'নাগেশ্বরী' ( রঙপুর ) ছিলাম। কিন্তু বগুড়ার যতীনদার ( যতীন রায় ) নিকট আমি বিস্তারিত শুনিয়াছিলাম। তিনি অধিক-কিছু বলার লোক ছিলেন না। শ্রীশ পালের অপূর্ব সাহস ও অদ্ভুত নেতৃত্বের প্রশংসা কেবল যতীনদাই আমাকে শোনান নাই, হাবু মিত্রও উহা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শুনাইয়াছে। তাহা ছাড়া আমি নিজে শ্রীশ পালকে জানি। ঐ যুগে তাঁহার মত একটি দক্ষ বিপ্লবী কর্মনেতা আমাদের চোখে পড়ে নাই। তাহাকে আমরা মনে করিতাম—An Action-Wizard ! ইতি—

**সুরেন্দ্র বর্দ্ধন**

( চার নং )

## রণেন্দ্রনাথের পত্র

[ 'আত্মোন্নতি-সমিতি'র প্রবীন বিপ্লবী-সভ্য রণেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পুলিশের দারোগা নন্দলাল বানার্জীকে সার্পেন্টাইন লেনে হত্যার ব্যাপারে (৯-৫-১৯০৮) সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর একখানি পত্র 'সাপ্তাহিক বসুমতি'-র তারিখের সংখ্যায় 'পাঠক মন' অধ্যায়ে প্রকাশিত হয়। এই পত্র থেকে নন্দলালকে হত্যা করার ব্যাপারে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদের সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় বলে উহা নিম্নে উদ্ধৃত হলো। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মী রূপে একমাত্র রণেন্দ্রনাথ-ই বর্তমানে জীবিত আছেন। ]

…শ্রীপৃথ্বীন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত "সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ"—ধারাবাহিক প্রবন্ধটি আগ্রহের সঙ্গে পড়ছি। বীর যতীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যলাভের পরম সৌভাগ্য আমার জীবনে ঘটেছিল। যতীন্দ্রনাথের আসন আমার অন্তরে চিরকাল শ্রদ্ধায় মণ্ডিত থাকবে। কিন্তু পৃথ্বীন্দ্রের লেখায় সাপ্তাহিক বসুমতী, প্রফুল্ল চাকীকে ধরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় অপরাধী নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ এবং দণ্ডদানের বিবরণ দেখে স্তম্ভিত হলাম। কারণ আমি নিজে ঐ ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলাম—এবং আমি আজও জীবিত। ইতিহাস-রচনার উপকরণ সংগ্রহের বিধিবদ্ধ কতকগুলি নিয়ম পালনের প্রয়োজন। পৃথ্বীন্দ্রবাবু সে নিয়ম পালন করলে এমন ভ্রান্তিমূলক উপাখ্যান রচনা সম্ভব হত না। তাঁর সংগৃহীত তথ্যের সূত্রগুলি জানতে পারলে বোঝার সুবিধা হত। 'হাওড়া গ্যাং কেসে' ললিত চক্রবর্তীর বিবৃতি যে পুলিশের সাজান-কথা একথা অনেকেই জানেন। কাজেই তার বিবৃতি গ্রহণযোগ্য নয়। চীফ্ জাস্টিস্ জেন্‌কিন্সের রায়েও এই অভিমত সমর্থিত হ'য়েছে। নন্দলাল-হত্যা সংঘটিত হয় ৯-১১-১৯০৮ সালে।

পৃথ্বীন্দ্রের উদ্ধৃতি সরকারী রিপোর্টে ললিতের স্বীকারোক্তি—"১১-১১-১৯০৮ তারিখে তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় নন্দ বাঁড়ুজ্যের বাড়ির প্রতি নজর রাখতে"— এ কথা বিভ্রান্তিমূলক। এই পরিকল্পনায় বা সক্রিয় অংশে নরেন ভট্টাচার্য যে যুক্ত ছিলেন না সে কথা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি। অন্তত একথা বলার অধিকার আমার আছে।···

আমি নন্দলালের ওপর নজর রাখার এবং হত্যার নির্দেশ পেয়েছিলাম আত্মোন্নতি সমিতির 'হরিশ্চন্দ্র শিকদারে'র কাছ থেকে। **এই ঘটনায় আরও একজন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ঢাকার প্রখ্যাত বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র পাল।** শ্রীশ পাল তখন থাকতেন হরিশ্চন্দ্রের বাড়ির পাশে আমহার্স্ট স্ট্রীটে ছুতোর পাড়ার মোড়ে।

পৃথ্বীন্দ্রবাবুর 'হত্যা'র সময়ের বর্ণনাটিও সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত।

৬৪, বিশ্বেশ্বর ব্যানার্জী লেন,
হাওড়া

**শ্রীরণেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়**

( পাঁচ নং )

## সতীশবাবুর পত্র

[ 'আত্মোন্নতি সমিতির'-র প্রবীণ বিপ্লবী-সভ্যদের অন্যতম এবং রডা-ষড়যন্ত্রের সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত শ্রীসতীশ দে মহাশয়ের একখানি পত্র 'সাপ্তাহিক বসুমতি'-র তারিখের সংখ্যায় 'পাঠক মন' অধ্যায়ে প্রকাশিত হয়। এই পত্র থেকে-ও নন্দলাল-হত্যায় যাঁরা যথার্থই সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে বলে উহা নিয়ে উদ্ধৃত হলো। ]

···১৯১৪ সালের এক বৈকালে কলেজ থেকে বইখাতা হাতে বাড়ি ফিরছিলাম, ডিক্সন লেনে বটতলায় বিপিনদার (বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর) সঙ্গে দেখা—আদেশ করলেন, বিপ্লবী সহচর বসন্ত ও জগৎকে নিয়ে জেলেপাড়া লেন ও হিদারাম ব্যানার্জী লেনের মোড়ে তখনই যেতে ; গাড়ি করে মাউজার পিস্তল ও কার্তুজ আসছে, নিজেদেরই কুলীর মত ভারী মালগুলি বয়ে নিয়ে ভুজঙ্গদার ( ভুজঙ্গভূষণ ধর ) বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাত্রির মধ্যে বাক্সগুলি খুলে পিস্তল ও কার্তুজগুলি বার করে কতকগুলি স্টীল ট্রাঙ্কে ভর্তি করতে হবে। জামা ছেড়ে খালি গায়ে, খালি পায়ে, কোমরে কাপড় জড়িয়ে বন্ধু বসন্ত ও জগৎকে নিয়ে তখনই বিপিনদার নির্দেশ মত

জেলেপাড়া লেনের মোড়ে গেলাম—মাল ভর্তি গাড়ি এসে গেল, সেগুলি আমরা বয়ে নিয়ে সরু গলির মধ্যে ভুজঙ্গদার বাড়িতে সিঁড়ির নীচে একটা ছোট ঘরে বাক্সগুলি খুলে ফেললাম। পঞ্চাশটি মাউজার পিস্তল বেরুল ও কার্তুজ পেলাম পঞ্চাশ হাজার রাউণ্ড অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ। বসন্ত থাকত সারপেন্‌টাইল লেনে, ইস্ট লাইব্রেরীর সভ্য। রাত্রে যখন মাউজার পিস্তলগুলি আলোয় ঝকঝক করতে লাগল, আমাদের সে কি আনন্দ, বসন্ত পিস্তলগুলির নাম দিল 'খোকা'। এক একটি স্ট্রিপে দশটি কার্তুজ লাগান, এই দশটি নিয়ে এক রাউণ্ড। পিস্তলগুলি অটোম্যাটিক, গুলি-ভরতি স্ট্রীপটি রেখে চাপ দিলেই দশটি কার্তুজ ফায়ারিং-এর জন্য প্রস্তুত থাকে—এক একটি ফায়ার করলে খোল আপনা থেকেই পডে যায় ও পরেরটি সে স্থানে উপস্থিত হয়। এমনিভাবে লোড করা ও ফায়ার করা দ্রুত সম্ভব। কাঠের খোলটি পিছনে লাগিয়ে পিস্তলগুলি কাঁধে রেখে রাইফেল রূপে ব্যবহার করা যায়। প্রায় দেড মাইল রেঞ্জে কাজ চলে, দূরপাল্লার জন্য রেঞ্জ ঠিক করার ব্যবস্থা আছে। বাক্স খোলা, ট্র্যাঙ্কে ভর্তি করা, প্যাকিং-এর কাঠ, অয়েল কাগজ, উড উল, সমস্ত পোড়ান, জল ঢেলে পরিষ্কার করা, যাতে পুলিশ সার্চ করতে এলে কিছু না পায়, এ সমস্ত কাজ ভুজঙ্গদা, বসন্ত, জগৎ ও আমি করলাম। ভুজঙ্গদার সহোদর ভাই ফণি কিছু সাহায্য করে, সে এখনও সেই জেলেপাডা লেনের বাডিতে থাকে। জগৎ গুপ্ত ডিক্সন লেনে থাকত, রডা-কেসে পুলিশ তাকে জড়াতে পারে নি, বসন্তের নাম জানতে পারে নি। গভীর রাতে কাজ শেষ করে আমরা যে-যার বাড়ি ফিরলাম। বিপিনদার সঙ্গে বৈকালে দেখা হবার পূর্বে মাউজার পিস্তল সংগ্রহ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানতে পারি নি, ভুজঙ্গদার বাড়িতে মালগুলি ট্র্যাঙ্ক-ভর্তি করে রাতে চলে আসার পর কি হল, তাও জানতে পারি নি—শুধু শুনেছিলাম যুগান্তর, অনুশীলনাদি বিভিন্ন বিপ্লবীদলের বিভিন্ন স্থানে মালগুলি পরদিন সকালেই পাঠিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হবে, যাতে পুলিশ কোনও মাল হস্তগত করতে না পারে। অনুসন্ধিৎসা ছিল আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।...

...শ্রীশ মিত্র, অনুকূল মুখার্জীর চেলা, আমার বন্ধু ছিলেন। তাঁর বিষয়ে পরে কোন সংবাদ পাইনি। তাঁর স্মৃতিতে আমাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

**শ্রীশ পাল ( ওরফে নরেন ) নির্ভীক বিপ্লবী ছিলেন। শুধু পুলিশ অফিসার নন্দ ব্যানার্জিকে সারপেনটাইন লেনে হত্যা করেন নি,**

**আগড়পাড়ায় যে মুরারী মিত্র আমাদের বিপ্লবী নেতা বিপিনদাকে ধরিয়ে দিয়েছিল, তাকেও গুলী করে মেরেছিলেন তার বাড়ির দরজায়।**

বিপ্লবী শ্রীহরিদাস দত্ত মহাশয় আজও আমাদের মধ্যে আছেন, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। তাঁকেও আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার।

ভূপেনবাবুর লেখাব শেষাংশে মহামানব ম্যাজিনির উক্তটি আমার এত ভাল লেগেছে, এখানে পুনরায় না লিখে পারলাম না, এজন্য তাঁকে আমার নমস্কার জানাই।

"তোমাব দেশ তোমার মন্দির, তার চূড়ায় থাকুন ভগবান, তার ভিত্ হোক সাম্যমুখী জনতা।"

১৩ডি, ফরডাইস লেন,
কলিকাতা-১৪ — সতীশ দে

( ছয় নং )

## 'মুক্তিসংঘ' তথা 'বিভি'-র প্রতিষ্ঠাতা-সভ্যদের একখানি পত্র

**[ শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষ, রাজেন্দ্রকুমার গুহ, ডাক্তার সুরেন্দ্র বর্দ্ধন, হরিদাস দত্ত এবং বিভূতিভূষণ বসু প্রমুখ অধুনালুপ্ত 'মুক্তিসংঘ' নামক ( উত্তরকালে 'বিভি' ) বিপ্লবী গুপ্তসমিতিব প্রতিষ্ঠাতা-নেতৃবৃন্দ এখনো জীবিত। তঁাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের কাছে লিখিত গ্রন্থকারের একখানি পত্রের মর্ম্ম, এবং উক্ত পত্রের প্রত্যুত্তর-লিপি এখানে উদ্ধৃত হল :—**

**( উল্লিখিত প্রতিষ্ঠাতা-নেতৃবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় )**

**হেমচন্দ্র ঘোষ :** মুক্তিসংঘ তথা বিভি-র প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বাধিনায়ক।
জন্ম—২০শে অক্টোবর, ১৮৮৪ সন।
ঠিকানা—৭-বি নফর কুণ্ডু লেন্, কলিকাতা-২৬

**রাজেন্দ্রকুমার গুহ :** উক্ত দলের প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য।
জন্ম—২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৮৪ সন।
ঠিকানা—গ্রাম বিষ্ণুপুর, পোঃ রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, চব্বিশপরগণা।

**সুরেন্দ্র বর্দ্ধন ঃ** দলের প্রতিষ্ঠাতা-সভ্যদের অন্যতম। রঙ্পুর জিলায় নাগেশ্বরী থানায় ইনি ডাক্তারী করতেন এবং উক্ত অঞ্চলে দলের কর্মনেতা ছিলেন।

জন্ম—২৪শে জুলাই, ১৮৮৮ সন।

ঠিকানা—গ্রাম ও পোঃ সুভাষগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

**হরিদাস দত্ত ঃ** দলের প্রতিষ্ঠাতা-সভ্যদের অন্যতম।

জন্ম—১৬ই নভেম্বর, ১৮৯০ সন।

ঠিকানা—১১ নং গৌরমোহন মুখার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

**বিভূতিভূষণ বসু ঃ** দলের প্রবীন সভ্যদের অন্যতম। তিনি ঢাকাজিলায় 'শুভাঢ্যা ডাকাতি'র সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরে পলাতক অবস্থায় দলের নির্দেশে ১৯১২ সালে বর্মায় শান্-স্টেটে চলে যান। দলের সঙ্গে বরাবর তিনি অতি সংগোপনে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন।

জন্ম—১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১ সন।

ঠিকানা—রামনারাযণ পল্লী, বেহালা, কলিকাতা-৩৪

( গ্রন্থকার লিখিত পত্র-মর্ম )

......'বিভি'-র আদি ইতিহাসের ( অর্থাৎ ১৯০৫ সাল থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের কাল পযন্ত ) উপাদান আমি আপনাদেব কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছি। কিন্তু ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের কাছে উহা 'শোনা-কথা'র অধিক মূল্য পাবে না। সুতরাং আপনারা, যারা এই দলটি ১৯০৫ সালে গঠন করে শেষ দিন পর্য্যন্ত ( প্রাক্ স্বাধীনতা যুগ পয্যন্ত ) উহার নেতৃত্ব দান করে এসেছিলেন তাঁদের জবানীতে দলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকু 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকার প্রয়োজন বোধ করি। যেকোন বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক আপনাদের স্বাক্ষরিত উক্তিকে 'ডাইরেক্ট্ এভিডেন্স্' রূপে গ্রহণ করবেন। অধিকন্তু বর্তমানের এবং ভাবীকালের দেশবাসীর কাছেও আপনাদের অভিজ্ঞতা ও উক্তির মর্য্যাদা অপরিসীম। তাই এ-পত্রের অবতারণা।

স্নেহের ভূপেন,

তোমার ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্রের উত্তর আমরা একত্রে দিতেছি। 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আমরা যথাসময়ে আগাগোড়া পাঠ করিয়া এ্যাপ্রুভ্ করিবার পর তুমি উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছ। কাজেই তোমার ইতিহাস-রচনার দায়িত্ব বহনের অংশ যে সমভাবে-ই আমরাও গ্রহণ করিয়াছি তাহা পত্রের প্রারম্ভেই বলিয়া রাখিতেছি।

আমাদেয় গুপ্তসমিতি স্বভাবতই চিরদিন গোপনে উহার কর্মক্ষেত্র বচনা করিয়াছে ; কেবল মাঝেমাঝে উহাব দুর্জয় আত্মপ্রকাশ সবার অগোচরে সংঘটিত হইয়াছে। ১৯০৮ সাল হইতে ১৯১৫ সালের পরিসরে এই দল 'আত্মোন্নতি-সমিতি'-র সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া একবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাহার বিবরণ ইতিহাসের ব্যক্ত-ঘটনা। ১৯০৮ সালেব ৯ই নভেম্বব 'নন্দলাল বানার্জি হত্যা', ১৯১২ সালে জগদ্দল জুটমিলেব ইউরোপীয় ম্যানেজার 'ওব্রায়েন্ হত্যার ষড়যন্ত্র', ১৯১৪ সালের ২৬শে আগষ্ট 'রডা এ্যাক্শান' এবং ১৯১৫ সনের ২৫শে আগষ্ট 'মুরারী মিত্র হত্যা'—এই কয়েকটি ঘটনার সঙ্গেই আমাদের সংস্থা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল। তাহার পর ১৯৩০ সাল হইতে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্য্যন্ত বৈপ্লবিক-যুগেব ইতিহাসে আমাদের সংস্থার ব্যক্ত অবদান দেশবাসীর অজানা নয়।

আমাদের এই গুপ্তসমিতি স্থাপিত হয় ১৯০৫ সনে। ইহাব প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বাধিনায়ক ছিলেন হেমচন্দ্র ঘোষ। ইহার প্রতিষ্ঠাকালীন সভ্যদের মধ্যে বর্ত্তমানে জীবিত আছেন হেমচন্দ্র ঘোষ, রাজেন্দ্রকুমার গুহ, ডাক্তার সুরেন্দ্র বর্দ্ধন, হরিদাস দত্ত এবং বিভূতিভূষণ বসু। ইহারা সকলেই জানেন-যে এই গুপ্তসমিতিব প্রথম নামকরণ করেন সঙ্ঘনেতা হেমচন্দ্র ঘোষ। ১৯০৫ সালের-ই কোন এক সময় ইহার নাম হয় **মুক্তিসংঘ**। সেই নাম আমরা সবাই গোপনে উচ্চারণ করিতাম একান্ত ভাবেই নিজেদের কাছে। গুপ্তসমিতির তৎকালীন নিয়মানুসারে এই নাম গোপন-মন্ত্রের মতই আমরা গ্রহণ কবিয়াছিলাম। দলে ঢুকিবার পাঁচ সাত বৎসর পর প্রয়োজনবোধে খাঁটি কর্মীকে হয়তো তখনকার দিনে নামটি জানান হইত। পুলিশ বা অপর বিপ্লবীদল তো দূরের কথা, নিজেদের অধিকাংশ কর্মী-ও দলের এই নাম জানিতেন না। সকলেই সাধারণত আমাদের দলকে 'হেম ঘোষের দল' বলিয়া চিহ্নিত করিতেন। সেই যুগে দলের নাম খুব একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার হইয়া উঠে নাই। উহা সংগোপনে মনে রাখিলেই চলিত। এখানে উল্লেখ করিব যে,

১৯০৬ সালে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎকালে কথাপ্রসঙ্গে তিনি দলের 'মুক্তিসংঘ' নামটি পছন্দ করেন এবং ঐ নামের গুরুত্ব সম্পর্কেও কর্মীদিগকে অবহিত হইতে বলেন। গুপ্ত-'মুক্তিসংঘে'র পাশাপাশি একটি 'ভলান্টিয়ার ক্লাব' তথা 'স্বেচ্ছাসেবক সমিতি'ও তৎকালে ব্যক্ত ভাবে বর্তমান ছিল। হেমচন্দ্র-ই উহার নেতৃত্ব করিতেন।...

এই সময় কলিকাতায় দলের প্রতিনিধি পাঠাইবার কথা আলোচিত হয়। এবং ১৯০৭ সালে কোন এক সময় মুক্তিসংঘের বিশ্বস্ত কর্মী শ্রীশ পাল ও গুণেন ঘোষ কলিকাতায় চলিয়া আসেন। শ্রীশ পালকে দলের প্রতিনিধি করা হয়। তিনি অতি দক্ষতায় যুগান্তর ও আত্মোন্নতির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলেন। তাঁহারই নির্দেশে তাঁহার সহযোগীরূপে তাঁহার বন্ধু গুণেন ঘোষ (অবিনাশ চক্রবর্তীর মাধ্যমে) যুগান্তরের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যোগাযোগ রাখিতেন।

১৯১৫ সালে আমরা জেলে বা অন্তরীণে আবদ্ধ হই, অথবা আমাদের কেহকেহ দেশান্তরিত হইতে বাধ্য হন। পুলিশের তৎপরতায় দল-সংরক্ষণের কাজ কষ্টকর হইয়া উঠে। আমাদেরই বন্ধু প্রমথ চৌধুরী (টেনু চৌধুরি) পুলিশের নজর হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বাহিরে থাকেন। প্রধানত তাঁহারই চেষ্টায় দলের সংগঠন-কার্য্য কোনক্রমে অতি সন্তর্পণে চলিতে থাকে। আমরা ১৯২০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তিলাভ করিয়া যে-ভাবে কাজকর্ম চালু করিয়াছিলাম তাহা 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থে নিখুঁত ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

তোমার ইতিহাস রচনার কালে 'Direct evidence' সংগ্রহের প্রয়োজন স্বীকার করি। সেই সূত্রে উল্লেখ করিতে হয় যে, আমরা নিম্ন-স্বাক্ষরকারীবৃন্দ অধুনালুপ্ত 'মুক্তিসংঘ' তথা 'বিভি'-র প্রতিষ্ঠাতা-সভ্যদের অন্যতম। আমরা জীবিত আছি বলিয়া ইতিহাস-রচনায় তোমাকে যেসব তথ্য দিয়াছি বা এখানে দিতেছি তাহা 'ডাইরেক্ট্ এভিডেন্সে'র মর্য্যাদা নিশ্চয়ই পাইবে। কারণ আমাদের বিপ্লবী-সংস্থার আদি পর্বের কর্মী শুধু আমরা নিম্ন-স্বাক্ষরকারীরাই বর্তমানে জীবন ধারণ করিয়া আছি।

আমরা বলিতেছি যে, অতি সংগোপনে বুকের রক্তে নামাঙ্কিত ১৯০৫ সালের 'মুক্তিসংঘ'-ই উত্তরকালের 'বিভি'। মধ্যপথে ১৯২২-'২৩ সাল হইতে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত, এই বিপ্লবীদলেরই সমাজসেবা ইউনিট্ রূপে 'Boys Reading Institute', Social Welfare League' এবং পরে 'শ্রীসংঘ', 'শান্তি সংঘ',

'ধ্রুব সংঘ' প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠান শুধু ঢাকা শহরেই কাজ করে। এই সংঘগুলির মধ্যে 'শ্রীসংঘ' বিশেষ নাম করিয়াছিল অনিল রায়, সত্য গুপ্ত, ভবেশ নন্দী, মণীন্দ্র রায়, রসময় শূর, সুরেন দত্ত, ভূপেন রক্ষিত-রায় প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর কর্মীদের কর্মযোগ্যতায়। সুরেন দত্ত ব্যতীত (অসহযোগ আন্দোলনে কলেজ বয়কট্ করিয়াছিলেন) ইঁহারা সকলেই তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব ছাত্র। প্রফুল্ল দত্ত, নিশীথ চৌধুরি (প্রথম চৌধুরিব ভ্রাতা), প্রভাস ঘোষ (ডাক্তার) প্রমুখ কর্মীদিগকে পূর্ব হইতেই 'Secret Wing'-এ কাজ কবিবার জন্য আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছিল। 'শ্রীসংঘ' ইত্যাদি পাবলিক প্ল্যাটফর্মে ইঁহারা কোন কালে যোগ দেন নাই। অধিকন্তু ইহাও বলিতে হয় যে আমাদের দলের হেড্‌কোয়ার্টার ১৯২০ সালেই ঢাকা হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ইহার প্রধান কারণ যে হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীশ পাল, সত্যরঞ্জন বক্সি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কলিকাতায় বাস করিয়া দলের সংগঠন-ব্যবস্থা প্রশস্ততর করিবার সংকল্পে স্থিব ছিলেন। ক্রমশ দলেব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা একটি মুখপত্র প্রকাশ করা সম্পর্কে অবহিত হইলেন। এবং ১৯২৬ সালে হেড্‌কোয়ার্টার (কলিকাতা) হইতেই দলের মুখপত্র ('বেণু' মাসিকপত্র) প্রকাশিত করার ব্যবস্থা হয়।

ঢাকাশহরেব কর্মীবৃন্দ ব্যতীত বাঙলাদেশের অপরাপর কেন্দ্রের দলীয় কর্মীদের 'শ্রীসংঘের' সঙ্গে কোন যোগ ছিল না। উত্তরবঙ্গে নাগেশ্বরী থানায় হরিদাস দত্ত, ডাক্তার সুরেন বর্দ্ধন ও দুর্গাদাস বানার্জিদেব (ডাক্তার) সংগঠিত দলকেন্দ্র, কলিকাতার কেন্দ্র, ঢাকাব গ্রামাঞ্চলের বা মৈমনসিংহ-কুমিল্লা-ফবিদপুরের ছোটবড় নানা আস্তানার কেহই 'শ্রীসংঘে'র সভ্য ছিলেন না। ১৯২৬ সালে চব্বিশ-পরগণায় বা পাটনাতে, এবং ১৯২৭ সালে মেদিনীপুরে এই বিপ্লবাদলের কেন্দ্রস্থাপনের সূচনা কখন-ও শ্রীসংঘের নামে করা হয় নাই।...দলের প্রবীণ সভ্যরা শ্রীসংঘের সভ্য ছিলেন না, কাবণ উহা স্থানীয় (ঢাকাশহর) তরুণ কর্মীদের একটি সমাজ-সেবার প্রকাশ্য প্ল্যাটফর্ম্ ছিল। ইহার মাধ্যমে আমাদেব তরুণ বন্ধুরা নিজেদেরকে যেমন কর্মতৎপর করিতেন, তেমনি ইহা এবং এই ধরণের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ছিল 'recruiting ground' অর্থাৎ কর্মীসংগ্রহের ক্ষেত্র।

১৯২৮ সাল হইতে অনিল রায়ের সঙ্গে দলের নেতা ও সিনিয়র কর্মীদের কর্মপথ ও কার্যক্রম লইয়া গভীর মতান্তর ঘটে। সংগোপনে গুপ্তসমিতিতে কাজ করিতে হইলে কর্মীদের মধ্যে সামান্য মতান্তর থাকাও অবাঞ্ছনীয়। তাই তৎকালে

একটি ভাগাভাগি হইয়া যায়। মূল দল হইতে আলাদা হইয়া উহার অন্যতম সমাজসেবা-প্ল্যাটফর্ম 'শ্রীসংঘে'র নামেই অনিল রায় তাঁহার সমাজসেবামূলক কাজ চালাইয়া যাইতে বদ্ধপরিকর হন। ইহা আমাদের সকলের পক্ষেই মর্মান্তিক দুঃখের বস্তু হইলেও কর্মের তাগিদে ইহাকে মানিয়া লইতে হয়। মূল দলের বৃহদাংশ বৈপ্লবিক-কর্মের প্রস্তুতিতে মগ্ন হয়, এবং উহার পুলিশ ও অন্যান্য দলের জানিত কর্মীরা দল-নেতার সঙ্গে কংগ্রেস-প্ল্যাট্‌ফর্মে বৃহত্তর ক্ষেত্রে 'ওপেন্‌ পলিটিক্সে'-ও কাজ করা স্থির করেন।

১৯৩০ সাল হইতে হেমচন্দ্রের দল দুঃসাহসী বিপ্লবকর্মের ইতিহাস রচনা করিতে থাকে। সত্য গুপ্ত প্রমুখের অনলস চেষ্টায় হেমচন্দ্রের দলের বিপ্লবী কর্মীরা সুভাষচন্দ্রের 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স মুভমেন্ট'কে আন্দোলনের' ধ্যায় হইতে বৈপ্লবিক-সত্তায় গ্রহণ করাতে কালক্রমে পুলিশের তালিকায় উক্ত দলের নাম 'বিভি' হইয়াছিল। 'বিভি' মূল দল অর্থাৎ 'মুক্তিসংঘের'-ই উত্তরকালীন ও সর্বপ্রচারিত নাম। এই 'বিভি'-ই সারা বাঙলায় 'বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতি' ও 'প্ল্যাটফর্ম' রূপে উহার ঐতিহাসিক role সমাপিত করিয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৯০৫ হইতে ১৯২৮ সালের মধ্যবর্তী কালে মাত্র পাঁচ-ছয় বৎসরের পরিসরে ( ১৯২৩ হইতে ১৯২৮ ) ঢাকা শহরে হেমচন্দ্রের দলেরই সমাজসেবা-ইউনিট রূপে 'শ্রীসংঘে'র পরিচয় ছিল। কর্মের আদর্শ ও পদ্ধতিগত মতান্তরের ফলে কতিপয় সদস্য মূল দল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমাজসেবা ও ভবিষ্যতে বিপ্লব করিবার আশায় দলবদ্ধ ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানকে পুলিশ গুপ্তসমিতির লিষ্টে নিশ্চয়ই একটি নামে চিহ্নিত করিবে। হেমচন্দ্রের মূল দল হইতে আলাদা করিয়া বুঝিবার জন্য তাই পুলিশ অনিল রায়ের দলকে 'শ্রীসংঘ' নামে একটি স্বতন্ত্র গুপ্তসমিতি রূপে প্রচারিত করে।...

এখানে আরো একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকার শ্রীসংঘ-সমাজসেবা-প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি ছিলেন অনিল রায়। মূল বিপ্লবীদল যখন সংগোপনে বিপ্লব-প্রস্তুতির কার্যক্রম গ্রহণ করে, তখন সত্যগুপ্ত, রসময় শূর, মনীন্দ্রকিশোর রায় সুরেন দত্ত, ভূপেন রক্ষিত-রায় প্রমুখ নামী কর্মীবৃন্দ অনিল রায় এবং তাঁহার মতাবলম্বী বন্ধুদিগকে বৃথা বিপদে না-ফেলিবার সংকল্পে উক্ত 'শ্রীসংঘে'র সভ্যপদ হইতে প্রকাশ্যে পদত্যাগ করেন। সেই পদত্যাগ-সংবাদ তৎকালে কাগজে *

* 'সাপ্তাহিক সোনার বাঙলা', ঢাকা

প্রকাশিত হয়। এই তথ্য উল্লেখ করার মর্ম হইল যে, বন্ধুরা কাজের খাতিরে আলাদা হইলেও মনের দিক হইতে-যে কোন বিরোধিতা সৃষ্টি করিতে চান নাই তাহার একটি প্রমাণ উল্লেখ করা। একের গুপ্ত কার্য্যকলাপের জন্য অপরের কোন অজ্ঞাত বিপদ আসিবে ইহা কাহারো অভিপ্রেত ছিল না।...

**মুক্তিসংঘ**-দলের 'বিভি' নামে পরিণতি এবং মুক্তিসংঘের সমাজসেবা ফ্রন্ট্ ( ঢাকা শহরে ) 'শ্রীসংঘে'র গুপ্তসমিতি রূপে উত্তরকালীন পরিচিতির ইহাই ইতিহাস। ইতি—

৭-বি, নফরকুণ্ডু রোড্,
কলিকাতা—২৬

## শুদ্ধি-পত্র

| অশুদ্ধ | পৃষ্ঠা | পংক্তি | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ব,াস্তয্ | ৩ | শেষ পংক্তি | যুগান্তর, |
| মূলব | ৪ | ৩ | মূলবর্গ |
| কবেছিলেন | ৬ | ২ | কবছিলেন |
| অনুকূলবাবু | ৯ | ২৪ | অনুকূলবাবুব |
| পস্তূ | ১১ | শেষ পংক্তি | স্তূপ |
| আত্মপ্রত্যায | ২৮ | ২২ | আত্মপ্রত্যয় |
| যতনী | ৩৭ | ছবিব নীচে | যতীন |
| ভলান্টিয়াস | ৭৬ | ৭ | ভলান্টিয়ার্স |
| স্বেচ্ছাসৈণিক | ৪৬ | ২১ | স্বেচ্ছাসৈনিক |
| 'স্বাধীনতা-সাপ্তাহিকে'ব | ৭৯ | ৪ | 'স্বাধীনতা-সাপ্তাহিকে'ব ভাষায় |
| লাইং | ৫২ | ১১ | লাইইং |
| গুল | ৫২ | ১৩ | গুলী |
| শ্রদ্ধবান | ৫৭ | ২২ | শ্রদ্ধাবান |
| বর্ণবিভযে | ৫৮ | ৩ | বর্ণবিভায় |
| সমাবেশ। | ৬৪ | ১৪ | সমাবেশ। গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, আনন্দ ও |
| এই তৎকালে | ৬৫ | ১১ | তৎকালে এই |
| ফেলায় | ৬৫ | শেষপংক্তি | ফেলাব |
| হবিপদ | ৬৯ | ৬ | হবিপদ |
| ডুনো | ৭০ | ৩ | ডুর্নো |
| মূতি | ৭১ | ১৪ | মূর্তি |
| ধন ভাণ্ডব | ৮৩ | ৬ | ধনভাণ্ডাব |
| শিক্ষাকেন্দ্র | ৮৫ | ১৩ | শিক্ষাকেন্দ্র। |
| বোগাকে | ৮৬ | ১২ | বোগীকে |
| ভট্টাচার্ষে | ১০৫ | ৮ | ভট্টাচার্যেব |

| অশুদ্ধ | পৃষ্ঠা | পংক্তি | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| নেতৃত্বে | ১১০ | শেষপংক্তির পূর্বপংক্তি | নেতৃত্বে, |
| 'বিয়াল্লিশেব | ১১০ | শেষপংক্তির পূর্বপংক্তি | 'বিয়াল্লিশের |
| নেতৃত্বে রাণী, | ১১০ | শেষ পংক্তি | নেতৃত্বে, 'রাণী |
| শক্ৰ | ১১৪ | ৯ | শত্রু |
| কারাপ্রাচার | ১১৬ | শেষ পংক্তি | কারাপ্রাচীর |
| রূপরস-গন্ধময় | ১১০ | ১৭ | রূপ বস-গন্ধময় |
| শাক্ত | ১২২ | ১ | শক্তি |
| সমাজে | ১২৪ | ২০ | সমাজের |
| করেছেন | ১৩০ | শেষ পংক্তি | কবেছেন। |
| মৃত্যুক | ১৩৪ | ১৪ | মৃত্যুকে |
| নেতৃতে | ১৩৮ | ২১ | নেতৃত্বে |
| স্বাথান্বেষী | ১৩৯ | ২৬ | স্বার্থান্বেষী |
| | ১৪১ | ২২ | ১৯০১ |
| বিপ্লবনায়ক | ১৪৩ | ১৬ | বিপ্লবনায়ক |
| ধাবে | ১৪৭ | ১৫ | ধীরে |
| তরুণি | ১৫৯ | ১৫ | তবণিকান্ত |
| অসস্তব | ১৬১ | ৩ | অসম্ভব |
| মণি সেন | ১৭০ | ১৯ | মনি সেন, |
| আমবা | ১৭৭ | ৪ | 'আমবা |
| ফুঁটো | ১৮২ | ২১ | ফুটো |
| নিভাক | ১৯২ | ৯ | নির্ভীক |
| ভবেলেন | ২১১ | ১ | ভাবলেন |
| আধুনালুপ্ত | ২১৯ | ৭ | অধুনালুপ্ত |
| উদ্ধৃত। | ২২১ | ৭ | উদ্ধৃত হ'ল। |